উদাত্ত
ভারত

॥ কাব্য-সংকলন ঃ ১৯২৬-১৯৫৬ ॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ

কাব্যলোক

১, যদু ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা-২৬

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৬৩
আগস্ট ১৯৫৬

প্রকাশক
নির্মল ভট্টাচার্য
কাব্যলোক
১, যদু ভট্টাচার্য লেন
কলিকাতা ২৬

প্রচ্ছদপট ও কবির প্রতিকৃতি
অমূল্য দাশ

মুদ্রক
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা ১৩

ব্লক নির্মাতা
স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

বাঁধিয়েছেন
ইস্টেন্ড ট্রেডার্স
২০, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

দাম ছয় টাকা

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
বন্ধুবরেষু

তুমি দেখা দিলে যবে আমার
কল্পিতম প্রাণ-বেদনায়
ঝড় তুলে একটী শুধু উদার করুণ চোখ হাসিতে ।
জ্বালালে রক্তরবির শিখা
ঘোচালে রাতের ক্রূর কুহেলিকা
ফুঁ দিয়ে বাজালে একটী সুর অন্ধকারের নীরব বাঁশিতে ?

আমার কবিতা গড়ালে যতনে
অনাদরে ছিল তিমিরকোণে
ত্রিশ বছরের বেদনার বোঝা বুকে নিয়ে একাকার ,
বাঁচালে তাদের হে বন্ধু তুমি
জোয়ারে ভাসালে ধূ ধূ মরুভূমি
নামালে গঙ্গা ত্রিশূলে ভেদিয়া দারিদ্র্য-কৈলাস ।

আমার বুকের ভঙ্গুর-হাড়গুলি
জুড়ে দিলে ধুয়ে মুছে যত ধূলি
দিলে থরথর একটী বৈভব বকফুলে গাঁথা মালা ।
হে বন্ধু এই এ মালা তোমার,
কণ্ঠে পরায় মহাজনতার
সর্বহারার রাঙাচেতনার রক্ত-মশাল জ্বালা !

২রা শ্রাবণ ১৩৬৫

বিমলচন্দ্র ঘোষ

শ্রেষ্ঠত্ব গৌরবের অহংকার নিয়ে কাব্যরসিক পাঠক-সমাজের সামনে এই সংকলন মাথা উ'চু করে দাঁড়াবার মতো স্পর্ধা রাখে কিনা জানি না। প্রকাশক তাঁর ব্যবসাবুদ্ধির জয়ঢাক বাজিয়ে আমার সম্বন্ধে যা খুশি লিখুন না কেন তা'তে কবি হিসাবে আমার না আছে শান্তি, না আছে সান্ত্বনা! এই ব্যাধিগ্রস্ত নাগরিক পরমায়ু ছেচল্লিশ পার হ'তে চলেছে দ্রুত। অশেষবিধ সাংসারিক যন্ত্রণার কুম্ভীপাকে ঘুর-পাক খেতে খেতে এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেছি যে এই বৈষম্যকলুষিত নিষ্ঠুর সমাজে আর্থিক দুর্দশাপ্রপীড়িত ব্যক্তির কাছে কোনোপ্রকার সামাজিক স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির স্তুতি-নিন্দাবহুল বাক্যচ্ছটা সম্পূর্ণ অর্থহীন। শুধু চিরন্তনী দুর্বলতার বশে এ যাবৎকাল ব্যক্তি ও সমাজজীবনের কল্যাণ ও অকল্যাণ, ইতিহাস, প্রকৃতি ও প্রেম সম্বন্ধে যা কিছু ভেবেছি, স্বপ্ন দেখেছি, এবং সাধ্যমত প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি সেগুলির মধ্যে থেকে বাছা বাছা কিছু লেখা দেশবাসীর কাছে পে'ৗছে না দিয়ে পারলুম না। পাঠক নিজ-গুণে এগুলিকে গ্রহণ করলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। একটা কথা পরমকৃতজ্ঞতার সংগে ঘোষণা করছি যে শ্রীশৈলজাভূষণ ঘোষের মতো বন্ধু পেয়েছিলুম ব'লে এই জাতীয় একখানি সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল, নচেৎ আমার মতো একজন কপর্দকহীন ব্যক্তির পক্ষে এত খরচপত্তর ক'রে বই বের করা কস্মিনকালেও সম্ভব হ'তো না। পরিশেষে যাঁরা নির্বাচন ও অন্যান্য প্রকাশনার কাজে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে পরমপ্রীতিভাজন নির্মল ভট্টাচার্য, কালীপদ বশিষ্ট, রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শচীন সেন, শিল্পী অমূল্য দাশ এবং আমার বিশিষ্ট বন্ধু ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা, শৈলেশ সেন-গুপ্ত, কল্যাণ দাশগুপ্ত, ও কথাশিল্পী অমরেন্দ্র ঘোষের নাম কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করি। আর যাঁরা কালিঝুলি মেখে অমানুষিক পরিশ্রমে আমার এই সংকলনখানি কম্পোজ করেছেন, ছেপেছেন ও বাঁধিয়েছেন, যাঁরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির নীরব নির্মাতা, —সেই সব শ্রমিকবন্ধুদেব কাছে আমি চিরঋণী থাকবো।

৭ই শ্রাবণ ১৩৬৩
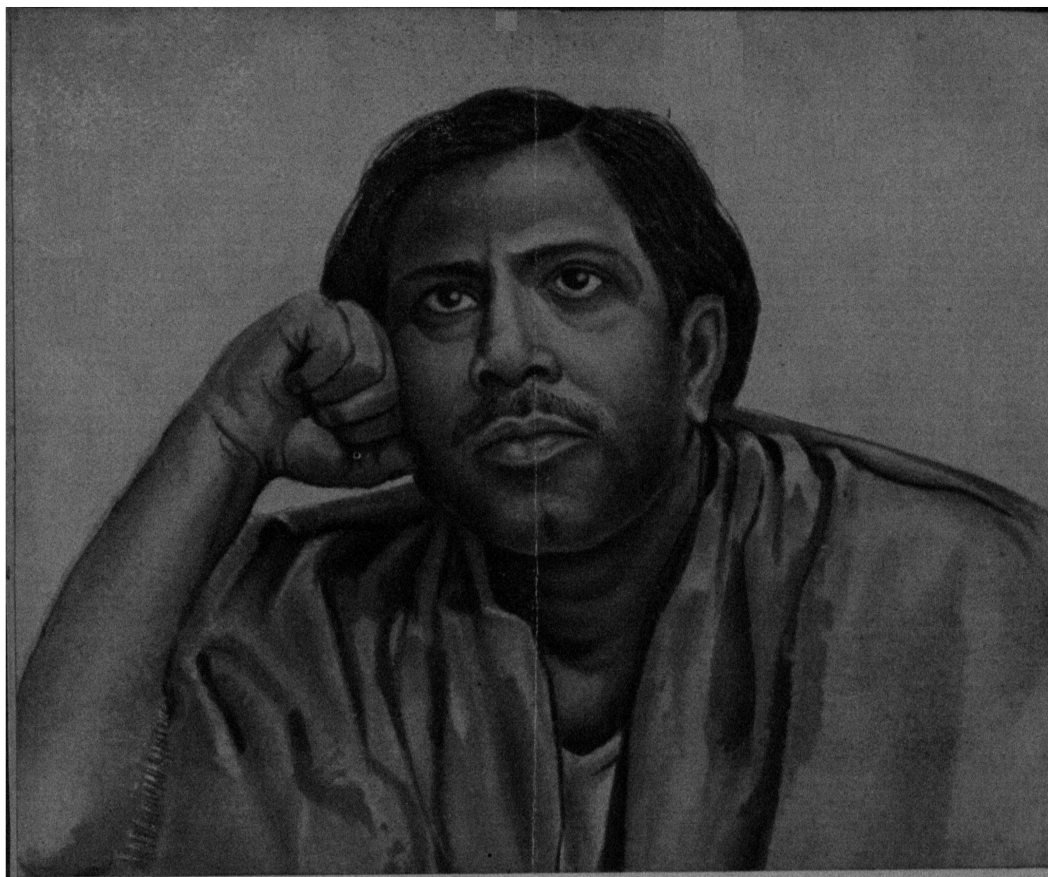
প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবিদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ দীর্ঘকাল থেকেই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। অজস্র কবিতা ও গীতরচনার ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত। বিমলচন্দ্রের কবিতার সমালোচনা-প্রসঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ "বাংলাদেশে আজ সব থেকে জনপ্রিয় বাঙালী কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ। বেশীদূরে যেতে হবে না, কলকাতার আশেপাশে যে কোনো জায়গায় গেলে প্রচুর লোক পাবেন যাঁরা বিমল ঘোষের কবিতা মুখস্ত বলে যেতে পারে। এক সুকান্ত ভট্টাচার্য ছাড়া আর কোনো আধুনিক বাঙালী কবির এ সৌভাগ্য হয়নি।" (পরিচয় ঃ মাঘ ১৩৫৭) কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতির আশীর্বাদ ও দলমত নির্বিশেষে এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের কাছ থেকে কবি-স্বীকৃতি বিমলচন্দ্র প্রথম যৌবনেই লাভ করেছিলেন। আধুনিকতম বাংলা কবিতার ওপর লিখিত একটি প্রবন্ধে কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ "এই নতুন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বোধ হয় বিমলচন্দ্র ঘোষ। তাঁর রচনার প্রতি পংক্তিতে অপরিসীম আত্মবিশ্বাস, অজেয় মানুষের জয়যাত্রার বন্দনা। অসাধারণ বলিষ্ঠ লেখনীতে বিমলচন্দ্র ঘোষ বাংলা কবিতায় একটা নতুন ধারার প্রবর্তনা করলেন। (বঙ্গলক্ষ্মী, আশ্বিন, ১৩৫৩)। প্রবীণ কথাশিল্পী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ২১।১।৫১ তারিখে একখানি পত্রে বিমলচন্দ্রকে লিখে-ছিলেন, "তোমার বই যথাসময়ে এসেছে এবং পরমানন্দে রসাস্বাদন করে ধন্য হয়েছি। তোমার মধ্যে সেই ভাব-গম্ভীর্য আছে যা সমস্ত কিছুকে একটা মহিমা দিতে পারে। একদা ছিল সূর্যালোকের মত উষ্ণ প্রসন্নদীপ্ত তা'র রূপ। যদিও সে রূপের পরিবর্তন ঘটেছে তবুও তার দৃঢ়তা এবং গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। কালবৈশাখীর পিঙ্গল-কৃষ্ণ তা'র রূপ, এখন দিগন্ত ব্যাপ্ত করার মত প্রসার-আকৃতি তা'র অবয়বে এবং আত্মায়। তাই আমি তোমার অনুরাগী মুগ্ধ পাঠক। ভক্ত বললে যদি বিব্রত না হও তবে তাই।" অধ্যাপক অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র লিখেছিলেন, "আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ বোধ হয় সকলের চেয়ে মৌলিকতা দাবী করতে পারেন। তিনি একদিকে যেমন রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, অন্যদিকে বৈদেশিক কবিদের প্রভাব তাঁর ওপর নেই বললেই চলে। তাঁর কাব্যের ভাষা জলপ্রপাতের ধ্বনির মতো গুরুগম্ভীর। এমন অপূর্ব শক্তিশালী ভাষা আধুনিক কাব্যে দেখিনি। তাঁর ভাষা কখনো মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথকে কখনো বিবেকানন্দকে।" (প্রভাতী ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯) এ ছাড়া দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক, সমালোচক ও কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

১৯২৬ থেকে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, এই তিরিশ বছর ধরে বিমলচন্দ্র বহু বিচিত্র বিষয়বস্তুর ওপর কবিতা লিখেছেন। এত অধিকসংখ্যক কবিতা এ যুগে আর কোনো কবি লিখেছেন কিনা জানি না। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত দশ বছর নানা পত্রিকায় কবিতা বেরুবার পর, **"জীবন ও রাত্রি"** নামে তাঁর একখানি ক্ষুদ্র কাব্যপুস্তিকা বেরিয়েছিল। তারপর ১৯৪১ সালের মে মাসে কবি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা-ভবন' থেকে **"দক্ষিণায়ন"** প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ সালে শ্রীঅন্নদাশংকর রায়ের অর্থানুকূল্যে কবিতা-ভবনের এক পয়সায় একটি গ্রন্থমালার অন্তর্গত বিমলচন্দ্রের **"উলুখড়"** আত্মপ্রকাশ করে। তারপর ১৯৪৫ সালে সমবায় পাবলিশার্সের শ্রীমহাদেব সরকার **"বিগ্রহের ও অন্যান্য কবিতা"** নাম দিয়ে বিমলচন্দ্রের একখানি সংকলন প্রকাশ করেন। এই সংকলনখানি কবিকে আধুনিক বাংলা-কাব্যের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৪৮ সালে কবির **"ফতোয়া-১৮৪৮-১৯৪৮"**, ১৯৪৯

সালে "নানকিং" (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত নয়াচীনের ওপর লিখিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কাব্যপুস্তিকা), ১৯৫১ সালের জানুয়ারীতে "সাবিত্রী", মার্চে "সপ্তকাণ্ড রামায়ণ" মে মাসে বিশ্বশান্তি আন্দোলন উপলক্ষ্যে রচিত "বিশ্বশান্তি" (মস্কো বেতার কেন্দ্রের বাংলা-বিভাগ থেকে আবৃত্তি করে শোনানো হয়েছিল) এবং "ভুখা ভারত" প্রকাশিত হয়। কবিবর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত "সাবিত্রীকে" অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন, "...'সাবিত্রী' পড়লাম ...এর মধ্যে কয়েকটি পূর্বেই পড়েছিলাম এবং মুগ্ধ হয়ে কবিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথম কবিতা 'সাবিত্রী' এবং দ্বিতীয় কবিতা 'প্রাণযাত্রা' পড়ে বিস্মিত হইছি। বিমলচন্দ্রের বিপ্লবী মনের যে রসমূর্তি এতে ফুটে উঠেছে তা' অপূর্ব। বলিষ্ঠ চিন্তার সুদূরপ্রসারী কল্পনায় ও প্রকাশভঙ্গীর স্বকীয়তায় কবিতা দু'টি সাধারণ স্তরের বহু ঊর্ধে উঠেছে। যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি কালের দংশনে বিশ্বমাবনরূপী সত্যবান আজ গতপ্রাণ, আর তাকেই পুনরুজ্জীবিত করার সংকল্প নিয়ে বিপ্লবী কবির কাব্য-সাবিত্রী তার প্রাণযাত্রা সুরু করছে।..."সাবিত্রী" অকুণ্ঠিত প্রশংসার যোগ্য।" ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিমলচন্দ্রের আর কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

উপরোক্ত দশখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "দক্ষিণায়ন" ৮৭ পৃষ্ঠার এবং "দ্বিপ্রহর" ১৫৬ পৃষ্ঠার। বাকী গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি ১৬ থেকে ৩২ পৃষ্ঠার মধ্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গত তিরিশ বছরে অসংখ্য কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সত্বেও কবির গ্রন্থ সংখ্যা অত্যন্ত কম। তাঁর সমগ্র রচনাবলী যদি নিয়মিত গ্রন্থাকারে বেরুতো তা'হলে বর্তমান সংকলন "উদাত্ত ভাবতের" মতো অন্ততঃ সাত আট খানি বই বেরুতো। এই সংকলনে এমন অনেক কবিতা আছে যেগুলি এ যাবৎ অপ্রকাশিত ছিল। বহু খাতা ও পাণ্ডুলিপির স্তূপ থেকে এগুলিকে উদ্ধার কবা হয়েছে। নির্বাচনের সময় দেখা গেছে যে বেশির ভাগ কবিতার রচনার তারিখ ও পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ এক নয়। বহু বৎসর আগের বচনা পরে বেরিয়েছে। এর কারণ, কবি খাতার পর খাতা অসংখ্য কবিতা গত তিরিশ বছর ধরে ক্রমাগত লিখে আসার ফলে প্রত্যেকটি কবিতা নিয়মিত পত্রিকায় অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

'উদাত্ত ভারত' কবির নিজের দেওয়া নাম। এই বিশাল ভারতভূমির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে কবি তাঁর নিজস্ব বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে যা কিছু ভেবেছেন এবং সেই ভাবনাগুলিকে নানা সময়ে নানা কবিতার মাধ্যমে রসোত্তীর্ণ ভাবমাধুর্যে ও বলিষ্ঠ প্রগতিবাদী গম্ভীরতায় প্রকাশ করেছেন,—সেই সব কবিতার অধিকাংশ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। একজন কবিব প্রধান বৈশিষ্ট্য বুঝতে হ'লে তাঁর যে কবিতাগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার এই গ্রন্থে সেই ধরনের কিছু লেখা সংকলিত করা হ'ল। কবিতাগুলি কালানুক্রমিকভাবে না সাজিয়ে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অনুসারে সূচীপত্রে পর্যায় ভাগ ক'রে সাজানো হয়েছে। অনেক পুরোনো লেখা [illegible]ন্যের দাবীতে মূলসুরের ঐক্য বজায় রেখে নতুন লেখার পাশে স্থান পেয়েছে। কবি কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংশোধনের ফলে অনেক পুরোনো লেখার চেহারা বদলে গেছে। কবিমনের ক্রমবিকাশ বোঝাবার জন্য প্রত্যেকটি কবিতার তলায় রচনার তারিখ দেওয়া হ'ল। কবি অসুস্থ শরীরে প্রুফ দেখে-ছিলেন ব'লে কতকগুলি মারাত্মক ছাপার ভুল ও কিছু কিছু বানানের অসঙ্গতি থেকে গেছে, এর জন্য কবির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশক হিসাবে আমরাও পাঠকের কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

—নির্মল ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

॥ এক ॥

॥ দুই ॥

॥ তিন ॥

॥ চার ॥

॥ পাঁচ ॥

॥ এগারো ॥

॥ বারো ॥

॥ তের ॥

॥ চোদ্দ ॥

এ স্বাক্ষর বিশ্ববাংলা

নরোত্তম-চেতনার প্রদীপ্ত উদার অঙ্গীকার
চিন্ময় অক্ষবের এ এক অদ্বৈত অহংকার
রূপদক্ষ মননের লাবণ্য-ঝংকার!
প্রশান্ত রজতশুভ্র রুদ্র-ললাটিকা
কল্যাণের বৈজয়ন্তী শিখা
ভারততীর্থের আত্মমর্যাদার মুক্ত মহাকাশে
জ্যোতির্ময় অগ্নিরেখা এ মহাস্বাক্ষর।

যে গানে বাতাস কাঁপে
রং ধরে ফুলে
সান্দ্রনীল আকাশে তারার
মণি জ্বলে মনশ্চন্দ্রমার
রাকায় সুরের কম্প্রতরঙ্গে ভ্রমরবিলাসিতা
কবিতা শরীর পায়,
শাঙন সজল ঘন অস্থির রাত্রির মূর্চ্ছনায়
বর্ষা নামে,
যে গানের ঝড়ে নাচে বাউল-বৈশাখী
পাখি ডাকে অরণ্যচূড়ায়
শরতে গঙ্গার কূলে উতলা হাওয়ায় কাশবন
রোমাঞ্চিত শুভ্র মহিমায়।

যে গানে ছন্দের মায়া
যে গান বিশ্বের প্রতিচ্ছায়া,
লিখেছি অজস্র লেখা যে গানের সমুদ্রের কূলে
সুর-লয়-তানবন্ধ তাঁরি স্বর্ণচাঁপার আঙুলে
রূপলক্ষ্মী-মন্দিরের আলিম্পন এ স্বর্ণস্বাক্ষর।

সুরের সুরভিস্নিগ্ধ প্রসন্ন সঙ্গীত যাঁর প্রাণ
প্রবুদ্ধ ভারত-বিবস্বান!
গৌরবের নভঃস্পর্শী শতাব্দী-শিখরে
রশ্মি যাঁর বাঙ্ময়-ঝংকার
পিতা যিনি এ যুগের কবিযশঃপ্রার্থী-জীবনের
পার্থিব শান্তির দীপাধার,
অগ্নিগর্ভ প্রতিবাদ
কুটিল সাম্রাজ্যবাদী ক্ষয়িষ্ণু বণিক-সভ্যতার
সমদর্শী সার্বভৌম যিনি বিশ্বমৈত্রীর পূজারী
তাঁরি মহাসামুদ্রিক
ভাস্বর স্ফটিকস্বচ্ছ কাব্যচেতনার
নবযুগ-অভিজ্ঞান
এ স্বাক্ষর প্রমূর্ত কল্যাণ।

উদাত্ত ভারত-ললাটের
মনুষ্যত্ব-বিধায়ক এ স্বাক্ষর পুণ্য জয়টিকা
প্রাণোল্লাসে রূপায়িত এ এক অনন্য রূপশিখা
সুতীব্র দুঃসহ রাত্রিমন্থিত ব্যথার প্রতিকার
সাম্যের শান্তির অঙ্গীকার
ভারত-কবির স্বর্ণলেখনীর দৃপ্ত অহংকার
এ স্বাক্ষর বিশ্ববাংলা
উদার বলিষ্ঠ ঋজু জাগ্রত নবীন এশিয়ার।

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৩

অকুণ্ঠ ভারত

ইড়া সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ॥

—ঋগ্বেদঃ আগ্নেয় সূক্ত ১।১৩।৯

হে ভারত,
আমি তোমার যুগোত্তীর্ণ কণ্ঠস্বর,
আমি তোমার যুগযুগান্তরিত রক্ত-সমুদ্রের সৃজনোল্লাস!
তোমার কাঞ্চনজঙ্ঘার অতিকায় তুষার-পদ্মে
অগ্নিপক্ষ ভ্রমরের মত আমি গান গেয়েছি
প্রথম সূর্যরশ্মির বীণা বাজিয়ে
শত-শতাব্দীর অমিতাভ উদ্দীপনায়।
আমি তোমার পার্বতী-পরমেশ্বর-আত্মার মহাসংগীত!
আমি তোমার সারস্বত-চেতনার প্রবাহনিত্য প্রাণ-ঝংকার॥

অণু থেকে অণীয়ান মহৎ থেকে মহীয়ান
ঔপনিষদিক উচ্চাভিলাষের গান
আমার চেতনার আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল
রহস্যময় আত্মানুসন্ধানের অন্তর্মুখিতায়
ঐশী করুণালাভের মন্ত্র-গাম্ভীর্যে!
জরা মৃত্যু শোক ভোলবার সেই গৈরিক তমসায়
আমি দেখতে পাইনি তোমার স্বর্গাদপি গরীয়সী রূপ,
শুনতে পাইনি তোমার বিশাল মাটির স্পন্দন,
অরণ্যের মর্মর ধ্বনি,
উদ্বেলিত নদনদীর কান্না;
শুনতে পাইনি দক্ষিণসমুদ্রমন্থিত মৌসুমী বাতাসের দীর্ঘশ্বাস!
সেদিন সুর ছিলনা তোমার কণ্ঠে
বাণী ছিলনা তোমার ভাষায়
প্রাণ ছিলনা তোমার আসমুদ্র-হিমালয় প্রসারিত অবয়বে॥

সেদিন আমি খুঁজেছি দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত-করা তোমার সেই রূপ,
মুখে যার আগুনের আভা!
পায়ে যার পাহাড়-গুঁড়িয়ে-ফেলা আঘাতের প্রচণ্ডতা!
দুই বাহুতে যা'র সমস্ত পৃথিবীটাকে বুকে জড়িয়ে ধরার বিরাটত্ব
শান্তি সুখ স্বাধীনতার সুনিবিড় বন্ধনে।
তাকে আমি খুঁজেছি আমার বিনিদ্র চিন্তার চতুঃসীমায়
আমার সম্ভ্রমদীপ্ত চেতনার আন্তর্জাতিক শালীনতায়
কাব্য-সাহিত্য-শিল্প-ললিতকলার মৃত্যুঞ্জয়ী সামঞ্জস্যে!
হে ভারত,
তুমি আমার নবজাগ্রত বস্তু-জিজ্ঞাসার উদয়াচল॥

আমি তোমার সেই রূপ দেখেছি হে আমার জননী জন্মভূমি,
কারাগারের দেয়াল যাকে ঘিরে রাখতে পারেনা
শেকল হাতকড়া দিয়ে যাকে বেঁধে রাখা যায়না
ফাঁসিকাঠ ভেঙে পড়ে যার পায়ের তলায়!
দেখেছি তোমার সেই মহিমান্বিত রূপ
'পাঞ্জাব সিন্ধু গুর্জর মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গে',
দেখেছি তোমার জ্যোতির্ময়ী ভবিষ্যত,
অনন্তবীর্যরূপিনী আত্মপ্রতিষ্ঠার মহাস্বপ্নে!
হে ভারত
আজ তুমি জেগে উঠেছ আমার যুগোত্তীর্ণ কণ্ঠস্বরের উদাত্ত গম্ভীরতায়,
আমার রক্ত-সমুদ্রের সৃজনোল্লাসে॥

১৫ আগস্ট ১৯৪৭

উত্তরাকাশের তারা

সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল আলোয় গড়া গম্বুজে
অদম্য কামনার তিনকোণা কাঁচে
রঙ-ফেরানো ছিল তার আভিজাত্যের গাম্ভীর্য।
সোনার জরিতে বোনা মহাপরাক্রমশালী পশুমুণ্ডলাঞ্ছিত নিশান
দেখে ভয় করতো।
অলিন্দে গবাক্ষে প্রাকারে পরিখায় সতর্ক-গম্ভীর রক্তচক্ষুরা
শাণিত কিরিচের ফলকে ফলকে ঝকমক করতো।
কালো রাত্রির জমাট দুর্যোগে
মাঝে মাঝে উঠতো যখন কালো ঝড়,
তখন কী আশ্চর্য লাগতো সেই জ্বলন্ত উজ্জ্বল আলোর গম্বুজ
সেই ত্রিকোণ স্ফটিকের অনির্বাণ বর্ণ-বৈচিত্র্য!
কী অসামান্য ঔদাসীন্যে উদ্ধত ছিল সেই আলোর গম্বুজ!

অযুত গ্রহতারকার চুমকি-বসানো মহাকালের কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গরাখা
আজকের মতো সেদিনও নির্মম ছিল অকম্পিত স্তব্ধতায়,
অদৃশ্য ইতিহাসের কষ্টিপাথরে
মানব-সাধারণের দর যাচাই হতো কিনা জানিনা।
শুধু অগণিত দীর্ঘশ্বাসের তিল তিল বহ্নিবাষ্প
ঘুলিয়ে উঠতো ব্যর্থ-বিদ্রোহের মেঘপুঞ্জে।
আর সেই নৈরাজ্য-পঙ্কিল বর্বরতার মহাতমসায়
অতিকায় নীলপদ্মের মতো ঝলমল করতো রাজকীয় গম্বুজ
নির্বিচার শোণিত-শোষণের মৃণালশীর্ষে।

ধর্মানুশাসিত সাম্রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে
ঘন ঘন চমকাতো যজ্ঞীয় উচ্চৈঃশ্রবার হ্রেষা-বিদ্যুৎ!
শতঘ্নী-তোমর-কোদণ্ড-ভল্ল-অসি-চক্র-খড়্গ-পিনাকের
অব্যর্থ মারণ-মহিমায়
মর্মস্পর্শী হ'য়ে উঠতো অসহায় প্রতিবেশীত্বের অভিশাপ,
ছারখার হতো উপেক্ষিত মানব-সাধারণের জৈবস্থিতি
ইতিহাসে যারা অনুচ্চারিত।
কথায় কথায় খ'সে পড়তো অনধিকারী শাস্ত্র-শিক্ষার্থীর মুণ্ড
অনার্য শস্ত্রপাণির মেধাবী আঙুল,
ঘৃণ্য পশুর মতো নিষ্পেষিত হতো মুক্তিভিক্ষু জনসাধারণ।
এমনি ক'রে উত্তুঙ্গ হ'য়ে উঠলো আকাশচুম্বী অত্যাচার,
উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠলো সেই রক্তস্নাত আলোর গম্বুজ!

বিক্ষোভ ঘনালো সামাজিক জীবনাকাশের মেঘে মেঘে।
প্রতিবাদ জমে উঠলো,
মাটির তলায়, গাছের ছায়ায়,
চাষের মাঠে, যন্ত্রীর যন্ত্রে, শিল্পীর তুলিতে
পুরুষের দানে, নারীর প্রতিদানে!
মূক-প্রতিহিংসার কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল সেই গম্বুজের
বহিরঙ্গ আকাশ।
কতবার জ্বলেও জ্বললোনা যুগ-যুগসঞ্চিত ইন্ধনরাশি!
বার বার নিবে গেল শত শত অমূল্য প্রাণ-স্ফুলিঙ্গ
অন্ধ নেতৃত্বের আত্মঘাতী পরিচালনায়,
ধ্রুবসাক্ষী জেগে রইলো শুধু উত্তরাকাশের তারা।

আবার জাগলো বিপ্লববিশ্বাসী জীবন-চেতনা
পরমৈক্যের বিপুল জোয়ার-জাগানো প্রাণছন্দে,
ঝড়ের শন্ শন্ শব্দ ঢেকে-দেওয়া প্রলয়-ঝংকার
কেঁপে কেঁপে উঠলো মহাকালের অশ্রুত সুরস্তম্ভের মহাপটে।
হঠাৎ সে গম্বুজ তলিয়ে গেল
অগণিত গ্রাম জনপদের প্রাণ-জাগানো মহাগঙ্গায়।
সমুদ্রগামী গাঙের একূল ওকূল জোড়া ঘোলা জলে
উজ্জ্বল আলোর চূড়াটা ফাৎনার মতো দু' একবার কেঁপে তলিয়ে গেল।

কত রাত্রি ফসফরাসের মত জ্বলতে দেখেছি তার স্মৃতিপুঞ্জ
ঝড় থেমে যাওয়া গাঙের ঢেউয়ে ঢেউয়ে।
তারপর থেকে জন্মালো কত নাগকন্যা, কত পাতালকন্যা,
কত পদ্মমুখী, কত স্বর্ণকেশী,
সেই আলোর গম্বুজ-ডোবানো ঘোলাটে গাঙের চরে চরে।

ভেসে উঠলো কত ময়ূরপঙ্খির পাটাতন
হীরার মাস্তুল, সোনার দাঁড়,
বাঁধ-ধ্বসানো বন্দর-ভাসানো পলিমাটির বিবর্তনে।
এখনো মাঝরাতে দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে যায়!
টকটকে লাল আকাশের পীত-পাংশু দিগন্তরেখায়
জলনিমগ্ন আলোর গম্বুজ আবার মাথা তোলে।
আকাশ-ছোঁয়া আভিজাত্যে গণতন্ত্রের মুখোস-আঁটা সাম্রাজ্যবাদীরা
চোখ রাঙায়
অণুবজ্র সংরক্ষণের অমায়িক হুমকিতে।
পাগলা গাঙ আবার জাগে কী নিঃশব্দ!
ঘুলিয়ে ওঠে থিতুনো জল
সুরু হয় রুদ্র-বসন্তের আলাপ,
অপরাজেয় আত্মোৎসর্গের বীণ বাজে
সিন্ধুযাত্রী মহাজীবনের তরঙ্গিত রাগমালায়।

আভিজাত্যের গম্বুজ-ভাঙা টুকরো টুকরো কাঁচে
সাতটি রঙের সাতশ' ঝলক!
জীবনকে ভালবাসা শেখাবার সাত হাজার বাতি জ্বলে
পৃথিবীর দু'শ কোটি প্রাণ-স্ফুলিঙ্গে দ্যুতিমান
সাম্যবাদী সাধনার অনিবার্য বিপ্লব-সাধনায়।
ইতিহাসের ক্ষমাহীন রঙ্গমঞ্চে
আবার সুরু হয় বিশ্ববিপ্লবের মহানাটক,
কোটি কোটি সর্বহারা নরনারীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানে।
জীবন-মহাগাঙের তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত যার ভাস্বর প্রতিজ্ঞা,
সমুদ্রবর্ণ আলোর গম্বুজকে
যে একদিন চমকে দিয়েছিল
ভ্রূকুঞ্চিত অসন্তুষ্টির আবির্ভাবে,
দিক্ নির্ণয়কারী সেই রক্তাগ্নিদেহ তারা জ্বল জ্বল করছে
উত্তরাকাশের বিরাট পটভূমিকায়!

১৭ অক্টোবর ১৯৪৫ —ফতোয়া

পরিক্রমা

সূর্যের লোহা গলিয়ে ঢালাই করা এই বুকে
গরুড় বাসা বেঁধেছে।
যার অমিত সংকল্প
দুর্ভাগিনী বিনতার দাসীত্বমোচন।
মাঝে মাঝে অতিকায় আগুনের ডানা মেলে
কলকাতার ওপর দিয়ে তা'র মহাপরিক্রমণ দূর—দূরান্তে...

নিচে পশ্চিমবাংলার বুকচেরা নদী
গঙ্গা—রূপনারায়ণ দামোদর
জ্বলন্ত রূপোর স্রোত
দিনে সূর্যের, রাতে চন্দ্রের লাবণ্যদীপ্তিতেও স্তিমিত।
কূলে কূলে নতুন ভারত গড়ে ওঠার সংকল্প
বিদ্যুতে ইস্পাতে কংক্রিটে মন্দাক্রান্তা!
হাজার ঘোড়ার গতিবেগ
থর থর ক'রে কাঁপছে আগামীর বিদ্যুতাধারে।
অসংখ্য মানুষ সেই দিনটির প্রতীক্ষা করছে
যেদিন ভারত মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে
ধনবাদী দাসত্ব-শৃঙ্খল চূর্ণ ক'রে
স্বয়ংসৃষ্ট মহাসাম্যের প্রশান্ত-গম্ভীর মহিমায়।

ঐশ্বর্যের একাধিপত্যলোভীরা সেদিন থাকবে না
থাকবে না অতিলোভের মহাপঙ্কশায়ী জলোকারা,
মানবকল্যাণের সেই পরম দিনে।
মাঝে মাঝে তাই অগ্নি-গরুড়ের মহাপরিক্রমা
দূর থেকে দূরান্তে
সীমা থেকে সীমান্তে
কলকাতা—দিল্লী—বম্বে—মাদ্রাজ—কন্যাকুমারিকা!
তার ইস্পাতের মতো বজ্রকঠিন ঠোঁটে
অমৃত উদ্ধারের সংকল্প!
তার দুই চোখে মুক্তিপিপাসার বৈদূর্যমণি!

১৫ই আগস্ট ১৯৪৯

বসন্ত এল

ব্রহ্মাবর্তের পাথুরে হাওয়ায় লাল ধুলো উড়িয়ে
বসন্ত এল।
কুরুক্ষেত্রের সারথিরা পেট্রলগন্ধী বাতাস কেটে লরী চালায়।
দুঃস্বপ্নের বিষে মরে গেছে ইতিহাস
দুচোখ-কানা ধৃতরাষ্ট্রের পৃথিবী।
বিশ্বরূপের বিরাট হাঁ-করা মুখের গর্তে
চন্দ্র আর সূর্যবংশের মাহাত্ম্য আজ বায়বীয়।
ভারতভুক্তির বেনামদারীতে নেটিভ-ক্ষত্রিয়দের উল্লাস
পদ্মপাতায় শিশির ছড়ানোর মতো।

ইন্দ্র—অগ্নি—বায়ু—বরুণ—
রাঠোর—চৌহান—ঘোরী—খিলজী—লোদী বংশাবতংসেরা কলম পিষছে
বাৎসায়ন কল্যাণমল্লের কামোদ্দিপ্ত পৌরুষের নিবীর্যতায়।

সুভদ্রা রিজিয়া পাইলটের পোষাকে কফি খাচ্ছে কফি-হাউসে!
পার্কে পার্কে মিটিং
সমানাধিকারের আওয়াজ!
জীবন-চেতনার প্রবল উদ্দীপনায় ফুটপাত লোকারণ্য!

লাল ধুলো উড়ছে আকাশে বাতাসে রাজপথে
হোলীর আবীরমাখা বসন্ত এল!
কলের বাঁশিতে নবযুগের পাঞ্চজন্য।
মাঠে মাঠে ঝলসে ওঠে সোনার লাঙল
যান্ত্রিক রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবিতায়।
লাল ধুলো উড়ছে কুলি ব্যারাকের শুক্‌নো রক্তে!
মিছিলের ঘূর্ণিশ্বাসে!

বসন্ত এল
ব্রহ্মাবর্তে—আর্যাবর্তে—দাক্ষিণাত্যে
অঙ্গে—বঙ্গে—কলিঙ্গে

১লা মে ১৯৪৭

সূর্য উঠবে

রূপালী চিতার আগুনে সূর্য পুড়ছে
পাঁশুটে ধোঁয়ায় রাত্রি ঘনালো
গম্ভীর বনচূড়া।
হঠাৎ একটা তারা চকিতে জ্ব'লে উঠে নিবে গেল।
আবার জ্বললো
কৃষ্ণচূড়া গাছটার ঠিক মাথার ওপর।
যে শিশু হঠাৎ অপঘাতে গেছে হারিয়ে
ঠিক তারি মতো দেখতে তারাটিকে
শুধু সেই শিশু আজো ফিরলোনা!

কোন আশাবাদী নাকি বলেছিল
প্রত্যেক রাত্রেই পৃথিবী অন্তঃস্বত্বা হয়
টন্‌ টন্‌ ক'রে ওঠে তার স্তন পাকা ফসলের রসমাধুর্যে!
গুরু নিতম্বের মন্থরতায়

চোখের কোলের কালিতে
পার্থিব সম্ভাবনার রাত্রি থম থম করে।
আশাবাদী বলেছিল ভোর হবে!
হারানো শিশু আবার ফিরে আসবে—
মৃত সূর্যের পুনরুজ্জীবনে;
নৈশ তারার সোনালি আলোয় তারি ইঙ্গিত তাই ভাস্বর!

সুরু হলো ঝিঁঝি ডাকা!
নীল রাত্রির শূন্যতাকে বিদ্রূপ ক'রে
গ্রামের পূবপ্রান্ত দিয়ে
সহরের দিকে ট্রেনটা হুইশ্‌ল বাজিয়ে চ'লে গেল।
সূর্য উঠবে।

২২শে মে ১৯৪৮

এক ছন্দে গাঁথা

'তদৈক্ষতঃ অহম্ বহুস্যাম!'
সৃষ্টির রোমন্থন
কবির অন্তরাত্মায়
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং অশরীরী সত্তায়
মনের গহনে
উপলব্ধির অতলান্তিকে।
ফিরে দেখবার সময় নেই
ক্রমাগত যাত্রা!
মন থেকে মনে, দেশ থেকে দেশান্তরে
ঋতুচক্রের রূপান্তরে।
ভৌগোলিক সীমারেখা অর্থহীন
চামড়ার রঙে রঙে আন্তর্জাতিক শিল্পকলা
সাহিত্যের রকমারি বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য।
অহংবাদীর আভিজাত্য তাই শুশুকের সর্দি!

প্রত্যেক মানুষ সেতুবন্ধের কাঠবেড়ালী
সমষ্টির মহাকাব্যে
ছন্দের যতিচিহ্ন, বিরামের ফুট্‌কি!
বৈবস্বত মনুর বিস্ময়
আদমের ইভের স্বপন
অযুত স্ফুলিঙ্গ কণা কালাগ্নি-রুদ্রের

গ্রহে গ্রহে তরঙ্গিত
কম্পিত সত্তায়!

মানবেতিহাসের বংশানুক্রমিক শোভাযাত্রায়
কোটি কোটি বুদ্ধিপিণ্ড চলেছে
দু'হাতে দু'পায়ে পৃথিবীটাকে ভাঙতে ভাঙতে গড়তে গড়তে
ধূসর মস্তিষ্কের দীপ জেলে
জীবনধারার দুরন্ত গতিবেগে
সুখ দুঃখের শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে।
মিথ্যা তাই হাঁক ডাঁক
আভিজাত্যের দম্ভ!
মানবসৃষ্টির ঘূর্ণাবর্তে ঢেউয়ের পর ঢেউ:
তেতো পিত্তি, লাল রক্ত, কালো কটা পাঁশুটে চুল,
ওঠা বসা দাঁড়ানো হাঁটা
এক ছন্দে গাঁথা
"সূত্রে মণিগনা ইব!"

১২ই ডিসেম্বর ১৯৪৩ —দ্বিপ্রহর

যে পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি

স্বর্ণশস্য-ছন্দিত মাঠ
ঘননীলাভ্র স্নিগ্ধ ললাট
উদয়াস্তের দিগন্তরেখা লাল চন্দনে চর্চিত।
নবসভ্যতা যন্ত্র-জমাট
ভেঙেছে কালের অন্ধকপাট
প্রাণ-ভাস্বরা হে বসুন্ধরা নমো যুগযুগ অর্চিত॥
কপালে কুমুদবান্ধব লেখা
রুপালী তারার চিত্রিত রেখা
পুষ্পিত প্রাণ বসন্ত-মদমত্ত অলির গুঞ্জনে।
মহামণ্ডলে বাঙ্ময় দ্যুতি
নানা মানুষের ছন্দানুভূতি
অসীম ঐক্যে মাতায় বিশ্ব আনন্দ-রস ভুঞ্জনে॥
প্রজ্ঞা মেধায় মহাবলবান
দীক্ষিত নরনারী সন্তান
জ্ঞানে ধ্যানে অনুরঞ্জিত করে শ্যামলী স্বর্ণমৃত্তিকা।
বিগত যুগের চিতানল শিখা
বেদনার স্মৃতি ম্লান মরীচিকা
লুপ্ত করেছ হে জ্যোতির্ময়ী কাঞ্চন কায়া কৃত্তিকা॥

প্রাণ-পুষ্পের অমৃত পরাগ
রস-মাধুর্যে গাঢ় অনুরাগ
রক্ত-চরণে যুগ-প্রগতির রজত নূপুর নিক্কণে,
তন্দ্রা ভেঙেছ তুন্দ্রালোকের
অরোরার শীত শুভ্রালোকের
আদি অজগর মরেছে কাতর গরলোদ্গারী সংক্কণে॥
উদয়াচলের লাল আভা জ্বলে
সমসুখভোগী শ্যাম অঞ্চলে
বিপ্লবী প্রাণ-কল্লোল কাঁপে প্রশান্তে অতলান্তিকে।
হে মহাপৃথিবী ঐক্যে মাতাও
দেশে দেশে নব সখ্য পাতাও
স্বাদেশিকতার ঘৃণ্য বর্ণবিদ্বেষী-যুগ-প্রান্তিকে॥

৭ই জুন ১৯৪২ —দ্বিপ্রহর

এশিয়া

এশিয়া মেধাবী আজ কোন দূর কুরুবর্ষে উদ্দীপক ঠিকানার খোঁজে
ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত সব স্মৃতি কঙ্কালের স্তূপ!
বৈকাল হ্রদের ধারে প্রেমিক বাসনা তার
যাকে চায় দেখেনিকো সে নারীর রূপ।
কত যে বালির ঝড়ে ঋক্‌ছন্দে উচ্চারিত গান
যজ্ঞের আগুনে কত নিষ্ঠুর প্রাণের অপমান
সব শিখা, সব সুর, সব মরীচিকা
কঙ্কালের হাসি শুনে রচনায় মেতে ওঠে নতুন গীতিকা।
সে গানের সুরে সুরে উড়ে গেছে দিগ্‌বিদিকে কত কারণ্ডব
লাওৎসি গৌতমবুদ্ধ কনফুশি খৃষ্টের আর হজরতের স্তব
কাল থেকে কালান্তর ঘূর্ণিবালু-চক্রে ঘুরে ঘুরে
নিরীশ্বর-ঈশ্বরের স্বাপ্নিক বোদের ঘাঘরা স্ফুলিঙ্গের নিঃশব্দ নূপুরে
ঠিকানা পায়নি আজো অনন্ত প্রতিভাময়ী
সে নারীর, ভোরে কিম্বা দুপুরে সন্ধ্যায়,
উরাল এলবুর্জ কারাকোরাম কুয়েনলুন হিমালয় পামিরের চূড়ায় চূড়ায়!

সে ছিল হারানো মেয়ে মরুযাত্রা পথে
যাযাবর উদ্দীপনা তার খোঁজে অগ্নিগর্ভ আশাবাদী ভগ্নমনোরথে,
তাঁবুর খুঁটিতে বাঁধা উটের ঘোড়ার পিঠে বসা
প্রত্যুষের সূর্যবর্ণ অঙ্গের লাবণ্য যার রাতের জ্যোৎস্নায় মদালসা
ভাস্কর্য সাহিত্য শিল্প নৃত্যগীত ললিতকলার
প্রসূতি সে বিজয়িনী বিশ্বনায়িকার

প্রাণ ছন্দ রূপ খুঁজে ইনিসি আমুর ভল্গা গঙ্গা সিন্ধু ইয়াংসি-কিয়াঙে
বাতাস-কাঁপানো শব্দ তরঙ্গগত প্রশস্তির গানে,
পায়নি সে প্রতিভাকে অথবা পেয়েও বুঝি বারবার নিঃসহায় হলো
ছাড়াছাড়ি,
নিবিড় নক্ষত্রপুঞ্জে পথ খুঁজে দেয়নিকো ছিন্নসূত্র চেতনার রক্তবহা নাড়ী।
কত পথ, পথপ্রান্ত, কত যে প্রাসাদ সেই হারানো মেয়ের
প্রেম চেয়ে ধূলিসাৎ অপ্রমেয় লুপ্ত সময়ের
জ্যোতির্বিদ-শূন্যে লগ্ন পায়নিকো খুঁজে,
তাই তারা কত যুগ বালুকা-শয্যায় শুয়ে
তারি কথা রাত্রিদিন ভাবে চোখ বুজে।

এশিয়া সবাই বলে যোজন যোজন দূর কালে
জ্বলন্ত মশাল-দীপ জলে স্থলে জ্বেলে সারি সারি,
আশ্চর্য রূপের মায়া শিবিরে শিবিরে অন্তরালে
সাজাতো দুরন্ত শয্যা পেশীপুষ্ট সেদিনেব মুগ্ধ নরনারী!
উদ্দীপিত জীবনের পথে প্রান্তরে
বার বার মৃত্যু গেছে প্রেমিকের পদাঘাতে ম'রে।
ফিরে গেছে বালুকায় তৃষাতপ্ত ঠোঁট ঘ'ষে রক্তপায়ী মরু শকুনেরা
খোলা তরবারি হাতে মরুঝড়ে অট্টহাসি হেসেছিল সেদিনের সেই প্রেমিকেরা।
সেদিনো খুঁজেছে তারা সে ভীমা ভৈরবী রাতে সৃষ্টির ঠিকানা
সংঘাতের অগ্নিঝড় বুকে নিয়ে সে দুর্যোগে লক্ষ্য শুধু ছিলনাকো জানা।

ইতিবৃত্ত ঢেকে-রাখা কত মণিমাণিক্যের অমূল্য পাহাড়
বুকে নিয়ে সেনাধ্যক্ষ সেনানীব হাড়,
রূপে রূপে অঙ্কুরিত উজ্জীবিত বিমর্দিত
কত শত সম্রাটের সার্বিক নিধনে,
কারুশিল্পী কলাবিদ কর্মী আর কৃষাণের মনে
জন্মেছে নতুন প্রেমে অবিশ্বাস্য অভ্যুদয়, দৃপ্ত এশিয়ার
ইলাবৃতবর্ষ থেকে কুমারিকা অন্তরীপ বহুবর্ণে জেগেছে অপার।

আজ সে পেয়েছে সেই অনন্ত প্রতিভাময়ী মানবিক প্রেমের ঠিকানা
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আজ তার মুক্তিপথ নয়কো অজানা।
প্রগতির যাত্রা পথে প্রেম এক অবিনাশী আশ্চর্য অঙ্কুর!
জীবনের জীবকোষে মরুজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী অণু থেকে অণুতর বজ্রগর্ভ সুর,
বেজে চলে মিলনের মহালগ্ন খুঁজে
সুরস্তম্ভ রচনার সূর্যশিখা জ্বেলে রাখে আকাশের জ্বলন্ত গম্বুজে।

১১ই এপ্রিল ১৯৪৫

জম্বুদ্বীপ

শালপ্রাংশু মহাভুজ শ্যামকান্তি হে মহাভারত!
হে বলিষ্ঠ পিতৃভূমি, বিবাগী বিষণ্ণ কেন আজ?
ভূতাবিষ্ট স্থবির মন্থর!
নীরব জীমূতমন্দ্র ওংকৃত আকাশ,
পাষাণ মুকুটে জ্বলে
স্তম্ভিত তুষারদীপ্ত হিমবহ্নিশিখা
হিন্দুকুশ হিমালয় কারাকোরামের
তুঙ্গজ্যোতি বিচ্ছুরণ
ত্রিমুণ্ড কালের স্তব্ধ ধেয়ান-প্রদীপে!

দূরে ইলাবৃতবর্ষ
সুমেরু পর্বতপ্রান্তে মহাশ্বেতকায়া
উদাসিনী আর্যমাতা,
আদি মানবের
সভ্যতার জন্মদাত্রী।
বিস্মৃত উত্তরকুরু,
কাস্পিয়ান, সিন-কিয়াঙ, অসুর-বাবিল,
কৌকাস, মোঙ্গল, সাইবেরিয়া,
মরুলিপ্ত যাযাবরী ধূ ধূ ইতিহাস
গোবিবক্ষে সৌরকরোজ্জ্বল
পীতাভ কর্ষণভূমি শীতোষ্ণ পিঙ্গল।

দুর্গম রোমাঞ্চকর তিব্বতী গুম্ফায়
শ্যাম ব্রহ্ম তুঙ-কিঙ নিপ্পনে
মহাচীনে শত শত বুদ্ধের কঙ্কাল
প্রবাসী ভারত-মূর্তি স্তম্ভিত বিশাল।
প্রাচ্যপ্রজ্ঞা-দেউলের রহস্যান্ধকারে
মন্ত্রপূত মায়াদীপ
হে গম্ভীর জম্বুদ্বীপ
তোমার আত্মার মরীচিকা
জিজ্ঞাসা-জটিলতত্ত্বে কত ভাষ্য কত তার টীকা।
অর্থহীন বৈরাগ্যে উদাস
নিষ্ঠুর নিষ্কাম সত্তা ধ্যানমৌন মুমুক্ষু নিঃশ্বাস।

হে মহান হে গর্বিত বিশাল ভারত!
যজ্ঞধূমে প্রেতবর্ণ তোমার বৈদিক মহাকাশে
বাসব বরুণ মিত্র জাতবেদাঃ বৈশ্বানর হাসে
হবি-ধেনু-স্বর্ণলুব্ধ তৃপ্ত দেবগণ,

মাটিতে কি রেখে গেছে অমেয় স্বাক্ষর
কৃষ্ণকায় অনার্যের রুধির জর্জর ?
আত্মার কৌলীন্যে আজো কী বিষণ্ণ পরিচয় তার
পারত্রিক প্রহেলিকা, বৈরাগ্য উদার !
অট্টহাসে মৃতকাল
শ্মশানে চণ্ডাল
জঙ্গলে পাহাড়ে ফেরে কোল ভীম অনার্য সাঁওতাল,
উপেক্ষিত অশিক্ষিত নিরন্ন কঙ্কাল
আসমুদ্র-হিমাচল জুড়ে।
ধ্যানের চিতায় পুড়ে পুড়ে
তোমার সন্তানগোষ্ঠী নির্জীব খোলসে ম্রিয়মাণ
ছন্নছাড়া জীবন ধারায়
নিরর্থক কালধ্বংসী নিরুপাধি প্রাণোপাসনায়!

সুমেরুশিখর থেকে দূরে দক্ষিণের
স্থলচর পক্ষীরাজ্য মেরু-অন্তরীপ
হে প্রাচীন জম্বুদ্বীপ,
তব আর্য-প্রতিভার দিগ্বিজয়ী উত্তুঙ্গ গম্বুজ
অগণিত বৌদ্ধকৃপাম্বুজে,
স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে পাষাণে নির্বাক
প্রশান্তসমুদ্র জুড়ে পক্ষভাঙা অযুত মৈনাক।
হে বিরাট জম্বুদ্বীপ,
ঐশ্বরিক দর্শনের সহযাত্রী কত
বস্তুবাদী ভাস্বর প্রদীপ
বার বার নিবে গেছে লোকায়ত চেতনার আলো
বলিষ্ঠ বিজ্ঞানভিক্ষু চার্বাক কপিল !

হে ভারত মহারথ,
পিছুহটা লগ্নে কবে "ব্রহ্ম সত্য, অনিত্য জগত"
জেবলেছিল মায়াবাদী মূঢ়তার চিতা
এ মানবপ্রগতির চরম শত্রুতা !
তোমার উদ্ধত বুকে যজ্ঞোপবীতের
স্বার্থান্ধ তক্ষক কবে করেছে দংশন,
প্রাচ্য-পৌরাণিক যুগে
বিষের জবালায় ভুগে
মরেছে সে মাতৃঘাতী জামদগ্ন্য রামের সমাজ,
নিবীর্য মৃত্তিকা তাই পৌরুষের রক্ত শুষে খায়।

স্থিতিবান ব্রহ্মাবর্ত আত্মদম্ভে হে দাম্ভিক ভূমি !
কোথা সে বিজয়লগ্ন

সীমান্ত-প্রসার স্বপ্ন
অগস্ত্যযাত্রায় ?,
সেদিন কি বিন্ধ্যবক্ষে জেগেছিল ব্রহ্মণ্য-দেবতা
সবিস্ময়ে চমকিত দ্রাবিড়ী প্রজ্ঞায় ?
সেদিনের উপেক্ষিত সুদূর বাংলায়
হে দাম্ভিক জম্বুদ্বীপ তোমার যজ্ঞের ঘোড়া এসে
ফেলে গেছে জয়পত্র দীনহীন বেশে !
সেদিন এ প্রাচ্যখণ্ডে ব্যাঘ্রতেজা নাস্তিক সন্তান
মানেনি বৈদিক স্তবগান
দুর্জয় প্রগতিবাদী গাঙ্গেয় মৃত্তিকা
প্রাণে শস্যে কী উজ্জ্বল তমঃশ্যামা লাবণ্যের শিখা !

হে বিষণ্ণ জম্বুদ্বীপ,
ঘোলাটে দুঃস্বপ্নময় বিস্মৃতকালের তমসায়
রাজসূয় নরমেধ যজ্ঞের শিখায়
আলোকিত হয়েছে কি কোটি কোটি প্রাণ-অন্ধকার ?
কোটি কোটি কঙ্কালের নশ্বর আধার ?
অত্যাশ্চর্য সংস্কৃতির মহার্ণবপোতে
অগণিত মানুষের আকাঙ্ক্ষার বুদ্বুদের স্রোতে
কোথা যাত্রা, কত দূরে, কোথা ঐকতান ?
সঙ্ঘের শরণবার্তা বৃহত্তম মানবের গান ?
বিমর্ষ ব্যথিত আজ আর্যাবর্ত ভূমি
দুর্গম নৈমিষারণ্য, কণ্টকিত কাম্যককানন
শ্বাপদ গর্জনে কাঁপে চৈত্ররথবন
ভয়াল দণ্ডকারণ্য সারা হিন্দুস্থান।
হে ভারত বৃথা গর্ব,
স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ,
অতিকায় মায়াবিম্ব বুদ্বুদের মতো
শূন্যময় উদাসীর ব্রত !

রক্তাক্ত খাইবার পথে পার্বত্য গৈরিক ধূলিময়
এল কত সেকেন্দর দুর্ধর্ষ উদ্দাম দিগ্বিজয়
স্বপ্ন নিয়ে বুকে !
চূর্ণ হলো সীমান্তের বেদিগর্ভে সাধনা-সম্পুট
রক্তপঙ্কে নিমজ্জিত হাতি ঘোড়া উট,
এল কত দিগ্বিজয়ী শ্বেতাঙ্গ বর্বর
নৈরাশ্যের ধূ ধূ তেপান্তর !
হে ভারত মিথ্যা কেন যবন ম্লেচ্ছের অপবাদ ?
সেইতো তোমার আশীর্বাদ
সেইতো তোমার ধর্মসাধনার পুণ্য কর্মফল

চন্দ্রবংশে সূর্যবংশে খণ্ড খণ্ড শাখা প্রশাখায়
ভেদবুদ্ধি কলুষিত আত্মঘাতী শিবিরে শিবিরে
সেইতো তোমার তীর্থ-মৃত্তিকার দিব্য প্রতিফল!

হৃতদর্প হে ভারত, কেন নিরুত্তর?
বার বার মনে পড়ে
রক্তক্ষয়ী সংঘাতের এল কালান্তর
পার হ'য়ে এশিয়ার পর্বত প্রান্তর
দুর্জয় উদ্দাম
মরুঝড়ে নবীন ইসলাম!
তারপর
অগ্নিধূমে ধূসর অম্বর—
চঞ্চল জীবনবন্যা মধ্যএশিয়ার
শত শত যোজন বিস্তার
চেতনা-বিদ্যুৎদীপ্ত কোটি অশ্বক্ষুরে
অদ্ভুত রোমাঞ্চকর রণোন্মাদ সুরে
এল দৃপ্ত ঐক্যবদ্ধ প্লাবন দুর্বার
চেঙ্গিসের জ্যোতির্ময় জীবন্ত আত্মার!
সিন্ধুনদে বন্যা এল ইউফ্রেতিস তাইগ্রিসের ঢেউ
পানিপথে ডেকে গেল দেশদ্রোহী কেউ
শত শত স্বার্থপর
সূত্রপাতে জয়চন্দ্র শেষলগ্নে ক্লীব মীরজাফর।

অতঃপর প্রচণ্ড ভাস্বর
কম্বুরেখা-চক্রপথে এল যুগান্তর
কুটিল সাম্রাজ্যবাদী প্রজ্ঞায় প্রখর
ব্রিটিশের এল নৌবহর,
তোমার উন্মুক্ত মহাসাগরসঙ্গমে
কূলে কূলে স্থাবর জঙ্গমে
এল হাহাকার
হে মহান জম্বুদ্বীপ সুরু হলো লাঞ্ছনা তোমার!
সামন্ত যুগের সূর্য পলাশী প্রাঙ্গনে
অস্তে গেল রুধির বমনে।

শতবর্ষ অবিরাম সংগ্রামের শেষে
যন্ত্রযুগ-চেতনার নবীন উন্মেষে
মিশে গেল মহাশূন্যে অর্থহীন তন্ত্রমন্ত্র পাঠ
ভ্রূকুঞ্চিত তোমার ললাট
মেধায় প্রদীপ্ত হলো বৈপ্লবিক নব উজ্জীবনে।

স্বর্ণাভ উদয়তীর্থে গৈরিক হিমানী বাষ্প ওড়ে
অদৃশ্য সূর্যের অভ্যুদয়
কত দূরে?
আদিগন্ত তরঙ্গিত গিরিশৃঙ্গমালা
স্তিমিত গম্ভীর মৌন,
সহস্র যোজন জুড়ে শালপ্রাংশু চেতনার বাহু,
ক্রমলুপ্ত অন্ধকারে মৃত কাল-রাহু
বিস্মৃতির কুয়াশায়
বলিষ্ঠ জীবন জাগে রক্তিম ঊষায়।
হে নবীন জম্বুদ্বীপ,
হিন্দুকুশ হিমালয় কারাকোরামের
ত্রিমুণ্ড তুষারশৃঙ্গে জ্বলে রক্তদীপ।

১লা জানুয়ারী ১৯৪১ —দ্বিপ্রহর

ইন্দ্রপ্রস্থ

অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ!
রাহুগ্রস্ত তুমি আজ বিস্মৃতির ছায়া
প্রশান্ত নীবব।
কালের নিশান ওড়ে তারাঙ্কিত গাঢ় নীলিমায়
মৌন নিশ্চেতন।
যুগান্তের রক্তবর্ণ ক্রূর ভ্রূকুটিতে
বিদীর্ণ স্ফটিক স্তম্ভ,
শুভংকর তাম্রকুম্ভ মর্মর-কুট্টিম।
মণিময় বেদিমূলে কারুশিল্প আঁকা
নাগেন্দ্র বাসুকীশীর্ষ বজ্রফণা হিরণ্য সম্ভার
ধার্তরাষ্ট্র পাণ্ডব সংহার!
বিধ্বস্ত বিষ্ণুব মূর্তি ত্রাণকর্তা গরুড়বাহন
ধ্বংসসাৎ শিলীভূত স্বর্ণশিখা দেব হুতাশন
পাষাণে স্তম্ভিত-কায়া
রূপায়িত বারীন্দ্র বরুণ
সংরক্ষিত যাদুঘর মহাভারতের।

ময়সৃষ্ট দ্বাপবের বিধ্বস্ত সে অতুলন সভা
অত্যাশ্চর্য মর্মর খিলান,
ক্ষত্রিয়ের স্থাপত্য মহান,
ঐশ্বর্য-প্রদীপ জ্বালা ভারত গৌরব
নিঃশেষে করেছে গ্রাস বিলুপ্তি-রৌরব।

শক হূণ গ্রীক তুর্কী মোগল পাঠান
তাতার আফগান
উড়ে গেছে কালান্তক ঝড়ে
বার বার ওঠে আর পড়ে
সাম্রাজ্যের কীর্তিস্তম্ভ দ্বেষদম্ভ অন্ধ-নায়কের।
ধর্মপ্রাণ মুসলমান
মসজিদে আজান হাঁকে পবিত্র গম্ভীর।
শত জীর্ণ শতাব্দীর
কেঁপে ওঠে ধূলো বালি কবর গম্বুজ
বিষণ্ণ ঈদের চাঁদ।
উদ্ধত স্পর্ধিত মূর্তি বণিক ইংরেজ
রক্তমুখে সাম্রাজ্যের শোষণের তেজ
ঘোরে ফেরে ক্লীব কৌতূহলে!
অশোকের ধর্মচক্র বিস্মৃতির অন্ধকারে জ্বলে!
ভারতের মুক্তি কাঁদে সবুট লাটের পদতলে।

যুগান্তর ভেদ ক'বে ভেসে আসে স্বপ্নের বিদ্রূপ
খল খল হাসে ক্রূর কালের কঙ্কাল
সর্বনাশা শকুনির পাশা!
ভেঙে গেছে রাজসূয় যজ্ঞসভা মণ্ডপ তোরণ
অপহৃত সুবর্ণ কপাট।
কুরুক্ষেত্রে ধূধূ করে মাঠ
কালের অমর ছেলে নির্বিকার চাষা চাষ করে।
হয়তো হঠাৎ ওঠে লাঙলেব ফালে
শতভগ্ন কপিধ্বজ রথচক্রনেমি,
গান্ধারীর ছিন্নহার,
কুন্তির বলয়,
পাঞ্চালীর মুকুটের মণি।
ধবিত্রীর আগ্নেয় ফাটলে
হাস্য করে মৃত্যুঞ্জয় বিদীর্ণ-করোটি অশ্বত্থামা
ধ্বংসের ত্রিযামা!
হয়তো হঠাৎ ওঠে জ্যোতির্ময় লাঙলের ফালে
জানুর হাড়ের টুকরো কুরু-সম্রাটের,
খণ্ড খণ্ড মহাকাব্যদ্যুতি
গণেশের হস্তলিপি বৈয়াসিকী কীটদষ্ট পুঁথি।
সমস্বার্থে অনুষ্ঠ্যুত অশোক আকবর
কোটি কোটি প্রজারক্তে কলুষিত মূক ইতিহাসে
স্তম্ভিত কুটিল অট্টহাসি!
আর্যাবর্তে মৃত্যুহীন লক্ষ লক্ষ চাষী চাষ করে।

রাহুগ্রস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ মহাবিস্মরণ
কীর্তিমান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
চাঁদ কবি, আবুল ফজল
রেখে গেছে প্রাণবন্ত আলেখ্য উজ্জ্বল
জ্যোতিষ্মান স্বর্ণকান্তি স্মৃতির অক্ষরে।
রবিশস্য গোধুমের ক্ষেত
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র
সুদূর উদ্যোগপর্বে দৈবনেত্রে দেখেছে একদা,
অগ্নিমুখ বিশ্বরূপ লেলিহবদন
চূর্ণীকৃত উত্তমাঙ্গ দশনান্তরালে
শোণিতাক্ত লালাবিম্ব কৌরব-বাহিনী
উদ্‌ভ্রান্ত লোভের স্বপ্নে বিনষ্টির ভয়াল চর্বণ।
প্রতিধ্বনি ভেসে আসে কালান্তক ঝড়ে
বারবার ওঠে আর পড়ে
শত শত মদোন্মত্ত মানব-সভ্যতা!

অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ
রাহুগ্রস্ত বিস্মৃতির ছায়া!
"ত্বমুত্তিষ্ঠ, লভো যশ, কালোঽস্মি করাল!"
জেগেছে মানবগোষ্ঠী গণ-মহাকাল
কোলাহলে মুখরিত স্টেশন্‌ বিশাল
দিল্লী নগরীর!
অগণিত শতাব্দীর
ভাগ্যসূত্র ছিন্নভিন্ন,
মুক্তিকাম হিন্দুস্থান ভীষণ গম্ভীর!

৭ই আগষ্ট ১৯৪২

তাম্রলিপ্ত

স্বপ্ন দেখি তাম্রলিপ্ত অবারিত সমুদ্রের কূলে
অসংখ্য বাণিজ্যপোতে সমাকীর্ণ বিরাট বন্দর!
শ্বেত পীত কৃষ্ণকায় দূরদেশাগত
পণ্যজীবি সুচতুর মেধাবী বণিক শত শত
মহাজন শ্রেষ্ঠী সদাগর
লুব্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠার পতাকা উড়ায়
পণ্য[illegible]ক-মন্দিরের সুবর্ণচূড়ায়।

স্বপ্ন দেখি তাম্রবর্ণ বলিষ্ঠ বাঙালী
বাংলার মৃত্তিকাছন্দে রূপায়িত বলিষ্ঠ সন্তান
সংগ্রামে অপরাজেয় সাহসে দুর্জয়
শ্রমনিষ্ঠ মুক্তগতি দেশ দেশান্তরে।
স্বপ্ন দেখি স্বদেশের বিগত সমাজ
অত্যদ্ভুত স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি
মনীষী পণ্ডিতবর্গ নিত্য দেয় শাস্ত্রের বিধান
অতিসূক্ষ্ম চুলচেরা বর্ণাশ্রমী প্রজার শাসনে।
পল্লীতে নগরে জনপদে
যুক্তপাণি নতদৃষ্টি হতভাগ্য অন্ত্যজের
নিঃশব্দ সঞ্চার;
সমস্ত আকাশ জুড়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম-বিভীষিকা!

স্বপ্ন দেখি ব্রাহ্মণের ত্রিপুণ্ড্রক চর্চিত ললাট
শুচিবায়ুগ্রস্ত কূট আত্মার প্রকাশে।
স্বপ্ন দেখি স্মৃতিকর্তা রঘুনন্দনের
স্বদেশের ভাগ্যাকাশে একচক্ষু অশ্লেষার মতো
দ্বিজোত্তম মহাশাস্ত্রী,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সুদৃঢ় নৈতিক দায়ভাগে;
স্বপ্ন দেখি দম্ভদৃপ্ত যৌবনের রুক্ষ ইতিহাস।
সহসা মিলায় স্বপ্ন!
বিস্মৃতি-কুয়াশা ঢাকা জেগে ওঠে ধ্বংসের শ্মশান;
আজ নেই তাম্রলিপ্ত, শুধু তা'র রুগ্ন প্রেত কাঁদে
বন্যায় বিধ্বস্ত গ্রাম অখ্যাত তমলুক!
ময়ূরলাঞ্ছিত ধ্বজা ছিন্নভিন্ন দেউলচূড়ায়!
দেউলের চিহ্ন নেই
অন্ধকার বেদিগর্ভে বর্গভীমা কঙ্কালমালিনী
প্রাণহীনা শৃঙ্খলিতা বৈদেশিক বাণিজ্য-শৃঙ্খলে।

অতীতের প্রতিক্রিয়া ভবিতব্য নয়;
আত্মপাপে দ্বেষদুষ্ট অঙ্গার মৃত্তিকা,
জননী ডাকিনী আজ!
বর্গভীমা ক্রূর ভয়ঙ্করী
প্রেতায়িত দুর্ভিক্ষের ধূমল আঁধারে।
স্বপ্ন দেখি তাম্রলিপ্ত বিগতযৌবন!
মাংসাশী শকুন ওড়ে সন্ধ্যার আকাশে,
অসীম নীরব দীর্ঘ প্রসারিত বন্দরের
মৃত বালুচর,
লবণাক্ত তরঙ্গ জর্জর!
জাহাজের প্রেতচ্ছায়া মসীকৃষ্ণ বঙ্গোপসাগরে

ধনলুব্ধ বণিকের বিষণ্ণ নরক!
স্বপ্ন দেখি তাম্রলিপ্ত অবলুপ্ত কীর্তির শ্মশান।

আবার বলিষ্ঠ স্বপ্ন দেখি,
জাগে নব তাম্রলিপ্ত দুর্যোগের অন্ধকার ফুঁড়ে
জ্যোতির্ময় জীবনের পটভূমিকায়
মুক্তির রক্তাক্ত লিপি ভেসে ওঠে আগ্নেয় অক্ষরে
শ্রেণীশূন্য দ্বেষশূন্য সুসংবদ্ধ বিশাল ভারত
জগতের নূতন বিস্ময়।

২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৫ —দ্বিপ্রহর

ভারত-প্রহরী

বলিষ্ঠ বাহু শিল্পসিদ্ধ আঙুলে
বুদ্ধিদীপ্ত শত শত মৃত শিল্পীর শ্রম-সাধনায়
গঠিত তোমার ভারত-প্রহরী মূর্তি
ত্রিমুণ্ড সদাশিব!
উচ্চৈশ্রবা বিলুপ্ত আজ কালের অস্ত্রাঘাতে।
আরব সাগরে শৈলদ্বীপের চূড়ায়
অধুনালুপ্ত ঐরাবতের স্মৃতিবিজড়িত
কোলাবার এলিফ্যান্টা,
ভারতভূমির পশ্চিম তটপ্রান্তে॥

প্রথম বিদেশী ভাগ্যবানের দলে
ভাস্কো-ডি-গামা দেখেছিল তব মহিমান্বিত মূর্তি।
ঐরাবতের অতিকায় রূপ দেখে
বিস্মিত বুকে রুক্ষ পাষাণ ভারতের ছবি এঁকে
পর্তুগীজেরা নাম দিয়েছিল দুর্জয় এলিফ্যান্টা!
সেদিন ঘৃণ্য জলদস্যুর অশুভ দৃষ্টিপাতে
ভারত ভাগ্য মরেছিল অপঘাতে,
গোয়া-পানাজিম-ডামান-ডিউতে
সে অপঘাতের নিষ্ঠুর বিভীষিকা
আজো দাউ দাউ জ্বলে মৃত্যুর শিখা॥

দূর দিগন্তে নীল অজগর
মত্ত ফেনিল উর্মিমুখর
ক্ষুধিত শূন্যে খাঁ খাঁ করে খর সূর্য!
কঠিন পাথরে শিলাকাটা গুহা

পাষাণ স্তম্ভশ্রেণী
মরা অতীতের হৃদয়াবেগের শিলীভূত প্রতিবিম্ব।
সন্ধানী চোখে কি চাও জানিনা
ত্রিমুণ্ড মহাকাল
স্তব্ধ বিষাণ বিপ্লবী রণতূর্য॥

অদূরে বণিকতীর্থ!
দেশবিদেশের জাহাজের ভিড়
সিন্ধুবিজয়ী মায়া সুনিবিড়
বোম্বাই বন্দর।
অগণিত পশু-প্রতীক শোভিত পতাকায়
উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদের অসংখ্য মাস্তুলে
আকাশের শরশয্যা।
তুমি আজ মৃত নির্বাক ঠুঁটো সাক্ষী
চেয়ে আছ উদাসীন
স্তব্ধ ডমরু বাজেনা রুদ্রবীণ
মূক বেদনায় অপমানে লজ্জায়
রক্তমেঘের ছায়াকম্পিত কোলাবার এলিফ্যান্টা॥

নেই আর সেই গর্বোন্নত ললাটের দূরদৃষ্টি,
স্তম্ভিত আজ সৃষ্টি!
শৈবযুগের স্থাপত্য জরাজীর্ণ
উমা-মহেশের মঙ্গলঘট
বিশাল ভারততীর্থ-তোরণদ্বারে
অভিশাপে শতদীর্ণ।
সূক্ষ্মরেখার ললিতকলার অবলুপ্তির শোকে
ইতিহাস কাঁদে আলো-আঁধারের থমথমে ছায়ালোকে।
ঐতিহ্যের কঙ্কাল শত শত
ভ্রষ্টদিনের ভিত্তি শ্মশানে পড়ে আছে নিরুপায়,
সিন্ধু-সারস মাঝে মাঝে উড়ে যায়
উপত্যকার ধানক্ষেতে হু হু হাওয়া।

তুমি আজো মূক স্তব্ধ পাষাণ কোলাবার এলিফ্যান্টা
ত্রিকালদর্শী ত্রিমুণ্ড সদাশিব,
চেয়ে আছ দূরে দিগন্তভেদী ভ্রূকুটি কুটিল চোখে
স্থির গম্ভীর ভারত-তোরণ দ্বারে,
ধূসর পাষাণে খোদিত মুকুট
হাতুড়ি বাটালি ছেনিতে খোদাই করা,
ললাটে তোমার ঘন পিনদ্ধ পিঙ্গল জটাজাল,
প্রলয়-স্বপ্নে অতন্দ্র উদাসীন

জেগে আছ তুমি ভারত-প্রহরী
ত্রিমুণ্ড মহাকাল।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

পলাশী

সোনার গোধূলি গভীর সবুজ বনান্তরালে সূর্য ডোবে
ছায়া-গম্ভীর আম্রকানন, রক্ত আলোয় গঙ্গাজল
বিষাদমগ্ন সপ্তকোটির ব্যথিত আত্মা তীব্র ক্ষোভে
ধু ধু পলাশীর প্রাঙ্গণে জাগে মুক্তির পণে অচঞ্চল।
আকাশ এখনো রক্তে লাল
প্রতিহিংসার ক্রূর হাসি হাসে দুর্ভাগা বীর মোহনলাল।

হামাগুড়ি দিয়ে এসেছিল যারা কটা চোখ রাঙা চামড়া গায়ে
আতঙ্কে মেশা আম্রকাননে লুব্ধ বিদেশী বণিকদল,
নবাবী স্বপ্নে বৃদ্ধ শকুন মীরজাফরের পক্ষ ছায়ে
ঘোলাটে ঘরোয়া পাৎকোর বুকে বিদেশের কালো বন্যাজল।
বন্যার মুখে লাগাও বাঁধ,
শূন্যে শূন্যে প্রতিধ্বনিত সিরাজ-কণ্ঠে সিংহনাদ।

ষড়যন্ত্রের সুড়ঙ্গ পথে পাপযোনী যত অবিশ্বাসী
লোভের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরা ভাগাড়ে মাটির অংশীদার,
জন্মভূমিকে করে গেছে যারা বিদেশী বেনের নবীনা দাসী
যাদের ঘৃণ্য নামোচ্চারণে অযুত রসনা আজো অসাড়।
আজো কোটি কোটি মীরমদন
শাস্তিদানের অস্ত্র শানায় অরণ্যবাসে কঠোর পণ।

পলাশীর মাঠে তুমুল ব্যঙ্গ ব্রিটিশের রণ-দামামাতে
ক্লাইভের জয় আজো সতের'শ সাতান্ন খৃষ্টাব্দকাল
কলুষ আখরে ইতিহাসে লেখা, কাব্যে নীরব বেদনাতে
স্তব্ধ করেছে নবাবের ঢোল বিজয়ী প্রাণের স্বপ্নজাল।
বাংলার সাথে গোটা ভারত
দেড়শ' বছর ভেঙেছে পাঁজর ছুটেও ছোটেনা মুক্তিরথ।

১লা জুন ১৯৩৮

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী

যীশুখৃষ্টকে বেওনেটে গি'থে বানিজ্য-তরী ভাসিয়ে
শিল্পোন্নত ইউরোপ থেকে শ্বেত-হাঙরের দল
প্রগতিবাদের জন্মদাতারা এলেন!
বৈশ্যতত্ত্ব খৃষ্টতত্ত্ব গণতান্ত্রিক তত্ত্ব
বাইবেলে ছেপে ক্ষমাতত্ত্বের মহিমায় গুলজার,
গীর্জা বানিয়ে পাদরী লেলিয়ে
গৃহ-বিবাদের ফাটলে সেঁধিয়ে
দিল্লীতে বুড়ো বাদশার পায়ে তেল দিয়ে মন ভিজিয়ে
ফর্মান হাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী
গোটা ভারতের সমুদ্রতীরে গঞ্জে বাজারে বন্দরে
মাংসের লোভে শকুনের মতো উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লেন!

বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের দুর্যোগে
অমায়িকতার শ্বেত অবতার বিনয়ী নম্রবেশে
এলেন ব্রিটিশ সিংহ!
রেশমী কেশর পিঙ্গল চোখ সোনার বরণ অঙ্গ
অসীম ক্ষুধায় রসনায় লালা ঝরে
রোমাঞ্চকর ফেউ-ডাকা ঘোর অন্ধকারের বুকে
বণিকের বেশে থাবা পেতে এসে বসলেন।
নবাবী যুগের রাজা মহারাজা জমিদার মহাজন
ভিটেয় ভিটেয় ঘুঘু চরাবার ঘৃণিত রাজ্যলোভে
অর্ঘ দিলেন সিংহের পাদপদ্মে;
ভগীরথবেশী বেইমান যত দেশদ্রোহীর দল
শঙ্খ বাজিয়ে শ্বেতপ্রভুদের স্বাগতম্ গান গাইলেন!

পলাশীর মাঠে গ্রেটব্রিটেনের বানিজ্য-সুরধুনী
জন্মভূমির দুকূল ছাপিয়ে
জীর্ণ পর্ণকুটির কাঁপিয়ে
অত্যাচারের বন্যার বেগে কলকলনাদে বইলেন!

উপনিবেশের সুবিশাল বুকে যান্ত্রিক নিরাপত্তায়
ছত্রভঙ্গ গ্রাম-জনপদ-নগরী
আষ্টে পৃষ্টে ইংরেজ প্রভু রেলপথ দিয়ে বাঁধলেন।
জমিহারা যত দুর্ভাগা চাষীদল
কঙ্কাল দিয়ে জাঙাল বানালো উদ্দাম নদীবুকে
গাঁইতির ঘায়ে পাহাড়ের বুক কেটে
উদ্ধত গোরাপল্টনদের বানালো শাসন-পথ
অবাধ শোষনে শ্বেতবণিকেরা হাঁকালো বাষ্পরথ

ভারতের মসনদে
কালা আদমীর মুক্তিদাতারা উড়ে এসে জুড়ে বসলেন!

তাঁতিরা হারালো মেধাবী আঙুল কৃষক হারালো জমি
ঘুণ ধরে গেল সর্বহারার হাড়ে,
শ্বেতপশুদের শোষণের বন্যায়
ভেসে গেল যত কুটিরশিল্প স্তব্ধ কামারশালা
বুকে চেপে যুগ যুগসঞ্চিত জ্বালা
খসে পড়ে গেল শিল্পীর তুলি গায়ক হারালো গান
বে-আইনী হল কবির কাব্য দুঃসহ অপমান!

বে-আইনী হ'ল জীবিকা জীবন
বে-আইনী হ'ল মুক্তির পণ
বে-আইনী হ'ল দেশপ্রেমের প্রাণ-ধারণের অস্ত্র;
নিবে গেল বাতি পাবনা ঢাকায়
মুর্শিদাবাদে তন্তুশালায়
ছেয়ে গেল দেশে ম্যাঞ্চেস্টর ল্যাংকশায়রের বস্ত্র।
মাংসলোলুপ গৃধিনীর রূপ ধরে
প্রগতিবাদের জন্মদাতারা উড়ে এসে জুড়ে বসলেন!

৭ই জুন ১৯৩৮

সুয়েজ খাল

বৃদ্ধ-এসিয়া নব-ইউরোপ মৃত্যুমগ্ন আফ্রিকার
বৈশ্যযুগের সিংহদ্বার।
দীর্ণ পাঁজরে বিগতদিনের কাহিনী
পণ্য-খড়্গে দ্বিখন্ড দেহ পশ্চিমী প্রাণ-বাহিনী
সুয়েজখাল!
শুকনো পাহাড়ী ধুলোয় লাল।

দূরে বহুদূরে উত্তমাশার আশা কেড়ে নিয়ে সোজা সড়ক
সন্ধান দিলে বিশ্বলুটের, কালাদের দেশে চলে মড়ক,
শ্রম-শোষণের যাঁতাকলে পিষে হাড় মাস হ'ল ভাজা ভাজা,
বৈশ্যতীর্থ ইউরোপ জুড়ে ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে বেনে-রাজা
মানুষ করবে বিশ্বকে!
সাথে করে নেয়, কখনো শাসায় সমব্যবসায়ী শিষ্যকে;
তুমি সবই জানো সুয়েজ খাল,
বুকে ক'রে শুধু কুমীর বহেছ দীর্ঘকাল!

মন্থরগতি ইস্পাতী রঙ আনাগোনা করে নৌবহর
উদ্ধত শ্বেত সওদাগর।
সাম্রাজ্যের লুণ্ঠিত ধনরত্নের ভারে দোলে জাহাজ,
মত্ত মাতাল মানোয়ারী গোরা সজাগ পাহারা গোলোন্দাজ।
নিগ্রো-হাবসী-বেদুইন আজ দীনমজুর,
বেওনেটে কাঁপে শ্বেতজুজুর।
শ্যামলতাহীন পাটল পাংশু মরু-উপকূলে খেজুর বন
তীক্ষ্ণ কাঁটার মর্মর গানে কী উন্মন!
দুর্দিনে তবু স্বপ্ন-বিভোর কারাভান উট মরূদ্যান
সিমুম ঘনায়, কোথা কতদূরে কৃষ্ণ-সাগর কাস্পিয়ান্?
কোথা কতদূরে ভল্গার তীরে চিরমানুষের মুক্তিগান?
স্বপ্ন-বিভোর সুয়েজ খাল
লোহিতসাগরে নীল জলরাশি রক্তমেঘের আভায় লাল।

পশ্চিমতটে মিশরী-উষর শিলীভূত মহামরুপাহাড়,
পূর্বপ্রান্তে স্তিমিতবীর্য সোদীআরবের জুড়ানো হাড়।
লোহিতসাগর উপকূল জুড়ে কী গম্ভীর!
পুঞ্জিত রোষ হু হু করে শত শতাব্দীর!
বালুকণিকায় ভারী বাতাস
শূন্যে ঝড়ের লাল আভাস!

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ —দ্বিপ্রহর

প্রাচীন মিশর

ফ্যারাও মেনেস দর্পী টুট-আঙ্-খামেন্
সম্রাট খুফু দুর্জয় সেফরেন্
উঁচু নাক তুলে শায়িত অসাড় চিত্রিত শবাধারে
কারুশিল্পের জটিল অন্ধকারে।
রাজকীয় প্রেত ধু ধু করে সাহারায়
রামেশিস্ খোঁজে ওয়েশিস্ ক্রূর কামনার পিপাসায়।
ইতিবৃত্তের অসম চরণপাতে
দুরন্ত সংঘাতে
মত্ত-সিমুম দামাল ঘোড়-সওয়ার
জ্বলন্ত মরুশিখার মশাল হাতে নিয়ে দুর্বার
ঘূর্ণীবালুর ঝঞ্ঝার বেগে ছোটে
দিগন্তে কাঁপে মৃগ-তৃষ্ণিকা রক্তশূন্য ঠোঁটে।

বিশাল পাথরে গাঁথা
স্ফিংক্সের থাবা একদা ছিঁড়েছে কত শত কাঁচামাথা!

বন্দিনী দাসী বন্দী দাসের নিষ্ঠুর অপঘাতে,
সিংহশরীর নারীমুণ্ডের লুব্ধ শাণিত দাঁতে,
উদ্ধত মৃত মিশরের ইতিহাস
কত না পতন অভ্যুদয়ের জমাট দীর্ঘশ্বাস!
আসমান জোড়া সফেদ বালির ঘূর্ণীঝড়ের বেগে
জ্বলন্ত কত বিদ্যুৎ কত সূর্য ডুবেছে মেঘে
বাঁকা তলোয়ার কামানের গোলা অশ্বের হ্রেষাধ্বনি
হুংকৃত কত ভ্রুকুটি কুটিল আদেশের তর্জনী
সাফ হ'য়ে গেছে অগ্নি-মরুর বুকে
একটানা শুধু হাবসী নিগ্রো দাস দাসী মরে ধুঁকে,
নীলনদ-অববাহিকার বুক জুড়ে
অযুত ক্ষুধিত ভূমিদাস মরে অনলরৌদ্রে পুড়ে।
ক্রুর পিঙ্গল অগ্নিমরুর ঝড়ে
শিলীভূত কোটি প্রজার পাঁজরে পাষাণভিত্তি নড়ে।

চিড় খাওয়া ভিত্ অন্ধ অতীত মিশর দোলায়মান
সমাধিচূড়ায় শব-সাধনার সদম্ভ অভিমান!
বুকে চেপে রাজা-বাদ্শার মড়া রাজকীয় সম্পদে
পাষাণের ছায়া ফেলে পিরামিড উদ্দাম নীলনদে!
শূন্যে শূন্যে স্পন্দিত হাহাকার
গ্রহ-গণনায় বিজ্ঞানী বীর টলেমীর স্মৃতিভার!
সাম্রাজ্ঞীর প্রেতিনী-প্রেমের নৈশ নীলাঞ্চলে
ক্লিওপেট্রার উজ্জ্বল চিতাবাঘের চামড়া জ্বলে।

৩রা জুলাই ১৯৩৪

টাসমানিয়া

শ্বেতবণিকের রক্ষিতা দ্বীপ সাদা প্রভুদের উপনিবেশ
টাসমানিয়া!
দূর দক্ষিণ-সাগর-প্রান্তশায়িনী
চেনা জগতের ইতিহাসে ছিলে অপরিচিতা
রোমাঞ্চকর অন্ধ অতীত কাহিনী!

স্তব্ধ নীরব পিঙ্গ পাহাড় অজাগরী মহাবন
নীলাভ ধূসর তমসাগর্ভে ঢাকা;
সবুজ ইউক্যালিপ্টাস তরুশাখে
বীণা-বিহঙ্গ কৃষ্ণ-মরাল সোনালি-পায়রা ওড়ে,
শৈলচূড়ায় ঝলমল ক'রে শ্বেত-ঈগলের ডানা।

রৌদ্রদীপ্ত রুপালি নদীর চরে
অঘু পালখের ঘাঘরা নাচায় "এমু"-রা হর্ষভরে।
মহারণ্যের দুরারোহ গাছে গাছে
উড়ে উড়ে চলে কাঠবিড়ালীরা উড়ুক্কু শিবাদল
রক্তাভ নীল চঞ্চল চোখ জোনাকির মতো জ্বলে।
থমথমে বনপ্রান্তর উদাসীন
ভীরু ক্যাঙারুর নিরীহ শাবক নির্ভিক উপজঠরে।

মরালচঞ্চু ছুছুন্দরীরা স্থল-জল-বিহারিণী,
ফ্যাস্ ফ্যাস্ ফ্যাস্ অপোসাম শিশু অদ্ভুত হাসি হাসে।
কঠিন বর্মে বিরাট কুর্ম অহিংস তৃণভোজী
মন্থর আভিজাত্যে অলস নির্বিকার;
ক্বচিৎ কোথাও সমাধিমগ্ন মহাকায় অজগর
প্রাণায়াম করে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে।
লকলকে লাল দ্বিখণ্ড জিব মেলি
বনজ পঙ্কে শীকারলুব্ধ অতিকায় সরীসৃপ
বর্ণ ফেরায় বহুরূপী গিরগিটি
অতিকায় আদিশ্বাপদের শেষ বংশধর॥

অজানা যুগের মহাপ্রলয়ের মৃৎ-বুদ্বুদ টাসমানিয়া
পাতালের কোন সহস্রফণা নীল-নাগিনীর শিরে,
আশ্রিতা তুমি অষ্ট্রেলিয়ার পাদপূরণের ছন্দে
চক্ষু ধাঁধানো হীরকোজ্জ্বল আঁধার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রোমাঞ্চকর ভাঙা পঞ্জর দুর্বোধ বেদনায়।
ছায়াগম্ভীর বনস্পতির জটিলারণ্যতলে
পত্রপুঞ্জে চূর্ণ চূর্ণ কৃপণ সূর্য জ্বলে,
রহস্যঘন আদিপ্রকৃতির দুর্গম অঞ্চলে
চেতনাতীতের মন্থর তন্দ্রায়।

এল পশ্চিম-সাগরের ঢেউ শুভ্র-রক্তফেনা
বলিষ্ঠতম প্রাণ-তরঙ্গ উজ্জ্বল চেতনায়,
ইতিহাস তব মুছে দিয়ে গেল শোণিতের বন্যায়
হাঙরের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে কূল ছেয়ে
সিন্ধুবিজয়ী বণিকের দল সাতসমুদ্র বেয়ে।

অপরিচয়ের ছায়াচ্ছন্ন কুয়াশায়
বুমেরাং হাতে তোমার আদিম সন্তানদল সুখেই ছিল।
থাক বা না-থাক ধর্ম-মৈত্রী-সাম্য,
পরের রাজ্য ছিলনা তাদের কাম্য

ছিল প্রেম ছিল সংসার ছিল পঞ্চায়েত
মৃত্যুর পরে মৃত্যু-কারণ ওঝাকে জানাতো স্বয়ং প্রেত (?)
নাইবা জানতো কৃষি-বাণিজ্য মারণ-অস্ত্র নির্মাণ
নাইবা জানতো আগুন জ্বালতে তবুতো মরেনি সন্তান,
ক্যাঙারুর মত বুকে রেখেছিলে টাসমানিয়া
বিপুল গভীর স্নেহে।
কে জানে কোথায় দুর্জ্ঞেয় কোন অন্ধকারে,
বুন্দাই আজো ঘুমে অচেতন বাম বাহুভরে এলায়ে দেহ,
দক্ষিণ বাহু প্রোথিত অতল বালুকায়
অস্ট্রেলিয়ার আদিমবৃদ্ধ টাসমানিয়ার দেবতা।
একদিন ঘুম ভাঙবেই
কবে কতদিনে ঠিক নেই
সেদিন হয়তো চরাচর গিলে খাবে
সেইদিন যত আদিমের প্রেত আঁধারে মুক্তি পাবে ?
সে ঘুম আজিও ভাঙেনি আকাশ রাঙেনি প্রলয়-আগুনে
হায় অভাগিনী টাসমানিয়া !
দুর্ভাগা যত ফিরিঙ্গীদলে নিঃসন্তান হয়েছ আজ,
স্বনাম তোমার মুছে দিয়ে গেছে যাযাবর শ্বেত ওলন্দাজ
জান্‌জুন্‌ তাস্‌মান্‌ !

তারপরে ক্রুর নিষ্ঠুর নরমুণ্ড-শিকারীদল
যান্ত্রিক ঐশ্বর্যে অন্ধ সাতসমুদ্র তেরনদী পার হয়ে,
নিশ্চিহ্ন করেছে তোমার বন্য উদ্দাম সংসার
অগ্নুদ্গারী মারণাস্ত্রের বলে
সাম্রাজ্যের আকাশে যাদের উদয় অস্ত নেই।
দূর দক্ষিণ-সাগর কোলে
যীশুখৃষ্টের ক্রুশচিহ্নিত প্রেমের ব্যঙ্গ-জাহাজ দোলে,
চাঁচর চামর দাড়ি নাড়ে শ্বেত পাদরী,
মধুর বচনে শ্রীমথি লিখিত সুসমাচার
মুক্তি দিয়েছে আদিমজাতির আদিপাশবিক অজ্ঞতার।
বুন্দাই তবু অনন্ত ঘুমে মগ্ন
অনাবিষ্কৃত অরণ্যে ঘেরা দুর্গম গিরিকন্দরে;
আজিও সে ঘুম ভাঙেনি আকাশ রাঙেনি টাসমানিয়া,
শ্বেতবণিকের কলকারখানা ক্ষেত্রে খনিতে বন্দরে
তোমার অভাগা সন্তানদল বিলুপ্ত বহুকাল,
পিঙ্গল মাটি সাদা হ'য়ে গেছে মিশে গেছে কঙ্কাল !
আজ সে মাটির বুকে
উপনিবেশের ধনোন্মত্ত উদ্ধত যত বৈশ্যদল
বসবাস করে অনন্ত কৌতুকে।

দূরে দক্ষিণ-সাগরপ্রান্তে শ্বেতবণিকের নূতনা প্রিয়া
বৈশ্যের কৌটিল্যমন্ত্রে রূপান্তরিতা টাসমানিয়া!
বৃন্দাই আজো ঘুমে অচেতন
সে ঘুম আজিও ভাঙেনি আকাশ রাঙেনি টাসমানিয়া,
মা বলে ডাকবে বেঁচে আছে শুধু মুষ্টিমেয়
লাঞ্ছিত ভীরু দীন ক্রীতদাস দুঃখ যাদের অপরিমেয়;
আকাশ এখনো রাঙেনি টাসমানিয়া
আকাশ এখনো রাঙেনি!
অনাদিকালের বুদ্ধের ঘুম ভাঙেনি!

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

ইতিহাস

মাঝে মাঝে ইতিহাস পথ ভুল করে
অলিখিত চেতনার তমোগহ্বরে,
চমকায় গ্রহভাঙা উল্কার আলো
ছড়ায় যেটুকু দ্যুতি মন্দের ভালো
তাই নিয়ে গর্বের অন্ত না পাই
দোষ ত্রুটি বরাতের স্কন্ধে চাপাই!
স্বপ্নের বুনো হাঁস শূন্যেই চরে॥

ভুলপথে শোনা যায় বন্দীর গান
আসে না সমাজে তাই সংকটত্রাণ,
এলোমেলো তর্কের ঘূর্ণীপাকে
আদর্শ ডুবে যায় ত্রুটির পাঁকে
তুষ্টি জানায় শুধু মুষ্টিমেয়
বহুর বেদনা আজো অপরিমেয়
তুঁষের আগুনে জ্বলে শত শত প্রাণ॥

কভু দ্রুত কভু ধীর কালের গতি
অসম অবোধ কভু ছন্দ যতি;
অবুর্দ চক্রের সামাজিক রথ
গোলক ধাঁধায় ঘোরে একটানা পথ,
মাঝে মাঝে ভেঙে যায় বৃত্তরেখা;
তালে তালে পা-ফেলার ছন্দ শেখা
শুরু হয় ঘুচে যায় অসঙ্গতি॥

এগুতে এগুতে ফের পিছনে হটে
মুখে মুখে উদ্ভট কাহিনী রটে,
পিছুদিকে মুখ ক'রে এগোয় দ্রুত
গতিটাই শেষে হয় মনঃপূত।
প্রলয়ের গুরু গুরু গিরি বিদারণ
গ্রাস করে শিলালিপি তাম্রশাসন
থাকে না চিহ্ন প্রাণসিন্ধুতটে॥

কা'র বর্শায় ছিল কতখানি ধার
ক'টা মাথা কেটেছিল কা'র তলোয়ার
কামানের কেরামতি দূর পাল্লায়
ক'রে গেছে মানোয়ারী মাঝি মাল্লায়,
সে সব কাহিনী নয় মানবেতিহাস
অথবা অশ্রুজল দীর্ঘনিশ্বাস্
প্রগতি শঙ্খমুখী অকুল অপার॥

মাঝে মাঝে স্বার্থের রণ কোলাহল
উদ্‌গার ক'রে যায় সুধা হলাহল
ভেঙে যায় ভূগোলের পাঁচিল ঘেরা
যাযাবরী আত্মার মাটির ডেরা।
মিশ্রিত নব নব রক্তধারায়
কুলীন জাতিরা কৌলীন্য হারায়
জাগে নবসভ্যতা প্রাণচঞ্চল॥

নব নব চেতনার স্পর্শ লাগে
মরাডালে কিশলয় নিভৃতে জাগে
যন্ত্রের মূর্চ্ছনা কাঁপে মৃৎ-মন্দ্রে
জাগ্রত জীবনের এ সমাজতন্ত্রে!
দেশে দেশে মিলনের সাম্যসেতু
উড়ায় জগতজুড়ে বিজয়-কেতু
ঘুমভাঙা ইতিহাস রক্তরাগে!

১লা বৈশাখ ১৩৫৩

বাল্মীকি

প্রসন্ন প্রভাতবেলা তমসার তটে
ভারত-কাব্যের আদিপিতামহ কবি
ছন্দে গাঁথি ক্রৌঞ্চশোক বেদনার পটে
এ'কে গেছ আদিকাব্যে মৃত্যুঞ্জয় ছবি।
আর্য-অনার্যের চির সমাজসংকটে
অনার্যেরা ছিল আর্য-যজ্ঞানলে হবি
পরস্পর রক্তক্ষয়ী যে সংগ্রাম ঘটে
তব সৃষ্ট রামায়ণ তারি প্রতিচ্ছবি।

তুমি ছিলে আর্যকবি তাই রাঘবেরে
বসায়েছ ঈশ্বরের উত্তুংগ আসনে
লংকার অনার্যরাজা রাবণকে মেরে
রাজপদে বসায়েছ ঘৃণ্য বিভীষণে।
আজো তাই মহাদম্ভে ঘোষে রামায়ণ
সীতার সতীত্ব-যজ্ঞে রাবণ নিধন।

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

বেদব্যাস

শূদ্রাণী মাতার পুত্র অনার্যশোণিতে
পুষ্টদেহ ভারতের পরম বিস্ময়!
অবিশ্বাস্য মেধা তব এই ধরণীতে
রেখে গেছ প্রতিভার দীপ্ত পরিচয়!
কী আশ্চর্য যুগেযুগে অসংখ্য পণ্ডিতে
পাঠ করি কৃতবিদ্য করে দিগ্বিজয়,
বেদের বিন্যাসে, মহাভারত-সঙ্গীতে
তোমার অমেয় কীর্তি রয়েছে অক্ষয়।

ঐতিহ্যের কূটতত্ত্ব-সাধনার বুকে
লক্ষ লক্ষ শ্লোকবন্ধ উপাদানরাশি
ইতিবৃত্ত রচনার অনন্ত কৌতুকে
সংকলিত করে গেছ প্রজ্ঞায় উদ্ভাসি।
শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ
ধন্য তুমি ব্রাহ্মণেরও প্রণম্য ব্রাহ্মণ।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

কপিল

হে আদিবিদ্বান ঋষি, হে জড়বিজ্ঞানী,
ত্রিবিধ দুঃখের শেষ খুঁজিতে খুঁজিতে
পঞ্চ-তন্মাত্রের বুকে পেলে তত্ত্ববাণী
বিচিত্র পদার্থে পূর্ণ এই পৃথিবীতে।
রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ মাঝে জানি
কভু স্থূল কভু সূক্ষ্ম সাংখ্য প্রকৃতিতে
রোমাঞ্চিত জীবকুল হে সত্য-সন্ধানী,
আস্তিকেরা তব তত্ত্ব পারেনি খণ্ডিতে।

বেদবিধি যজ্ঞকাণ্ড করোনি স্বীকার,
বলিষ্ঠ প্রাঞ্জল তব চিন্তার আকাশে
ছিলনা স্বপ্নের মেঘ তমো অন্ধকার,
বিহ্বল হওনি কভু বিন্দু অবকাশে।
কদাচ করোনি ভুল ভাবে অনুভাবে
ঈশ্বর অসিদ্ধ তাই প্রমাণ অভাবে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

মনু

হে নিষ্ঠুর তুমি নাকি মানবের পিতা?
ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ ধর্মবৃক্ষশাখে
হেঁটমুণ্ডে ঝুলে ঝুলে করাল সংহিতা
উচ্চারিতে শাসনের রুদ্র-জয়ঢাকে
শব্দ তুলে; ভূমিমাতা ভয়ে প্রকম্পিতা!
হে মনু তোমার দুর্গে দারুণ বিপাকে
শূদ্রগণ প্রাণ দিত। বর্ণাশ্রমী চিতা
জ্বলে যেত ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের ফাঁকে

রেখেছিলে নারীদের জ্ঞানবিবর্জিতা
নারীদ্বেষী ললাটের ভ্রূকুটি-বৈশাখে,
পুণ্যের কী পরিহাস তব যজ্ঞশালা
গ্রাসিত অনলগর্ভে আর্ত নরমেধ!
কণ্ঠে পরি অনার্যের নরমুণ্ডমালা
হে ভীষণ, উচ্চারিতে মুখে চতুর্বেদ!

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

দক্ষ

দম্ভের সম্রাট তুমি দক্ষপ্রজাপতি
আভিজাত্যে অদ্বিতীয় বিশ্বচরাচরে,
বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলে মানব-সংহতি
বর্জন করিয়া গণ-দেবতা শংকরে।
ভাগ্যের কী পরিহাস তব কন্যা সতী
ভিখারীর কণ্ঠে মালা দিল স্বয়ম্বরে
অনাদরে চলে গেল নবীন দম্পতি
ক্রুদ্ধ হ'লে অবাঞ্ছিত জামাতার পরে।

অতঃপর শিবহীন যজ্ঞ অনুষ্ঠিলে
নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করি দেবগণে
অনাহূতা কন্যা সতী সভায় আসিলে
মহেশ্বরে গালি দিলে কুৎসিত ভাষণে।
শিবনিন্দা শুনি সতী বিসর্জিল প্রাণ
ছাগমুণ্ড হ'লে করি রুদ্রে অপমান।

৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

শ্রীকৃষ্ণ

কারাগারে জন্ম তব বন্দিনী-জঠরে
বন্দীপিতা সদ্যোজাত হে শিশু তোমায়
রেখে এল নন্দালয়ে নির্ভিক অন্তরে
চুপিসাড়ে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাতমসায়।
একে একে শত্রুগণে বধি' হেলাভরে
বৃন্দাবনে মুক্তশুদ্ধ প্রেমের লীলায়
সিদ্ধ হ'লে। বধি কংসে দ্বৈরথসমরে
ভাঙিলে পাষাণ কারা চরণের ঘায়।

উদ্ধারিলে বন্দীগণে। রাজা যুধিষ্ঠিরে
সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিলে অখণ্ড ভারতে,
বীর্যবলে আসমুদ্র হিমাচল ঘিরে
দেখালে দুর্জয় রূপ কপিধ্বজ রথে।
সর্ববিদ্যাবিশারদ ভারত-সন্তান,
মূর্খ যারা বলে তুমি মূর্ত ভগবান।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

একলব্য

জন্মিয়া কিরাতকুলে অনার্য সন্তান
বার বার নিগৃহীত আর্য-অত্যাচারে
কী সংকল্পে ব্রতী ছিলে আরণ্যক প্রাণ
সভ্যতার উপেক্ষায় মৌন অন্ধকারে?
রণগুরু দ্রোণ শিক্ষা করেনিকো দান
অস্পৃশ্য নিষাদ বলি ঘৃণ্য অবিচারে,
বক্ষে চাপি উপেক্ষার রুদ্ধ অভিমান
আরম্ভিলে অস্ত্রশিক্ষা নির্জন আঁধারে।

একদিন আসিলেন সে অরণ্য বুকে
আর্যরাজপুত্রগণে সাথে লয়ে দ্রোণ,
শব্দহীন বাণবিদ্ধ কুক্কুরের মুখে
তোমার আশ্চর্য শিক্ষা করিল দর্শন!
কী ভুল করিলে দ্রোণে গুরু বলে মানি,
দক্ষিণায় অস্ত্রসিদ্ধ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দানি!

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

কর্ণ

বুঝি তব অভিমান কর্ণ মহারথী
সূতপুত্র পরিচয়ে অবজ্ঞাত প্রাণ!
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মাঝে চরম দুর্গতি
সহিয়াছ ক্ষুব্ধ বুকে তীব্র অপমান।
কিন্তু কেন ঈর্ষা তব অর্জুনের প্রতি?
জননী কুন্তির পাপে, তুমি বীর্যবান
কেন হ'লে ক্ষুদ্রমনা? পাণ্ডুর সন্ততি
ভ্রমেও করেনি কভু তব অসম্মান।

অদ্বিতীয় দাতা ছিলে অজেয় ধানুকী
তবু কেন কৌরবের হ'লে অন্নদাস?
নিজেও পেলে না সুখ করিলে না সুখী
আত্মজনে আজীবন ফেলি দীর্ঘশ্বাস!
শেষলগ্নে রথচক্র গ্রাসিল মেদিনী
সূর্যাস্তে নামিল সন্ধ্যা শঙ্খনিনাদিনী।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

দ্রৌপদী

প্রতিহিংসাযজ্ঞে তুমি শিখাস্বরূপিণী
দ্রুপদের একনিষ্ঠ তপস্যার ফলে
জন্ম তব; অবিশ্বাস্য অদ্ভুত কাহিনী
রচিলেন বেদব্যাস কাব্যের অনলে।
বীর্যশুল্কা তুমি পঞ্চবীরের কামিনী
তোমায় লাঞ্ছিত করি মহারণস্থলে
ঘনালো বিষাদঘন নিবিড় যামিনী
লেলিহান কৌরবের ধ্বংসচিতা জ্বলে।

দুঃশাসন বক্ষরক্তে তব মুক্তবেণী
বাঁধিলে ভৈরবীসম অট্টহাসি হেসে,
দুর্জনের শাস্তিরূপা অয়ি যাজ্ঞসেনী
শান্ত হ'লে কুরুক্ষেত্রে প্রলয়ের শেষে।
নিখিল নারীর গর্ব হে মহাভারতী,
তব রোষে ভস্ম হ'ল কত রথ রথী!

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

মেনকা

সাধকের সাধনায় মহাবিঘ্ন তুমি
মহাতপা বিশ্বামিত্র মানে পরাজয়
কে করিবে আধিপত্য সাধ্য কারো নয়
তোমারে জড়ায়ে রাঙা ওষ্ঠাধর চুমি।
অনন্ত প্রেমের মায়া মর্মে লয়ে তুমি
এলে যবে ঋষিচিত্ত করিয়া তন্ময়
কটাক্ষে করিলে ভঙ্গ তপস্যা দুর্জয়
মদন-উৎসবে মত্ত করি বনভূমি।

যুগে যুগে কত বনে কত শকুন্তলা
প্রসবিয়া চলে গেছে নবআকর্ষণে
ওগো চিরগরবিনী হে মেঘকুন্তলা
পৃথিবীরে সিক্ত কর অশ্রুর বর্ষণে।
মদিরাক্ষি দেবনটী তুমি গো মেনকা
মৃগতৃষ্ণিকার মতো চিরপলাতকা।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

বিদ্যাপতি

বৈষ্ণবের কবি নও বিশ্বভুবনের
সুগভীর প্রেমকাব্যবীণায় মধুর
শুনায়েছ গীতিছন্দে মুক্ত হৃদয়ের
কল্পনায় মানসীর শিঞ্জিত নূপুর।
নিষিদ্ধ প্রাসাদকক্ষে অনাহত সুর
মানে নাই কোন বাধা রুদ্ধ পাষাণের
রক্তমাখা অভিসারে প্রেমের অঙ্কুর
তাই আজ বনস্পতি তব জীবনের

শত শাখা-প্রশাখায় মর্মরিত আজ।
শুধু মিথিলার নয় নিখিল ধরার
হে প্রেমিক বনস্পতি মৃত্যুঞ্জয়ী আজ
তোমার প্রেমের কাব্য অনন্ত উদার।
লছমী নয় রাধা নয় বিশ্বভারতীর
প্রেম তুমি রক্তে মাংসে রোমাঞ্চ মদির।

২৭শে ফেব্রুযাবী ১৯৩৬

চণ্ডীদাস

প্রেমের কোথায় মুক্তি ? সমাজ যেখানে
খড়্গাহাতে রাত্রিদিন কাটে ফুলবন
সংযমের চিতাধূমে চাঁদের আনন
ঢেকে দেয় ভ্রূকুঞ্চিত কঠোর বিধানে।
প্রেম তবু কী দুর্বার তব গানে গানে
অভিষিক্ত করে আজো বিষণ্ণ জীবন,
প্রেমগুরু চণ্ডীদাস বাঙালীর মন
উদ্দীপ্ত করেছ তুমি মুক্তিমন্ত্র দানে।

যে যাকে বেসেছে ভাল এই পৃথিবীতে
কার সাধ্য বাধা দেয় তাদের মিলন
হে ব্রাহ্মণ রজকিনী রামীর পীরিতে
শুনায়েছ বাঙালীর মহাউজ্জীবন।
হে কবি উদাত্তকণ্ঠে করেছ প্রচার
মুক্তপ্রেম ধন্য করে সমাজ সংসার।

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

প্রগতি-যাত্রা

অন্ধকালের মহাকাশ ছেয়ে একদা সে ছিল নিকষ অমা,
মৃত্যুরূপিনী সর্বনাশিনী প্রলয়ঙ্করী দীর্ঘতমা!
চঞ্চল গতি-তুরঙ্গে তা'র রূপ ছিল ক্রূর বল্গাহারা,
ঝঞ্ঝা-প্লাবন গিরিবিদারণ ভূমিকম্পন অগ্নিধারা।
সৃজনে প্রলয়ে স্বেচ্ছাচারিণী ছিল সে আদিম যাত্রাপথে
বিপুল দ্বন্দ্বে বসেছে সে আজ নর-প্রতিভার কণকরথে।
কী যে বেদনার প্রাণযাত্রার সে ছিল দীর্ঘ-বিলম্বিতা
ইতিহাস তারি রোমাঞ্চকর উজ্জীবনের জৈবগীতা।

তমসাতীর্থে আদিকবি তা'র প্রাণস্পন্দন ছন্দে সুরে,
গেঁথেছে নিখিল কবিচেতনার শস্যে মুকুলে তৃণাঙ্কুরে।
জ্ঞানে ধ্যানে প্রেমে কাব্যে শিল্পে রথ তা'র ছোটে জগতজোড়া,
টানে দুরন্ত বিদ্যুৎগতি বিজ্ঞানী-যুগ-যন্ত্র-ঘোড়া।
ঘামে ঘামে মৃৎ-জননী দেহের লাবণ্য বাড়ে প্রতিভাময়ী,
চন্দ্রে সূর্যে গ্রহে তারকায় মাটির মহিমা বিশ্বজয়ী।
আজো মহাকাশ রুদ্ধনিশাস রূপ দেখে তা'র মৃত্তিকাতে,
আগুনে পোড়ানো সলিলে গলেনা অমরী সে খর অস্ত্রাঘাতে।

সাত সমুদ্রে প্রতিবিম্বিতা নীলাভ-কপোল তমস্বিনী,
কামনায় হৃদ্‌স্পন্দন কাঁপে যুগে থেকে যুগ-সঞ্চারিনী।
চলেছে সে মহাঅন্বেষণের দুর্গম পথে চড়াই ভাঙা,
শিখরে স্বর্ণজঙ্ঘার দীপ সূর্যশিখায় রক্তরাঙা।
সে অন্বেষণ রুদ্র-ভীষণ ভয়ে যম তা'র শাসনে কাঁপে
স্বপ্ন-বিলাসী মৃত্যুর চিতা নিবে যায় ভয়ে মনস্তাপে।
কালান্তরের পথ থেকে পথে ঢেউ থেকে ঢেউ সাগরে তুলে
গত নয় তা'র গতি ক্রমাগত পেছনে সে আজো চায় না ভুলে।

কৈলাস বৈকুণ্ঠচারিণী নয় সে ব্রহ্মবাদিনী মায়া
মানুষ যে তা'র দৃপ্ত উদার জটিল জগতে জৈবকায়া!
যুগ-প্রসূতিব যৌবন-মায়া চিরবসন্তে তপোজ্জ্বলা,
অন্ধ-প্রেমের পলিপড়া মাটি যুগে যুগে তাই রজস্বলা।
অকুল কামনা কূল থেকে কূলে বাঁধে জীবনের স্বপ্নসেতু,
ঘুমে নয় চির জাগরণে তা'র প্রাণ-চেতনার দীপ্তকেতু;
উচ্চাভিলাষী মানবেতিহাস পতিরূপে তা'র জীবনসাথী,
প্রজ্ঞা-শায়কে দীর্ণ করেছে কত না যুগের অন্ধরাতি।

প্রাণী জগতের শ্রেষ্ঠ যে প্রাণী তারি প্রেমে সে যে স্বয়ম্বরা
নত হয়ে পদ-বন্দনা করে, বুকে ধরে প্রাণ আকুল করা।

যৌবন-গিরিশৃঙ্গচারিণী দয়িত-বীর্যশুল্কা রূপে
মোহিনী মায়ার তন্দ্র-দীপাধার জেবলে রাখে প্রেমগন্ধধূপে।
শুরু থেকে শেষ আহা কী অশেষ কম্পিত বহুবর্ণ ছায়া
মাটির কুটিরে অপার সুষমা বাহু-বন্ধনে শরীরী মায়া।
সান্ধ্য-প্রেমের আরক্ত মুখ সূর্যাস্তের চীনাংশুকে,
রূপালী তারার চন্দন আঁকা বাসর-স্বপ্নজড়িত সুখে।

মনোজবা কাঁপে শিখায় শিখায় তৃষিত ঠোঁটের পদ্মরাগে
মেখলাতে শ্যাম বনস্পতির ওষধির মহাপরশ লাগে!
উরসে রম্য রসায়নী সুধা জাগে মদালস নিষ্পেষণে,
শিশুসূর্যের উদয়-সূচনা রসপিপাসিত সে চুম্বনে।
সৃজন উষায় মহাদিগন্তে জ্বলে তা'র প্রেম-বজ্রমণি,
জীবনের জয়ঘোষণা-পথের বাজে গুরু গুরু যন্ত্রধ্বনি।
গতি-অগতির অশেষদ্বন্দ্বে তারি হাতে আঁকা জয়ের টিকা,
বিপ্লবী নর-ললাটে দীপ্ত জ্বালে প্রগতির রক্তশিখা।

২রা অক্টোবর ১৯৫১

সমুদ্র

সমুদ্র তোমায় আমি বলিষ্ঠ মনের সীমা দিয়ে
গর্বিত-বিশাল দৃপ্ত বাসনার রেখায় রেখায়
সত্তার দিগন্ত জোড়া গাম্ভীর্যের রঙ দিয়ে আঁকি।
শিল্পী আমি স্রষ্টা আমি বস্তুবাদী কবি
বহুর একক প্রতিচ্ছবি,
সংহত উদার আমি সৃষ্টির পরম অহংকার
আমি গান বিশ্বচেতনার।
সহস্রাক্ষপদবাহু প্রকৃতির আমি নিয়ামক
দেবদত্ত নই, স্বতঃস্ফূর্ত মানবক,
কী চঞ্চল! কী জাগ্রত আমার বেদনা!
কত যুগযুগান্তের আবর্তসংকুল উন্মাদনা।

দেশকালপাত্রজোড়া আমার উদ্দাম কল্পনার
বিন্দু তুমি মহাসিন্ধু অশ্রুসিক্ত সৃষ্টির যন্ত্রণা
অন্তহীন শান্তিহীন উষায় প্রভাতে,
আমার অশান্ত মনোবিপ্লবের আঘাতে আঘাতে
জন্ম হ'ল ধরিত্রীর ইতিহাস শত-শতাব্দীর
আমারি সৃষ্টির রঙে যুগ যুগ রঞ্জিত অধীর।
যে আকাশ আমারি সৃজন

সমুদ্র তুমি তো সেই আকাশের বুকে নিয়ে রঙ্
সভ্যতার আদিম ঊষায়
স্পর্ধাভরে ভেবেছিল তরঙ্গিত নীল-উপেক্ষায়
বাহুবলে মুছে দেবে আমার উদ্দাম রক্তধারা!
ভেবেছিলে মৃত্তিকার অস্তিত্ব আমার
নিঃশেষে বিলীন করে দেবে?

আমি জানি সমুদ্র তোমায়
বৃথা দর্পে গর্জমান কত অসহায়
কল্লোল তরঙ্গ আর জলস্তম্ভ জল শুধু জল
নিষ্ঠুর নির্বোধ মূঢ় বিহ্বল চঞ্চল!
পৃথিবীর আদিম উষ্ণ অঙ্গের গলিত ঘর্মধারা
তোমার নীলাম্বুরাশি;
যে পৃথিবী আমারি কন্যা আমারি দুহিতা
তুমি তারি স্বেদসিন্ধু হে সমুদ্র আমি যার পিতা।

আমি বিশ্ববিজেতার অজেয় কার্মুক হাতে নিয়ে
অগ্নিবাণে অন্ধকার দিগন্ত-পশুর বক্ষ ভেদি,
সূর্যের দিয়েছি জন্ম স্বাধিকাবপ্রমত্ত যৌবনে।
মাতরিশ্বা বহমান আমার নিঃশ্বাসে
কটাক্ষে বিদ্যুৎ জ্বলে
যমদণ্ড চূর্ণ পদতলে
আতঙ্কে স্তম্ভিত সৌরাকাশ!
আমার যাত্রার
লবণাক্ত ঘর্মধারা সহস্রবর্ষের রণোল্লাসে
পরাজিত পঞ্চভূত আমারি শ্রমের অঙ্গীকার।
আমারি শ্রমের রত্নে ঐশ্বর্যশালিনী ধরিত্রীর
জঠরে তোমার জন্ম,
তাই আজ হে সমুদ্র রত্নাকর উপাধি তোমার।

আমার মানসপুত্র তুমি
উত্তরাধিকারে তাই পেয়েছ চিন্তার চঞ্চলতা
উর্মিল অজস্রনীল গগনের চন্দ্রাতপতলে।
আমার অনলবর্ষী শায়কের ক্ষতচিহ্ন জ্বলে
তারায় তারায়।
মাঝে মাঝে আসে তাই করুণ উদ্বেগ
তোমার আমার নীল আকাশের গাঢ়কম্প্রমেঘ।

সমুদ্র আমায় তুমি স্রষ্টা ব'লে জানো মনে মনে
অবিচ্ছেদ্য অশান্ত স্মরণে।
আমি যে মানুষ আমি পিতা
জীবনের অগ্রগামী সংঘাতের জান্তব সংহিতা।
অসংখ্য সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়ে আলোকের লিপি
লিখেছি সৃষ্টির ইতিহাসে
সর্বজয়ী বিপ্লবের জ্বলন্ত বিশ্বাসে।

সমুদ্র স্মরণ করো আদিম প্রাণের অন্ধকারে
কর্দমাক্ত মৃত্তিকার কূলহীন কূলে উপকূলে
তোমার ক্রন্দন রোল
সকরুণ অবিশ্রান্ত শব্দের কল্লোল,
বজ্রের আওয়াজে মেশা নিত্য ভূকম্পনে
অতিকায় শ্বাপদের মুহুর্মুহুঃ অকাল মরণে।

সমুদ্র, সেদিন আমি, কালজয়ী আমি
আদিমকাব্যের মহাসঙ্গীতের জীবন্ত ভাষায়
ছন্দসূত্রে গেঁথেছি এ জড়ের অমূল্য মণিহার।
আতঙ্কের মেরুদণ্ড পায়ে চেপে করেছি সংহার
আদিম পশুর অসংযম।
পিতা আমি মহাপৃথিবীর
আমারি মুক্তির স্বপ্নে জন্ম হ'ল বিংশশতাব্দীর।

সমুদ্র তোমার নীল বিশালত্ব মানে পরাজয়
আমার ছন্দের সূত্রে স্বপ্নের বন্ধনে।
সৃষ্টি স্থিতি ব্যাপ্ত ক'রে মহাভূজ আমি
বিশ্বজয়ী কালজয়ী মৃত্যুজয়ী উদ্ধত উদার
মানব সভ্যতা তাই আমার জ্বলন্ত অহঙ্কার।
প্রতিভার আভিজাত্যে আমি বলবান
সদম্ভে দণ্ডায়মান
ঊর্ধ্বশীর্ষ দৃঢ়পদ অচল অটল
মেধায় প্রজ্ঞায় দীপ্ত ললাটের ভ্রূকুটি চঞ্চল।
সমুদ্র তোমার নীল ঘননীল তরঙ্গে আমার
স্বপ্নের তরণী দোলে কূলে উপকূলে
তোমার তরঙ্গ কাঁপে ফেনশীর্ষ বন্দনার ফুলে।

১৫ই এপ্রিল ১৯৫০

বহ্নি

গন গনে জ্বলন্ত বহ্নি
নর্তিনী কাঁপে শিখা তন্বী!
লকলকে রসনায়
লৌহ যে গলে যায়
হে আগুন জীবন কি স্বপ্ন?
আহুতি গ্রহণ করো হে আদিম বহ্নি!

গলিত কাঠিন্যের পিণ্ডে
কাঁপে সভ্যতা ভ্রূণ দীপ্ত দিগম্বর,
বাসনায় কম্পিত
যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত
বলিষ্ঠ হে মহান জীবনের ছন্দ
আহুতি গ্রহণ করো হে আদিম বহ্নি!

দুরন্ত সৃষ্টির গর্বে
আদিমাতা পৃথ্বীর গর্ভে
অরণিদণ্ডধর
খুঁজেছে অন্ধনর
জমাট অন্ধকারে দাহনের তত্ত্ব,
কামনার মনোজবা হে আদিম বহ্নি!

দাউ দাউ জ্বলে ওঠো বহ্নি
কোটি কোটি জীবনের নিঃশ্বাসে হল্কা!
থমথমে গম্ভীর
সুপ্তি শতাব্দীর
জ্বলন্ত শিখায়িত করো জনারণ্য,
বিপ্লবী চেতনায় জাগো জাগো বহ্নি!

ধ্বক ধ্বক রাঙা বেদিগর্ভে
অশান্ত অনলস সংগ্রামী গর্বে
ঝণাৎ ঝনন্ ঝন্
ঝণাৎ ঝনন্ ঝন্
বিশ্বকামারশালে প্রচণ্ড ঝংকার,
বন্দনা-সঙ্গীতে জ্বলে ওঠো বহ্নি!

গনগনে জ্বলন্ত বহ্নি
নর্তিনী কাঁপে শিখা তন্বী
গলিত কাঠিন্যের মন্দ্রিত ঝঙ্কার!
রনন ঝনন্ ঝন্
মঞ্জীরে নিক্কণ
যুগ যুগ সঞ্চিত বঞ্চিত বাসনার,
সর্বহারার বুকে জাগো জাগো বহ্নি!

অসাম্য কলুষিত মর্তে
দেশে দেশে ঐক্যের সংগ্রামী সর্তে,
জাগো চেতনার সুখে
প্রগতির রাঙা বুকে
নবযুগসৃষ্টির বিপ্লবীছন্দে
রক্তনিশান তুলে জ্বলে ওঠো বহ্নি!

৭ই নভেম্বর ১৯৩৪

যান্ত্রিক

"পৃথিবীর স্নায়ুশির ছিঁড়েখুঁড়ে যান্ত্রিক বিক্রমে
মানব দানব হ'ল লোহার থাবায়—"
যা'রা বলে হতভাগ্য তা'রা!
যুগাবর্তে পাকাসত্ত্বে মৌরুসী শেকড়ছেঁড়া গাছ,
ডাঙায় আছাড় খাওয়া জালে ধরা মাছ,
শান্তিকামী নিতান্ত বেচারা!
পৃথিবীর ধূলিবর্ণ কাঁকরে কাঁকরে
অনেক পশুর রক্ত অনেক ক্লীবের
দেবত্বের মহত্বের শাশ্বত শিবের
জমে জমে হ'ল ইতিহাস;
বহু নিঃস্ব জীবনের বিষণ্ণ নিঃশ্বাস
অনিত্য আত্মায় ভরা প্রেতবর্ণ করেছে আকাশ
আকাশ তবুও নির্বিকার
হিমে রাত্রে মেঘে বাষ্পে উল্কায় তারায়
নীল নীল গাঢ় নীল চিরশূন্যময়!

পাথর মেশিন হ'ল, তুষার সবুজ,
প্রাণপঙ্ক-সমুদ্র মন্থনে,
অতিকায় চিমনির ধোঁয়ায়—
স্বর্গপথ অন্ধকার, ট্রেন চলে মন্দার পর্বতে;
নোয়ার কাঠের নৌকা ইস্পাত ড্রেড্‌নট্‌
সর্বগত বিদ্যুৎ বেতার।
চরকার নির্জীব অহঙ্কার,
অর্থহীন, ডাইনামোর ইঞ্জিনের পাশে।
অবলুপ্ত নিরুপায় বিমূঢ় সম্বিত
পেশীময় হিংস্র ক্রূর আদিম অতীত
ফেরে না ফেরে না।
অন্ধ মূক সারল্যের মোহ
মূর্তিমন্ত অপঘাত অগ্রগামী সভ্যতার পথে।

কি হবে পাথুরে গদা পাথুরে কুঠার,
নারীমাংসলুব্ধ কামজন্তুর চীৎকার
দ্রোণী মৃগী হিড়িম্বা উলুপী
রাক্ষসীর সর্পিণীর প্রেম?
মানব দানব নয় প্রবুদ্ধ যান্ত্রিক
দিগ্বিজয়ী সভ্যতার স্বয়ম্ভু বিধাতা!
পক্ষীরাজ কাব্যের উচ্ছ্বাসে
এরোপ্লেন সর্বগত আকাশে আকাশে
ভৌগোলিক সীমারেখা ভেঙে গেছে চৈনিক প্রাচীর।
দিগ্বাস বাকল চামড়া প্যান্ট কোট আধিবর পাঞ্জাবী
পিদ্দিম মোমবাতি গ্যাস কেরোসিন বিদ্যুতের
ক্রমস্ফূর্ত চেহারা বদল।
যন্ত্রদ্বেষী হে প্রাচীন তুমি কি বোঝ না
যন্ত্র নয় অপরাধী? ক্রূরকর্মা বণিকের হাতে
আজ তার চরম লাঞ্ছনা!
যে আগুনে রান্না হয়, সে আগুনে সংসার জ্বালায়
বাণিজ্যের সাম্রাজ্যের প্রতিযোগিতায়
নারকীয় পরিণতি মেধাবীযন্ত্রের।
বিপ্লব আসন্ন তাই
ভাস্বর যন্ত্রের মুক্তি সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকের দৃপ্ত অভিযানে।
রক্তবর্ণ আকাশ গম্ভীর
সর্বহারা চেতনার বিরাট বিপুল অভ্যুদয়ে
অচল চরকার চাকা প্রগতির রথে
অচল অসহ্য রামরাজ্যে ফিরে যাওয়া,
অসম্ভব তপোবনে যৌবন-মৃগয়া,
কুয়াসায় লজ্জা ঢেকে অসম্ভব মৎস্যগন্ধা প্রেম!

হায় ওগো শান্তিকামী আরণ্যক মন
সনাতনী রিক্ততার গতায়ু যৌবন
ক্ষান্ত করো যন্ত্রের বিদ্বেষ;
জননী জঠর মুক্ত সন্তান কখনো
ফিরে যেতে পারে কি জঠরে?
প্রাণশক্তি ক্রম-পলাতক
প্রকৃতির বন্দীশালা আদিমের গুহাগর্ভ হ'তে।

যন্ত্রময় বিশাল জগত!
যন্ত্র প্রাণ, যন্ত্র আয়ু, যন্ত্র মহাকাল,
মন-বুদ্ধি-মজ্জা-মেদ-রুধির-কংকাল
যন্ত্রের চরম পরিণতি
• প্রকৃতির প্রেক্ষাগারে।

দেহের মোটর চলে প্রাণের পেট্রলে
অন্ন হতে প্রাণ সংক্রামিত
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে জাগে অন্ন লাঙলে মোটরে।
মানব দানব নয়—মেধাবী যান্ত্রিক
ক্রমোন্নত সভ্যতার স্বয়ম্ভু বিধাতা!

১৭ই নভেম্বর ১৯৩০ —দক্ষিণায়ন

স্বয়ম্ভু

আমি চঞ্চল আগ্নেয় তারা
সুরুশেষহীন অসীমাকাশে,
পিতামহদের মৃত্যুর ধারা
আমি চঞ্চল আগ্নেয় তারা
তপ্ত লোহিত রক্তের ধারা
আমার বক্ষ-সাগরে ভাসে
ভাঙি হিরণ্যগর্ভের কারা
চিরপ্রদীপ্ত মহোল্লাসে।

কঙ্কালে মোর মূক ইতিহাস
মহারণ্যের পুঞ্জীভূত,
অঙ্গার হয়ে ফেলে নিঃশ্বাস
কঙ্কালে মোর মূক ইতিহাস
ইন্দ্রলোকের স্মরণোচ্ছ্বাস
পিতামহদের মন্ত্রপূত,
প্রাণপুরুষের নাহি বিশ্বাস
আমি স্বয়ম্ভু অবাঙশ্রুত।

দুঃসাহসিক যাত্রায় মোর
প্রাণ ভেসে যায় রুধিরস্রোতে,
ইক্ষণে তবু স্বপ্নের ঘোর
দুঃসাহসিক যাত্রায় মোর
পাণ্ডুমেঘের সন্দেহ-ডোর
ছিঁড়িয়া বহ্নি-বিমানপোতে
বাস্তবিকার আমি আমি মনোচোর
স্বতঃস্ফূর্ত বহ্নিস্রোতে।

দক্ষিণায়নে বামপদ রাখি
সূর্যে আবরি দখিন পদে,
কৃষ্ণ-হীরকে আত্মারে ঢাকি
তরল অগ্নি অঙ্গেতে মাখি
মাতরিশ্বার ঝড় তুলে হাঁকি
পিতামহদের মৃত্যুমদে
চতুর্ভূতেরে বন্ধনে রাখি
ব্রহ্মের মৃত শোণিতহ্রদে।

১০ই আগষ্ট ১৯৩৮ —দক্ষিণায়ন

আয়সী

আদি প্রাণ-সিন্ধুর তরঙ্গ-পঙ্কে
অর্বুদ বুদ্বুদ অঙ্কে
সসীমের কন্যা
কণিকা বিপন্না
কেঁপেছিল সে আদিম সুখে বা আতঙ্কে
মনে নেই, শুধু সেই কাঁপনে,
মৃৎ-কারাগর্ভের কালনিশি যাপনে
আয়সী অহল্যার সুপ্তি
মনে নেই ইতিহাসে হ'ল অবলুপ্তি
কবে কোন্ অশান্ত বৈভবস্বপ্নে
দুরন্ত সৃষ্টির লগ্নে।

•

মানুষের আদিপ্রাণচেতনায় স্ফূর্ত
যান্ত্রিক প্রয়োজনে মূর্ত
তিমিরের হন্তা
সে যুগ-নিয়ন্তা
জ্বলে পুড়ে মাটি খুঁড়ে জাগালো
আয়সীর চোখে মায়া-অঞ্জন লাগালো।
কর্ষণে কর্ষণে
স্ফুলিঙ্গ বর্ষণে
রূপায়িত জীবনের সঙ্গীতে
শিখায় শিখায় নানা ভঙ্গীতে।

সুরে সুরে তালে তালে কঠিনের ছন্দ
আয়সীর ভীতি কি আনন্দ
জানি না,

কেন? সে তত্ত্ব কথা মানি না।
রূপবতী অহল্যা জেগেছে
বিজ্ঞানী মানুষের বরাভয় লেগেছে
এ জগতে নেই আর অগতি
স্বগতঃ আশার গানে রুদ্রানী প্রগতি।

২১ শে জানুয়ারী ১৯৩৪ —দ্বিপ্রহর

ইঞ্জিন

দুর্বার গাম্ভীর্য তোমার হে ইঞ্জিন!
উদ্দাম গতি অনন্তনাগ দীপ্তচক্ষু তন্দ্রাহীন।
লৌহচক্রে রূঢ়-বাস্তব বাহন বাষ্প অঙ্গার
দিব্যদ্যুতির পিস্টনে দ্রুত জীবন রূপসংস্কার,
অমেয় প্রাণের শ্বাসপ্রশ্বাসে রেচকে পূরকে হে উদাসীন,
যন্ত্রাভরণ শঙ্কর তুমি স্টিমেঞ্জিন্।

গেঁথে গেঁথে গ্রাম নগর সহর দীর্ঘ অয়স্‌বর্ত্মে
ইস্পাতী নবসংস্কৃতি রচো মর্ত্যে!
ঘর্ঘর গতিচক্র,
অবারিত পথ পাহাড়ে সেতুতে সুড়ঙ্গে ঋজু বক্র।
বয়লারে নেই শশবিষাণের মায়া
ত্রিকোণ-স্ফটিকে বামধনু রঙা সপ্তাশ্বের ছায়া!
দীপ্তগতির দ্রুত প্রগতির পরমাগতির স্বষ্টা
বাষ্পীয় প্রাণ স্রষ্টা!
কঠিন কৃষ্ণহীবকোজ্জ্বল মসৃণ তব অঙ্গে
ঝকমকে তাজা বলিষ্ঠ প্রাণ শ্রম-চেতনার সঙ্গে
জাগ্রত তুমি হে ভূচব মহানাগ,
ইস্পাতে গড়া আত্মায় তব দুর্জ্জেয় অনুরাগ।

গ্রাহ্য করোনা আত্ম-ছলনা স্বাপ্নিক চাওয়া পাওয়া
স্টেশনে স্টেশনে ক্ষণ-বিরতির শুধু আসা আর যাওয়া।
দাক্ষিণ্যের তীর্থে তোমাব
পরম-ঐক্যে নর-সংসাব
দানে প্রতিদানে দেশে দেশে ঘরে ঘরে
মহামিলনের মন্ত্র রচনা করে।
মেধাবী মানবসৃষ্ট শরীর উধাও উল্কাবেগে
ধূম-কুণ্ডলী পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে,

অয়স্‌চক্রে বিদ্যুৎগতি দুর্জয় ধাবমান
তুমুল শব্দ-ঝঙ্কারী অভিযান!
অমিতবীর্যে ভীমপদপাত জীবন্ত বাসনার
দুরন্ত ঝঙ্কার
পরমোজ্জ্বল তবুও সহাস্রাক্ষ
সচেতন জীবযাত্রায় চিরমুক্ত তোমার সাক্ষ্য।

৩রা অক্টোবর ১৯৩৪

হাওড়ার ব্রিজ

যান্ত্রিক মহিমায় উন্নতশির!
বিংশ শতাব্দীর
তুমি মনসিজ!
হাওড়ার ব্রিজ।
উদ্ধত ইস্পাত
ভ্রূক্ষেপ দৃকপাত
মর্ত্যের প্রজ্ঞাতে নেই,
মৃত সাম্রাজ্যের
ব্যবসা বাণিজ্যের
হারিয়েছি চিন্তার অজ্ঞাতে খেই।

হে চির সমুন্নত লৌহ-পাষাণ,
স্তম্ভিত গান!
ভাস্বর চেতনায় রুদ্র মহান
অতিকায় প্রাণ। ,
অবারিত নাগরিক পদসঞ্চার
অয়স্কান্তে দৃঢ় এপার ওপার
কব্জা কীলক প্যাঁচে গ্রন্থি অপার
নানা ঋজু বক্র
তির্যক ও চক্র
সুর-ঝংকাব!
নিরেট জটিল নবঋতুসংহার।

সুতীক্ষ্ম কান্তির প্রতিবিম্ব
কবে চিনবো?
ক্ষিতিজ খনিত্রের
বিপুল বহিত্রের
প্রগতি চরিত্রের
প্রাণবিম্ব!

নব নব বিস্ময়ে উজ্জ্বল প্রাণ
চির উদ্দাম,
স্তম্ভিত কায়া তুমি সেতুবন্ধের
অনাগত অপরূপ প্রাণছন্দের
অভিনন্দিত করো কৃষি-বিজ্ঞান
চিরদুঃসাহসিক অতিকায় প্রাণ!

স্পর্ধিত কী বিশাল বজ্রপাণি
ইস্পাতী ছন্দের দৈববাণী
জীবন্ত সমাজের হে সন্ধানী,
স্তব্ধ মুখর!
আসে ঐ দ্রুতগতি গণমহাকাল
স্তব্ধ তরঙ্গ হে চিরউত্তাল
হাতে তব বিপ্লবী রক্তমশাল
রোমাঞ্চকর!
লৌহমুকুটে কাঁপে সৌরশিখা
বিজয়টিকা!
পদতলে ভাগীরথী জলকল্লোল
পতিতোদ্ধারিণীর চিত-উতরোল
গুম্ গুম পাখোয়াজ যন্ত্রের বোল্
উন্নত মহিমায় গুম্ গুম্ গম্ভীর
গাঙ্গেয়-মৃত্তিকালিপ্ত!
উদ্ধত মহিমায় বিংশশতাব্দীর
দ্রুতগামী প্রজ্ঞায় দীপ্ত!

[হাওড়াব নতুন ব্রিজ উদ্বোধন্ দিবসে] —দিবপ্রহর

বেতার

অমেয় আকাশ বাঙময়
স্বর-তরঙ্গ কম্পিত।
পলকে বিশ্ব তন্ময়
হৃদয়তন্ত্রী ঝংকৃত॥
অচেনা কণ্ঠে অজানা দেশ
নীল আকাশের ছদ্মবেশ
লঙ্ঘি বিপুল শূন্য অকূল
সাম্যের সাম ওঙ্কৃত।
অযুত আত্মা বাঙময়
ধ্বনি-তরঙ্গ কম্পিত॥

কত অদৃশ্য অন্তরাল
রূপ-তরঙ্গে ভেসে ওঠে।
স্বর-সমুদ্রে জ্যোতি-মৃণাল
মায়াবী প্রাণের ফুল ফোটে ॥
ব্যোম-পারাবার অপরিমান
ঘনবিদ্যুতে কম্পমান
উদারা মুদারা তারায় প্রাণ
অকূল শূন্যে সম্বৃত।
মূক-যবনিকা স্পন্দমান
স্বর-তরঙ্গে কম্পিত ॥

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১

পারমাণবিক

শান্তি কোথায়? তারায় তারায় জ্বলন্ত
উল্কার হাড় স্মৃতির পাহাড় চলন্ত
ইন্দ্রের ভয়ে দ্রুত ধাবমান ব্যর্থ-বাসনা দিগ্‌বিদিক্‌
অন্ধ অপার অমেয় আশার দৌবারিক,
মর্তবাসীর বাসনা-বাঁশীর কম্পন ঘন মৃত্যুদূত
ব্যোম-সমুদ্রে শরীরী ব্যথার হে বুদ্বুদ,
নিত্যম্‌ পরিমণ্ডলম্‌
চিরঅবিনাশ সৃজনোল্লাস অনাদ্যন্ত বিঘূর্ণন!

হায় কী বিষাদ অযুত কণাদ শূন্যে লীন
কালজয়ী কাল স্তম্ভিত কাঁপে বিদ্যুতীন
বিশ্বজ্যোতির উৎসমুখ
বিদীর্ণ শতশতাব্দী তাই মৌন মূক।
অণোরণীয়ান প্রলয়ের গান ক্ষণ-বিনাশ
দ্রুত কম্পিত বিচ্ছুরণের চিদ্বিলাস
নিমেষে বিপুল জড়ের বাঁধন
বহ্নি-বলয়ে রুদ্র-সাধন
চূর্ণ ধূমল ক্ষিতিমণ্ডল ক্রুদ্ধ প্রবল অণু-বিদার
সবযন্ত্রের তন্ত্রধার।

হে অদ্ভুত!
হে বুদ্বুদ!
উচ্চাভিলাষী স্বপ্নদূত—
চোখ খুলে চাও একটু দাঁড়াও হে চঞ্চল,

তীব্র-দ্যুতির ক্ষণ-তৃপ্তির ক্ষুধিত অধীর যে সম্বল
বক্ষে তোমার ঘুচিয়োনা তা'র মহাভবিষ্য হে সৈনিক,
করো প্রবুদ্ধ জীবনযুদ্ধ এ দৈনিক।
অমিত-প্রতাপ দুঃসহতাপ গ্রহ-মণ্ডলে অহংকর
সৌর-নায়ক শোনায় আদেশ শ্রেয়স্কর ঃ
দানবিক পারমাণবিক মোহ সংহর
মেধাবী মানব-চেতনায় চিরকল্যাণময় রূপ ধরো।

এসেছে এবার প্রাক্তযুগের সন্ধিক্ষণ
জেগেছে প্রাচীন অঙ্গের ঘেরে বন্দীমন
গণমানবের প্রাণ-বৈভব
এনেছে বিশ্বে সৃজনোৎসব
জেগেছে শান্তি মৈত্রী মুক্তি সাম্যসাধক বিশ্বজন
থামাও তোমার সংক্ষুব্ধ-প্রাণের রক্তচক্ষু ভ্রূকুঞ্চন।

১৭ই জুন ১৯৪৪

কাব্য-দর্পণ

কবিতা হৃদয়-পদ্মে সুরভিত চেতনার আলো
সূর্যের চাঁদের চেয়ে প্রাণবন্ত মমতার শিখা,
জ্বলে না জ্বালায় শুধু সুখপ্রদ আকারে ইঙ্গিতে
অপরূপ যন্ত্রণার নির্বিকার মর্ম-মরীচিকা।

এ যুগ কাব্যের নয় মন্থর জীবন গেছে কেটে
নীলশূন্যে মিল নেই রূপাতীত রূপের কাঠামো,
ধূসর মাথায় তার স্থানাভাব যুগ-বিড়ম্বনা
বিলম্বিত সুর শুনে বিশ্ব বলে, থামো বন্ধু থামো।

কবিতা সুখের নয়, বিষাদেরো নয় বিষণ্ণতা,
মৃত্যু নয়, আমরণ উত্তেজিত উদ্দাম বুকের
স্পন্দনে স্পন্দিত মন অচেনা ইচ্ছার অভিসারে
কথা নয় তবু কথা, আকুলতা নির্বাক মুখের।

বলা আর না-বলার অবিমিশ্র অন্তর প্রদেশে
বসতি কাব্যের তাই না-বুঝে বোঝার ভান করা,
আকাশ চোঁয়ানো রোদে চৈতালি ধুলোয় এলোমেলো
কবিতা সুরের নেশা হাড়ের বাঁশীতে তান ধরা।

কখনো মুহূর্তকাল কোনো এক দৃশ্যপটে দেখা
চলন্ত কালের ছন্দ-পতনের স্তব্ধ মনোরথ,
পেয়েছি, পাইনি কিম্বা পেয়েও হারানো প্রগল্‌ভতা
স্থাবর এ মহাবিশ্বে কাব্য এক অস্থাবর পথ।

রূপ নয় দ্যুতিটুকু, অঙ্গ নয় অঙ্গের লাবণি
উলঙ্গ আগুন নয়, আগুনের নীলাভ দাহিকা;
সূর্যাস্তের ছায়ালোকে মোহ নয় মদির আবেশে
সন্ধ্যায় দীপের ঠোঁটে রক্তরাঙা চুম্বনের শিখা।

কবিতা বিপ্লবী-মনোবাসনার অগ্রগামী সুর
অব্যাহত আবেগের আশ্চর্য বাঙ্ময় শালীনতা;
আকাশ-কাঁপানো স্বচ্ছ-চেতনার মূর্ত প্রতিধ্বনি
খণ্ডকালে বন্দী এক অখণ্ড কালের অধীরতা।

দুঃখের বিলাস নয় সুখ-দুঃখ সহজাত লীলা,
প্রেম তার প্রতিচ্ছায়া বিস্ময়ের বিশাল বৈভবে,
শূন্য বুক ভরে দেয় সপ্তসমুদ্রের ঢেউ ভাঙা
কূল থেকে কূলে কূলে নিয়ে যায় অশান্ত উৎসবে।

কবিতা ঘুমের ঘোরে আচম্বিতে নিশিডাক শোনা,
কিম্বা এক চেনা স্বর সংখ্যাহীন অচেনার ভীড়ে;
যে তাকে চেয়েছে সেই কোনোকালে না-পাওয়া নায়িকা
যে তাকে চায়নি তার বাসা বাঁধে স্বপ্নঘেরা নীড়ে!

২৭শে মার্চ ১৯৪৭

শিলালিপি

বাটালিতে কুঁদে কুঁদে কঠিন পাথরে আজো একাগ্র আশায়
এনেছি কিছুটা ঐ মুখের আদল মুখ আসেনি এখনো
কী কঠিন তুমি ঐ পাথরের চেয়ে?
অরূপের কোঠা ছেড়ে ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গ হ'লে না লাবণ্যে সমারূঢ়।

নীলরাত্রি চন্দ্রকান্তমণিদীপ জ্বালা
বসে আছ কী রহস্যে যেন দূর রেবাতটপ্লাবিনী জ্যোৎস্নায়,
যেন তুমি কালিদাস যে ভাবনা ভেবেছিল তারি সমকাল
এনেছো আমার মনে
যেন তুমি শবরীর প্রতীক্ষিত নীল অরণ্যানী!

নিবিড় নক্ষত্রপুঞ্জে চেয়ে চেয়ে ভাবি
কবে স্বচ্ছ রসবোধে তোমার আকার দেবে বাটালিতে ক্রীতদাস মন?
তুমি কি অশোকবনে প্রসন্ন হওনি শুনে রাঘবের সমুদ্র-শাসন?
মায়াবাদী তত্ত্বে নয় বহুবার ভেবেছি তোমায়
পাথরের চেয়ে তুমি স্তব্ধ আজো অহল্যা-কঠিন
কেন হলে? কেন স্পষ্ট শরীরী-মনের
হলে না স্বরূপে কিম্বা মুকুরের মায়াবিম্বে রূপে প্রতিরূপে সঞ্চারিণী?

মন আর মনোরথ এ দু'য়ের মাঝখানে জমাট পাথর
বাটালিতে কুঁদে কুঁদে কারুশিল্পময়ী কত অজন্তা ইলোরা উজ্জয়িনী
রচনা করেছি শত শতাব্দীর অনুরাগে ভরা,
তুমি শুধু সে পাথরে দিলেনাকো ধরা।
প্রেম আর রক্ত আর অশ্রু দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে সে পাথরে রঙ
ধরাতে পারিনি আজো শুক্তিস্বচ্ছ লাবণ্যশিখায়।
তুমি আজো রয়ে গেলে আদিম সূর্যের স্বপ্নে ভৈরবী চেতনা।
তোমার সামীপ্য ছাড়া তবু এ-জীবন তার আকাঙ্ক্ষার আস্বাদ পেতো না!

২৩শে এপ্রিল ১৯৫৫

স্বকীয়া

অন্ধকারে মন যেন শূন্যের সামীপ্যে আজো জাহাজী সারেঙ্
সমুদ্রের কোন দ্বীপে কবে যে এসেছে ফেলে অনিকেত-প্রেম
হাজার বন্দর ঘুরে দুঃখের বয়স বাড়ে অনির্বচনীয়
তাই বুঝি পৃথিবীতে বিয়োগান্ত নাটকের শেষদৃশ্য এত জনপ্রিয়?

কখন যে ভালোলাগে একান্ত নিজস্ব কোরে সকলের ভালোলাগা চাঁদ
সে কথা কি জানে মন? নিজস্ব বিষাদ
চাঁদের প্রবাল রঙে সামুদ্রিক সিঁড়িভাঙা দিগন্ত গম্ভীর
সার্বিক সত্যের নীড়ে কোন্ স্বপ্ন-ডিমে বসা হৃদয়-পাখির
গান শোনে সে কথা কি ছন্দে গেঁথে বিশ্বজনে জানাবার কথা?
নিজস্ব মনের শূন্যে থাক না সে ঘিরে তা'র স্বকীয় মনের আকুলতা!

যে পৃথিবী বার বার বিস্মৃতির সমুদ্র কিনারে
শুক্তিগাঁথা সৈকতের বালিতে স্মারকচিহ্ন মুছে দেয় রূঢ়-অস্বীকারে
মন সেই পৃথিবীর অমিতাভ প্রেমের বিগ্রহ
বুকে নিত্য জেবলে রাখে সামুদ্রিক বেদনার নিষ্ঠুর নিগ্রহ;
মুক্তির মশালে তার যুগ থেকে যুগান্তর অন্ধকার আকাশের পট
কিংশুকে পলাশে কৃষ্ণচূড়ায় আগুন জেবলে ঘোচায় সংকট।
তা না হ'লে কাব্য লেখা কী যে হাস্যকর
ভবিষ্যৎ মরে যেতো জয়ী হ'তো সামুদ্রিক সৈকতের রুক্ষ তেপান্তর।

যে আকাঙ্ক্ষা কাল থেকে কালে উত্তরণ
আজো চায় চন্দ্রমার ষোলোকলা নিঃশব্দে পূরণ
সকলের ভালোলাগা পূর্ণিমার আদিগন্ত অপূর্ণ বাসনা
নিজস্ব মনের রঙে মায়াবিনী মূর্তি ধরে শ্বেতপদ্মাসনা।

১৭ই এপ্রিল ১৯৫৫

কোনো কোনো গান

গানের সুরের মতো কোনো কোনো কথা আজো ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি তুলে,
থামেনি থামার কোনো প্রশ্ন কেউ করেনিকো সুসংগত সংশয়ের মূলে।
হৃদয় নিঃশব্দ নীল আকাশের আবরণে ফুলে' ফুলে' কেঁদে ওঠা নদী,
গর্ভে যার সব স্বপ্ন সব সাধ ক্ষয়ে ক্ষয়ে অতলে তলায় নিরবধি।
ধূসর মেধায় মৌন চূড়াটুকু ভেসে থাকে যে নদীর উদ্বেলিত বুকে,
সে নদী, হৃদয়-নদী মমতার মহিমায় বাধা দেয় মলিন মৃত্যুকে।
কোনো কোনো কথা যার অনাঙ্গিক স্বরলিপি সুরে অঙ্গ কাঁটা দিয়ে ওঠে,
গানের উজানে যার 'সমুদ্রমেবাভিমুখ' কূলে কূলে রসিকেরা জোটে।

অপ্রসন্ন মেধা তাই মুক্তির আশ্রয় খোঁজে কথার-তরঙ্গে ভেসে থাকা,
বিবাদী জীবন-প্রেমে মনে করে সত্য বুঝি নির্বিবাদী চেনা সুরে ডাকা!
তবু সত্য মিথ্যা নিয়ে কমনীয় কৌশলের কূলপ্লাবী কাব্যিক চেতনা
জাগায় রোমাঞ্চকর রসলোভী হৃদয়ের মণিপদ্মে ভাবের দ্যোতনা।
কোনো কোনো গান তাই স্মরণীয় আবেশের নিবিড় গভীর ব্যঞ্জনায়,
অগণিত হৃদয়ের তটপ্রান্তে ঢেউ ভাঙে সামুদ্রিক সুরের বন্যায়।

৬ই জুলাই ১৯৩৪

স্বর্ণমীন

শ্যাম-গম্ভীর ক্ষুব্ধ অধীর নীলাম্বুরাশিতলে
নিভৃত স্তব্ধ হৃদয়ের দীপ জ্বলে!
কে তুমি একক স্বর্ণমীন
নিতল সায়রে তন্দ্রাহীন
আকাশী আলোয় সুনিবিড় উচ্ছ্বাসে,
মৃদু প্রলয়ের গতি-তরঙ্গে ফেন বুদ্বুদ ভাসে
কলমন্দ্রিত মুখরিত চিররাত্রিদিন
চন্দ্রবর্ণ স্বপ্নলোকে,
হে আমার প্রেম স্বর্ণমীন।

অকথিত কত সজল বাসনা সায়রের নীল গভীর অতল জলে
রত্নাকরের লাল-অরণ্যে প্রবালের শাখে রত্ন-প্রদীপ জ্বলে।
সে কোন রত্ন স্বর্ণমীন?
শ্যাম-বহ্নিতে রাত্রিদিন
জ্বলে দীপ জ্বলে সহস্রশিখা অযুত বিরহ-রজনীর নীলমায়া,
গলে' গলে' যায় সজল শিখায় আলেয়ার মতো শুভ্রপ্রেমের কায়া।
তাই কি অতল নীলাম্বু তলে
লাল-অরণ্য নীল দাবানলে
জ্বলন্ত শ্যাম বারুণীতীর্থ সন্তরি করো প্রদক্ষিণ,
অজানা মৎস্যকন্যার প্রেমে চিরচঞ্চল স্বর্ণমীন।

মত্ত মাতাল দোলে উত্তাল নীল-তরঙ্গরাশি
মৃদঙ্গরোলে করে হাহাকার ঝোড়ো বাতাসের বাঁশী,
শত শত নীল স্ফুলিঙ্গ জ্বলে
মহাসিন্ধুর নিশীথাঞ্চলে
অর্ধমানবী অর্ধনাগিনী মায়াবিনী মেয়ে চকিতে লুকায় পলকে,
হারানো প্রেমের তরঙ্গরাশি ঢেউ খেলে যায় রুক্ষ ফেনিল অলকে।

ঝলমল করে স্বর্ণবালুকা বিরহের উপকূলে
স্বপ্নবিভল হৃদয়-সিন্ধু শুভ্রফেনার কূলে
ঊর্ধ্বে আলোর মহাপারাবার
ঘনবিদ্যুতে শুভ্র আঁধার
স্ফুটনোন্মুখ মনোময় প্রাণ অশ্রুসজল মেঘলোকে উদাসীন,
বাসনা-মরুর সে নীল আকাশে
ঊষর বেদনা-বুদ্বুদ ভাসে
অগ্নিডানায় স্থির বিহঙ্গ শত শত তারা নীলাভ শূন্যে লীন।

সে নীল শূন্য আকাশের তলে
সীমাহীন প্রেম-সমুদ্র জলে
বারুণীতীর্থ প্রবালপুরীর ক্ষুব্ধ চন্দ্রাতপ,
তারি তলে তলে গভীর অতলে
লাল-অরণ্য নীল দাবানলে
শুক্তির বুকে দগ্ধ-কামনা করিছে মন্ত্রজপ।

চিরঅতন্দ্র মুক্তিমন্ত্র শুক্তির কারাগারে
আশ্রয় খোঁজে চিরমানসীর বক্ষের মণিহারে
শীতল স্নিগ্ধ স্বচ্ছধারায়
শামুকে ঝিনুকে মগ্ন তারায়
মৃত চন্দ্রের জমানো টুকরো হাসি,
রক্তিম শ্বেত শঙ্খবরণ
জীবন্ত শ্বাসরুদ্ধ মরণ
জলবালিকার জমাট অশ্রু রজত মুক্তারাশি,
জোনাকির মত জ্বলে লাখে লাখে
নিবিড় প্রবাল-তরু শাখে শাখে
বিচিত্র ফুলপল্লবলতা সজলদীপ্ত রাত্রিদিন
সে নীল-পাথারে দিতেছে সাঁতার হে আমার প্রেম স্বর্ণমীন।

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪০ —দ্বিপ্রহর

খেয়াল

মন এলোমেলো হাওয়া
নিরুপদ্রব হেঁয়ালি।
খেয়ালের গান গাওয়া
হেমন্তিকার দেওয়ালি॥
বন্দী কুঁড়ির গন্ধ
নির্বাক নিরানন্দ

অমাবস্যার ছন্দ
অবিনশ্বর খেয়ালী ॥

ভেবেছি বিরস ভাবনা
নিরস হৃদয় ভরাতে।
কাব্যের নিরাভরণা
চেতনায় রাখী পরাতে ॥
নিভৃত ব্যঙ্গহাসিনী
অলক্ষ্যে দূরভাষিণী
স্বপ্নশিখরবাসিনী
অস্থায়ী অন্তরাতে ॥

তানধরা বাঁশী হাওয়াতে
বেজে গেছে অনায়ত্ত।
ঠোঁটের পরশ পাওয়াতে
অতনুর তনু তপ্ত ॥
কল্প-কুমারসম্ভব
পঞ্চশরের বৈভব
বিজনে রতির অনুভব
শিবরোষে অভিশপ্ত ॥

চৈতালী মন পলাশে
বাসনায় সংশ্লিষ্ট।
লঘু যৌবন-বিলাসে
প্রেম নয় একনিষ্ঠ ॥
বেহাগে আলাপধর্মী
করুণায় কারুকর্মী
শ্যামলের সহমর্মী
মাঝপথে বলে তিষ্ঠ ॥

বিহ্বল হয়ে থেমেছি
শূন্যে আকাশে দাঁড়ানো।
ত্রিশঙ্কু হয়ে ঘেমেছি
অনন্তে হাত বাড়ানো ॥
এলোমেলো আজ মনোরথ
পাইনি আলোয় কোনো পথ,
খেয়ালের নেই অভিমত
কুয়াশায় ঘুম-পাড়ানো।

৭ই মে ১৯৩৫

ভ্রমর

চাঁদের আলোয় পাগলের চোখ মন
বুঝেও বোঝেনা জেগে থাকা অকারণ
লোকে বলে তবু জানেনাতো কেউ
দিনরাত কেন সমুদ্রে ঢেউ
হৃদয় কি তা'র অতিকায় দর্পণ ?

নিঝুম রাতের ঝাউবনে পাখি-ডাকা
ছন্দ মেলানো ছায়াঘেরা ছবি আঁকা
তারুণ্য-রাঙা একটি মুখের
লাবণ্যে কাঁপা নিটোল বুকের
স্পন্দন শুনি নীল নিচোলে ঢাকা।

সে কোন চন্দ্রমল্লিকা অভিসারে
যেতে যেতে পথহারানো অন্ধকারে
মিশে গেছে তা'র রিক্ত সুরভি
সুর হ'য়ে যেন বাজায় পূরবী
পাণ্ডু প্রদোষে সকরুণ ঝংকারে।

মন তাই আজো সমুদ্র হ'য়ে ওঠে
স্মৃতির আকাশে চাঁদের পদ্ম ফোটে
যত রাত হয সহস্রদলে
বিবশ চেতনা জ্যোৎস্নায় জ্বলে
শূন্যে হৃদয় ভ্রমরের মতো ছোটে।

৫ই মে ১৯৫৫

অন্ধ

কোথায় তুমি প্রেম ? কোথায় ফুল ?
আকাশ আজো নীল আজো গানের
পাই না শুরু খুঁজে পাই না মূল
ছন্দে মিল নেই অভিমানের।

বিদেহ জ্যোৎস্নায় তন্দ্রাতুর
স্বপ্ন-জোনাকির পাখা পোড়ে
মৃত্যুশিখা জ্বলে রাঙাসিঁদুর
পাংশু বেদনার ছাই ওড়ে।

রূপালী শূন্যের কোথা সে পথ?
রাতের তারাঘেষা স্বর্ণদীপ,
আলোয় দিশাহারা মায়াজগত
সিন্ধু-বলয়িত প্রবালদ্বীপ!

বাসনা-মঞ্চের অন্ধনট
শুনেছে হাততালি লক্ষবার
তবু কী তান্ডবে পুণ্যঘট
ভেঙেছে জীবনের বারংবার।

দু'চোখ মণিহারা কোথায় রঙ্?
সূর্যসারথির পথ আঁধার,
হৃদয়ে তবু কেন বাজে সারঙ্?
সমুখে আজো কেন গিরি-প্রাকার।

কে তবু চুপিসাড়ে ভরেছে বুক
সরস ঠোঁটে তা'র পরশ হিম,
পেয়েছি বাহুপাশে দেখিনি মুখ
অদেখা প্রেম তার আজো অসীম!

দু'চোখে আলো নেই ধূসর মন
মাধুরী জাগে মূক কল্পনায়।
খনির তমসায় খুঁজি রতন
সুরের দ্যুতি কাঁপে মূর্ছনায়।

প্রেমের রূপ নেই গানেরো তাই
তবু কী শিহরণ রোমে রোমে
নিবিড় অনুভবে কী যেন পাই
তুষার ঝড়ে দেহ যায় জমে।

অগ্নি কাঁপে সারা অঙ্গে আজ
রতির হাহাকারে রতিপতির
অদেখা মেঘে মেঘে ওঠে আওয়াজ
বাসনা কাঁপে সুখ-সঙ্গতির।

বুঝিনা লাল নীল সবুজ রঙ্
তপ্ত শোণিতের ভিজে ভিজে,
পরশে বুঝি শুধু শিহরে মন
জড়ায়ে অবিরাম মনসিজে।

১৫ই মার্চ ১৯৫৫

সূর্যশিখা

সূর্যের জ্বলন্ত ধূলো এ সংসার মৃত্যু যার মর্মান্তিক ছাই।
সান্ত্বনা এ শরীরের শারীরিক মানসিক বিচিত্র আস্বাদ;
তিত্তির ইতর নই তৈত্তিরীয় ঐতরেয় তবু গান গাই
অশ্বতর শ্বেত হ'লে মন্ত্রের মাহাত্ম্য দিয়ে রচি গুরুবাদ।
ভারততীর্থের কূপে কৌপীন সম্বল মুখে জপেছি বৃথাই
মাণ্ডুক্য-বাসনালোকে মণ্ডূকের অহংকারী প্রমত্ত বিষাদ
সূর্যকে বলেছি মায়া পৃথিবীকে নেতি-নেতি নাই আর নাই,
প্রজ্ঞার পারদ কাঁপে ঊর্ধ্বমুখী উত্তাপের দীপ্ত পরিবাদ।

ধু ধু ওড়ে গ্রহরেণু শূন্যের সাহারা বুকে কেন বেঁচে থাকা?
কবে যে বিহঙ্গ-ব্রহ্ম বিশ্বডিম্ব পেড়েছিলো সে কা'র ঔরসে?
প্রিয়ার বাহুতে আর মায়ের স্নেহের নীড়ে মন মধুমাখা
ভেবেছে এ সব তত্ত্ব শোক আর সুখমত্ত ভাবনার বশে।
সূর্য তবু ওঠে রোজ চেতনায় রোদ্দুরের স্থির-বিজলীতে
দীপ্ত হই তৃপ্ত হই মরে যাই প্রতিভায় জ্বলিতে জ্বলিতে।

১৭ই আগস্ট ১৯৩৪

সাঁকো

যেহেতু তোমার ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করিনাকো
তাই বুঝি গাঢ়স্বরে মদির আবেশে আজো ডাকো?
চন্দ্রালোকে তাই চন্দ্রমল্লিকার অলব্ধ সৌরভে
তোমার আমার মাঝে কী আতঙ্কে কেঁপে ওঠে সাঁকো।
আজো বহুবচনের কাব্যময় বাহুল্য-গৌরবে
মিলনের মন্ত্রমালা গেঁথে যাই তীক্ষ্ন সূচীমুখে
বিকারবিহীন সাঁকো ব্যবধান রচে ভাঙা বুকে
আগুনের নদী জ্বলে নিষেধের নির্ধূম রৌরবে।

তীর থেকে প্রবিবিম্ব ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখি ঝুঁকে
রক্তরাঙা মুখচ্ছবি কোথাও কোকিল ডাকেনাকো
অন্তরের অন্তস্থলে একা শুধু তুমি বুঝি ডাকো?
যখনি নির্জনে এসে অগ্নিতপ্ত বুক রাখো বুকে।
যখনি নিকটে এসে শব্দহীন গাঢ়স্বরে ডাকো
আকস্মিক ভূমিকম্পে স্বর্গে মর্তে ভেঙে পড়ে সাঁকো।

১৭ই নভেম্বর ১৯৩৯

ভৈরবী

ভোরের সূর্যের চেয়ে তুমি আজো আমার জীবনে
আনো নিত্য নবীনতা ভৈরবীর অতনু আকাশ
সুরকম্প্র মূর্চ্ছনায় ভরে দাও অনন্ত উদাস
বাসনার শুভ্রতায় নিয়ে যাও মৃত্যুর তোরণে।
মৃত্যু? শুনে পৃথিবীর শ্যামল সবুজ শিহরণে
মূর্চ্ছা যায় বাতাসের দীর্ঘমান সুরের নিঃশ্বাস
ম্লান হাসি হেসে ওঠে কবিতায় রূঢ় অনুপ্রাস
গৈরিক দিগন্তপটে ভৈরবীর স্বপ্ন বিরচনে।

হে মন্থর স্বপ্নসাথী, বিড়ম্বিত জীবনের নেশা
তোমার ঝংকারে কাঁপি বিষাদের অতলান্ত বুকে
কী অসহ্য মূঢ়তায় মিলনের মৃত্যুশয্যা পাতি
যেথা তুমি বেজে যাও রাগিনীর শব্দহীন সুখে
শুনেও শুনি না তাই আরক্তিম সপ্তাশ্বের হ্রেষা
শর্বরীর শেষপ্রান্তে নিবে যায় জোনাকির বাতি।

২১শে নভেম্বর ১৯৩৯

অমেয় শিখা

একটি নির্জন শিখা রাত্রির অমেয় পরমায়ু
দেখেছি কী অসহায় রক্তমুখী প্রদীপ্ত প্রবাল
কী ঝঙ্কারে মর্মতারে বেজে ওঠে পৃথিবীর স্নায়ু
ছায়াসঞ্চারিণী প্রেম অভিসারে রচে মায়াজাল!
রাবণের খড়্গে যেন ছিন্নপক্ষ রক্তাক্ত জটায়ু
অমেয় আত্মায় কাঁপে পল্লবিত অরণ্য-কঙ্কাল
আধো আলো অন্ধকারে পথ খোঁজে দক্ষিণের বায়ু
রাত্রি বলে, এ জগতে কোনদিন আসেনি সকাল।

নির্বাক নিরুদ্ধ মন জ্বলে যায় শিখার শিখরে
দীপকের জন্মলগ্ন বার বার ভ্রষ্ট হয়ে যায়
ছায়াসঞ্চারিণী রাত্রি দীর্ণ হয় জ্যোতির নখরে
প্রেমলুব্ধ দিগন্তের স্তবগান কাঁপে মূর্চ্ছনায়।
অমেয় শিখার শয্যা হে আমার রাত্রির আকাশ
প্রগাঢ় প্রবালবর্ণে কোন্ স্বপ্নে রাঙাও নিঃশ্বাস?

২৩শে অক্টোবর ১৯৩৯

পাষাণ

তোমার ছিলো না কথা, কথা তুমি কখনো শেখোনি
রাত্রির আকাশে শুধু নক্ষত্রের গেঁথে গেছো মণি,
কোনোকালে কোনোযুগে মানুষের কোনো ইতিহাসে
কী আশ্চর্য নীরবতা নেই কোনো ধ্বনি প্রতিধ্বনি।
যখনি ডেকেছি কাছে সুনিবিড় বাঙ্ময় উচ্ছ্বাসে
অবিমিশ্র উপেক্ষায় তোমার সে আত্মসমর্পণ
আশ্চর্য লেগেছে মূক যৌবনের অলস স্পন্দন
অকথিত বাসনারা মরে গেছে মৌন সর্বনাশে।

হে অনন্ত উপেক্ষার সুসংযত ছন্দের বন্ধন
তুমি কি দেবেনা খুলে নিরুদ্ধ প্রাণের রত্নখনি ?
তবে কেন নিরুত্তর কেন স্তব্ধ ডেকেছি যখনি
তোমার কি নেই হাসি নেই অশ্রু উল্লাস ক্রন্দন!
কখনো ছিলোনা কথা, আজো তাই চামর বাজনী
পাষাণে তোলেনা সাড়া সমভাব দিবস রজনী।

১৪ই নভেম্বব ১৯৩৯

বাউল *

প্রেমের বাউল আমি পথে পথে যুগ যুগান্তর
শূন্যমনে ঘুরে মরি তোমার পাইনি আজো দেখা,
সূর্যের সোণালী রঙে বিশ্বপটে অনন্ত অক্ষর
গেঁথে চলি ছন্দে গানে সুরে সুরে অসহায় একা!
তুমি শুধু 'তুমি' আজো দু'টি শব্দ অ-ধরা ভাস্বর,
স্বপ্নের আকাশে আঁকা কল্পিত স্বর্ণিল স্মৃতিরেখা,
পদতলে মাটি নেই কোথা রচি পুষ্পিত বাসর ?
পৃথিবীর ভাষা দিয়ে কাব্য তাই হ'লনাকো লেখা!

তুমি-শূন্য আমি নেই, আমি-শূন্য তুমি আছো কিনা
কে দেবে সন্ধান তা'র ?   অশরীরী প্রেম-বিহঙ্গম
মহাশূন্যে উড়ে যায় ডানার ঝাপটে মনোবীণা
তীব্র মূর্চ্ছনায় কাঁপে সুরে সুরে স্থাবর জঙ্গম।
জ্যোৎস্নায় রজতশুভ্র উধাও পথের প্রান্তদেশে
জানিনা কোথায় পাবো, যাত্রায় অথবা যাত্রাশেষে ?

১৭ই নভেম্বর ১৯৩৯

এক ঝাঁক পায়রা

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখ্‌নায় উড়ছে!

নিঃসীম ঘননীল অম্বর
গ্রহ তারা থাকে যদি থাক নীলশূন্যে।
হে কাল, হে গম্ভীর
অশান্ত সৃষ্টির
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ,
হে অসীম উদাসীন বারোমাস॥

চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা!

দুপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি
নীল কপোতাক্ষির কান্তি
একফালি নাগরিক আকাশে
কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে,
চৈতালী সূর্যের থম থমে রৌদ্রে
জীবন্ত উল্লাসে উড়ছে
পাঁচরঙা•এক ঝাঁক পায়রা॥

এক ফালি আকাশের কোলঘেঁষা কার্নিস,
রঙচটা গম্বুজ দিগন্তে চিমনী,
সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখনায়
ছোট্ট কালের ঘেরে প্রাণ তবু তন্ময়
লীলায়িত বিস্ময়
সৃষ্টির স্বাক্ষর এক ঝাঁক পায়রা॥

রুপালী পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ
দুপুরের ঝলমলে রোদ্দুর!
হে কপোত, পারাবত, পায়রা,
যে দিকে দু'চোখ যায় দেখা যায় যদ্দুর
রুপালী পাখায় আঁকা শূন্য॥

আকাশী ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি,
তুমি নেই আমি নেই কেউ নেই
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা ॥

২৭শে মার্চ ১৯৪২ —দিনপ্রহর

প্রেম

যৌবন তুমি পাহাড়ে চড়ো
ঘামঝরা রোদে ভাঙো পাথর!
প্রেমের বেলাতে লাজুক বড়
চোখে চোখ দিতে কেন কাতর?

তুমি কেন চুপ্ বলো হে জ্ঞানী
বিদ্যে তো আছে ঠাসা মাথায়!
মুখে তবু কেন ফোটে না বাণী
জানো না কি প্রেম মন মাতায়?

প্রেম প্রেম আহা প্রেম যে কি?
দুনিয়াটা মিছে প্রেম ছাড়া।
হে প্রবীণ তুমি বুঝবে কি?
প্রেমের ডাকাতী ঘুম-কাড়া।

কাঁটা দিয়ে উঠে কাঁপে শরীর
আহা প্রেম সে কী দাও পরশ!
পালখ বুলানো মায়া-পরীর
ছোঁওয়া দিয়ে মন করো অবশ।

নীতির শুচিতা নরকে যাক্
ঠোঁটে ঠোঁট, বুকে বুক-রাখা
ফাগুনের আমি শুনেছি ডাক
কপালে সোনালী চাঁদ আঁকা।

৭ই মে ১৯৩০

ডেকোনা

ডেকো না আর ডেকো না!
যে ডাকে সাড়া মেলে না।
যে ডাক শুধু বাতাস কাঁপায়
অন্ধকারের গর্ভে।
যে যায় তাঁকে ডেকো না
আশায় বসে থেকো না
কত যে ভালবেসেছ তাঁরি গর্বে!

রামধনুতে বিরহী মন আকাশে আঁকে ছবি,
জলের প্রতিবিম্বে তাই আত্মহারা কবি।
যে রূপ খুঁজে পাওনি
যে গান আজো গাওনি
পাবেনা যাঁকে ডেকোনা তাঁকে ডেকো না।
আশায় বসে থেকো না॥

এখানে আমি এখানে তুমি এখানে সবই আছে
এখানে লোকে কথায় মরে বাঁচে!
এখানে ডাক দিলে,
ধ্বনির বুকে প্রতিধ্বনি ছন্দে যায় মিলে।
কথার হাতে প্রতিটি কথা পরায় রাঙা রাখী,
মুকুল দেয় প্রাণের সাড়া শাখায় জাগে শাখী।
যেখানে ফুল ফোটে না
যেখানে অলি জোটে না
সেখানে মিছে পথ হারানো
ছায়ার পিছু ডেকো না।

২০শে জুন ১৯৩৮

চোখ

সহজে কাতর দুটি কমনীয় চোখে
পলকে পলকে
কত ভাবান্তর
অন্তরের প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে প্রতিটি প্রহর
বহুরূপী বাসনায় রোমাঞ্চিত করে দেহ মন
চোখের মুকুরে কাঁপে অদৃশ্য মনন।
জগতের [illegible]

কত যে ঘটনা ঘটে
সবি তা'র দেখে চোখ তবু সব দেখা
স্মরণে রাখেনা শুধু যখন সে একা
মনোনীত ঘটনার ধ্যানে
ডুবে যায়, তখনি সে ভাবনার মৌন অভিজ্ঞানে
মেতে ওঠে তখনি দু'চোখ
অন্তরের প্রতিবিম্বে হারায় পলক।
আলোয় রঙের খেলা
দেখে সারাবেলা
আকাশে মাটিতে ফুলে ফলে
বিচিত্র রূপের রাজ্যে প্রতিদিন রূপান্তর চলে;
সব দৃশ্য দেখে চোখ তবু সব দেখা
স্মরণে রাখেনা শুধু যখন সে একা
বিমুগ্ধ বিহ্বল কোনো ভালোলাগা রূপে
তখনি সে কবি তার প্রতি রোমকূপে
জাগে কাব্য রোমাঞ্চ কম্পন
তখনি স্বাতন্ত্র্য পায় কল্পনায় নিভৃত মনন।

৯ই মে ১৯৩৮

প্রত্যাশী

আবার কখনো যদি আসো
নগণ্য কবিকে যদি সত্যই নির্ভয়ে ভালবাসো
বোলো তবে কোন সুরে আবার বাজাবো মৌনবাঁশী
অতৃপ্তির অমারাতে যুগ যুগ রিক্ত উপবাসী!
এই বোবা বেদনার বলে দিও ভাষা
আবার যদ্যপি আসো থাকে যদি বিন্দু ভালবাসা!
আমার নিখিলে
যেদিন প্রথম এসেছিলে
সে এক আশ্চর্য দিন কখনো আসেনা বার বার
সে এক আশ্চর্য স্মৃতি সে গানের অশেষ ঝংকার
আকাশে বাতাসে কাঁপে
রাত্রির প্রলাপে
জ্যোৎস্নার ভেঙেছে দর্প সে গানের আশ্চর্য বৈভব
বসন্ত-বাহারে গড়া তোমার প্রেমের অবয়ব।
জানি সে রাত্রির নেই কোনো রূপান্তর
পৃথিবী পায়না খুঁজে সেদিনের স্বর
কখনো বাজেনি কোনো বীণায় বাঁশীতে।

সে আলোর প্রদীপ্ত সঙ্গীতে
নতুন ঝংকার তুলে আবার কখনো যদি আসো
সুচির প্রত্যাশীজনে একবিন্দু যদি ভালবাসো
মনে রেখো সেদিনের রিক্ত বোবা-বাঁশী
নয় মূঢ় শূন্যতার বিরহ-বিলাসী
এ কবির সুদৃঢ় প্রত্যয়
আবার তোমায় পাবে সেই লগ্ন খোঁজে বিশ্বময়।

২রা মে ১৯৩৮

তমস্বিনী

গম্ভীর রাত্রির ঘড়ি বাজে।
তারার দোলকে দোলে স্বপ্নের পাহারা
উড়োপাখী ছায়া ফেলে কাক-জ্যোৎস্নালোকে
মিলায় গভীর শূন্যে।
নীলকান্ত মণি-বলয়িত
স্বপ্নপ্রেমমুক্তিরস-পিপাসিত দিগন্তের চাঁদ
নিঃসঙ্গ নিথর
প্রহরের সিঁড়ি বেয়ে রাত্রির মন্দির গর্ভতলে
জ্যোৎস্নার অতলে ডুবু ডুবু।
ডুবু ডুবু মগ্ন-মন মন্থর ঘুমের তন্দ্রাবেশে,
কেশবতী নায়িকার যৌবন-লাবণ্যে ঢল ঢল
উচ্ছল চঞ্চল ছন্দে শিহরায় নিঃসঙ্গ রজনী।
কোথা সে কোথায়?
কোথায় কোথায় তা'র কামনার তনু-দীপাধার
নীলশূন্যে শুভ্রচাঁদে কোথা সে? কোথায়?
হীরাজ্বলা পাহাড়ের নীরবসত্তায়,
রোমাঞ্চিত রাত্রির মুকুটে
অগণিত রৌপ্যশুভ্র নক্ষত্রের শিখায় শিখায়
কোথা? সে কোথায়?

১৭ই বৈশাখ ১৩৪৩ —সাবিত্রী

চৈতালী

সূর্যকন্যা চৈতালীর পায়ে পায়ে রোদের নূপুর
বেজে যায় নিঝুম দুপুর
খাঁ খাঁ শূন্য-বাসনার হাওয়া
ভুলে গেছে ফাগুনের কোকিলকণ্ঠের গান গাওয়া।
আকাশ দুরন্ত নীল
স্বর্গে মর্তে নেই রৌদ্রচেতনার মিল,
পলাশের পাপড়িখসা রক্তরাঙা পথ
ধূসর ধূলোয় মনোরথ
হু হু করে, দিগন্ত গম্ভীর
রোদের নূপুর বাজে কী নিঃশব্দ রুক্ষ চৈতালীর।
বাঁশবনে দীর্ঘশ্বাস কঞ্চির ডগায়
পল্লবিত ঝিলমিল রোদের ছায়ায়
বুলবুলির শিস,
অর্ধ অঙ্গ জলেডোবা ঝিমোয় মহিষ
পদ্মশূন্য পঙ্কদিঘিবুকে।
পাকুড়ের ডালে কাক দুর্বোধ কৌতুকে
কা কা শব্দে অকারণে ভাঙে গম্ভীরতা
চৈতালীর স্তব্ধ চঞ্চলতা।
আবার নিঝুম চরাচর
শূন্যে কাঁপে অবারিত জ্বলন্ত প্রহর
শুষ্ক রবিশস্যক্ষেতে রোদের নূপুর বেজে যায়
খাঁ খাঁ দ্বিপ্রহর রুক্ষ হাওয়ায় হাওয়ায়
কৃষ্ণচূড়া থর থর, হা হা করে বৃদ্ধ বনস্পতি
আকাশে আসন্ন বুঝি বৈশাখের রূঢ় অগ্রগতি।

১৭ই এপ্রিল ১৯৩৮

প্রজাপতি

দেয়ালে জান্‌লায় কড়িকাঠে
আর্শিতে ছবির ফ্রেমে দেরাজে তোরঙ্গে ভাঙাখাটে
পতঙ্গটা বার বার মাথা খুঁড়ে মরে
চিত্রিত ডানায় তার কান্নার ঝংকার কম্প্রস্বরে
আচ্ছন্ন করেছে মৌন হৃদয় আমার
রেখেছি কপাট খুলে এ ঘরের বহিরঙ্গ দ্বার!
বিষণ্ণ গুঞ্জনে
অবোধ পতঙ্গ তবু পথহারা কাঁদে শূন্যমনে।
ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত হঠাৎ কি মনে হলো তা'র

কোমল ধূসর পায়ে ভর দিয়ে কলমে আমার
বসেছিল কিছুক্ষণ
শিল্পিত ডানায় তার কী আশ্চর্য রোমাঞ্চ কম্পন,
কী আশ্চর্য রঙের বাহার
চেতনার কারুশিল্প রেখায় রেখায় চমৎকার
কুসুমের রেণুমাখা সূক্ষ্ম দুটি শুঁড়ে
বিচিত্র লাবণ্য এক পতঙ্গের ক্ষীণসত্তা জুড়ে
জাগালো মহিমা অপরূপ
ভরে গেল কল্পনার ঐশ্বর্যে মনের অন্ধকূপ।
কিছুক্ষণ স্বপ্নের জগতে
হৃদয় আচ্ছন্ন ক'রে উড়ে গেল মুক্ত দ্বারপথে
বেগুনী হলুদ নীল রক্তিম সোনালি
রঞ্জনে রঞ্জিত পক্ষ কম্পিত রূপের দীপ জ্বালি
স্বপ্নদূত প্রেম-প্রজাপতি,
কেড়ে নিয়ে উড়ে গেল কলমের নিঃশব্দ প্রণতি।

৩০শে এপ্রিল ১৯৩৮

ফড়িং

ফড়িং জানে না ভয় নিরীহ নিঃশব্দ বিচরণে
ফুলে ফুলে অভ্রপক্ষ মৃদু সঞ্চালনে
উৎফুল্ল আনন্দে দোল খায়
লঘু ছন্দশিহরণ প্রাঞ্জল পাখায়
অবয়বে ক্ষীণ শিল্পমায়া
মুকুলে পল্লবে তৃণে কিশলয়ে কাঁপে তা'র ছায়া।
প্রাণোল্লাসে স্বপ্নকণা ওড়ে ঘুরে ঘুরে
রোমাঞ্চিত শিশিরের সুরে
অলস মর্মরে শ্যাম সবুজের গান
সচল রেখায় কম্পমান
উজ্জ্বল ফড়িং
অভ্রপক্ষে রামধনু রৌদ্রদীপ্ত কাঁপে সারাদিন।
ফড়িং জানে না বিশ্বভাবনার কথা
নেই আকুলতা
জন্মের মৃত্যুর এ সংসারে
জানে না কবিত্ব কারো জাগে কি জাগে না তার ডানার বাহারে!
দিন কাটে লঘু স্বপ্নজালে
তবু অপঘাত ঘটে জীবতত্ত্ববিজ্ঞানীর জালে,
শিশু-দৈত্য হানা দেয়
অন্তহীন কৌতুহলে অপরাবিদ্যায়

ক্রুর বিহঙ্গের ঠোঁটে পাপড়ী-ছেঁড়া কুসুমের মতো
আকস্মিক আক্রমণে নিমেষে নিহত
তবুও ফড়িং
স্থলপদ্মে কাশপুষ্পে কেতকীকেশর শংকাহীন
নাচায় উজ্জ্বল অভ্রপাখা
প্রকৃতির নিরঞ্জনী কারুশিল্প আঁকা।

২৭শে মে ১৯৩৮

কাকাতুয়া

কে রে তুই! কে রে তুই! তীক্ষ্ণস্বরে ডাকে কাকাতুয়া।
আন্‌বাড়ী যায় যদি আমার বধূয়া
আমারি আঙিনা পথ বেয়ে
আমার হৃদয় মৌন-অন্ধকারে ছেয়ে!
অবোধ পাখির সেই সরব জিজ্ঞাসা
দাঁড়েবসা পাখিপড়া ভাষা
যখনি মানুষ দেখে আঙিনায় প্রকাশ্যে গোপনে
তীক্ষ্ণস্বরে ডেকে ওঠে নিতান্ত জৈবিক প্রলাপনে।
যার কথা তার বাজে
মূঢ় বিহঙ্গম তোলে বিচিত্র ভাবনা মর্মমাঝে।
কে রে তুই! কে রে তুই! মানুষের কণ্ঠ-অনুকারী
আন্‌বাড়ী যাত্রাপথে বোঝে সবি সুরসিকা নারী
আমারি অঙ্গনে হায় আমারি বধূয়া
চলে যায়, মূঢ় কাকাতুয়া
কে রে তুই? কে রে তুই? ডেকে ওঠে সুতীব্র চিৎকারে
নিরালায় দুপুরের বিহঙ্গ-ঝংকারে!
বেদনায় হৃদয় নির্বাক
বিদ্যুৎ চকিত মেঘে ঘনায় বৈশাখ
প্রেম তাই করেনাকো ক্ষমা
অভিসারে যদি যায় নিঃশব্দচারিনী প্রিয়তমা!
কে রে তুই! কে রে তুই! ডাকে কাকাতুয়া
নিরপেক্ষ বিহঙ্গম বোঝেনাকো মাৎসর্য অসূয়া!

১৬ই মে ১৯৩৮

জোনাকি

আকাশে নীলাভ অন্ধকার
একটানা শোনা যায় ঝিল্লির ঝংকার।
পুঞ্জে পুঞ্জে ছায়াচ্ছন্ন লতায় পাতায় ফুলবন
সুরভিত তন্দ্রায় মগন;
তামসী রাতের শ্যামাঞ্চলে
চূর্ণ চূর্ণ হীরকের দীপ্তিকণা জ্বলে
আকাশের সংখ্যাহীন তারা
রাত্রির মুকুরে যেন প্রতিবিম্ব দেখে আত্মহারা
পল্লবিত অরণ্যের ছায়াচ্ছন্ন বুকে
ঝিকিমিকি কামনার সুখে।
সম্মুখের দেবদারুশাখে
একা একা রাতজাগা বিরহ-বিধুর পাখি ডাকে
লতায় পাতায় গুল্মে চঞ্চল প্রহর
কণা কণা চন্দ্রিকার শিহরণে কাঁপে থর থর
রোমাঞ্চিত ঝিল্লির ঝনকে
শত শত মণিদীপ্ত রাত্রির অলকে।
স্বপ্নের তিমির ঢাকা চঞ্চল মনন
মূক মর্মে কাঁপে সারাক্ষণ
এলোমেলো বাতাসের আবেশজড়ানো অন্ধকার,
শুনি বসে ঝিল্লির ঝংকার
ডেকে ওঠে রাতজাগা পাখি
হীরকের দীপ্তিকণা জ্বলে নেবে চঞ্চল জোনাকি।

২১শে এপ্রিল ১৯৩৮

পারাবত

কার্নিসে মেধাবী পারাবত
বহুক্ষণ বসে আছে দুপুরের নির্জন জগত
উদাসীন অশথের ডালে
ভাঙা ভাঙা রোদ কাঁপে সবুজ পাতার অন্তরালে।
মাঝে মাঝে কম্পিত কূজনে
গান গায় একান্ত নির্জনে।
উজ্জ্বল রেশমশুভ্র মসৃণ পালখে
কী অদ্ভুত মায়া, লালচুনী দুই চোখে
দূরদৃষ্টি সশঙ্কিত আকাশ-সন্ধানী
কেন ভয় অর্থ তার জানি;

তাকাই জ্বলন্ত নীল আকাশের সীমায় সীমায়
বক্রচঞ্চু ঘৃণ্য বাজ যদি কোন প্রান্তে দেখা যায়!
শাঁ শাঁ করে দুপুরের হাওয়া
মুকুলিত আম্রবনে মৃদু গান গাওয়া
শোনে মুগ্ধ পারাবত
হঠাৎ বাঁকায় গ্রীবা চেয়ে দেখে দীর্ঘ সূর্যপথ
আদিগন্ত প্রসারিত,
নেমে আসে কৃষ্ণবিন্দু অমঙ্গল ক্ষিপ্র অবারিত!
দ্বিগুণ ক্ষিপ্রতা নিয়ে মেধাবী কপোত উড়ে আসে
আমার নির্জন ঘরে নিরাপদ নিশ্চিন্ত আবাসে।
কর্কশ চিৎকার ছেড়ে ব্যর্থক্রোধে শূন্যে ঘুরে ঘুরে
উড়ে যায় ঘৃণ্য বাজ দূর থেকে দূরে!

১৮ই এপ্রিল ১৯৩৮

শিশিরঝরা গান

টুপ্ টাপ্! টুপ্ টাপ্! শিশিরের শব্দের
রাত প্রায় শেষ হ'তে দেরি নেই!
গাছে গাছে কুয়াশার হিমঝরা থম্‌থম্
পল্লবে পল্লবে টুপ্ টাপ্॥

চুপচাপ নিঃঝুম নির্মেঘ কুয়াশায়
ভোর এলো পাখিডাকা ছন্দে!
সূর্যের হাতছানি রাতজাগা রাত্রির
দিগন্ত-শয্যায়॥

ঘুম ঘুম চোখ দু'টি সবে ঘুম ভাঙলো
ঠোঁট দু'টি করবীর কাঁপে শ্বেতপাপড়ি!
ভোর এলো ঘুম ঘুম রাত্রির প্রান্তে
টুপ টুপ! টুপ টুপ! শিশিরের শব্দের
বনময় তন্ময় আধফোটা সুরভি॥

ঝির ঝির! ঝির ঝির! পূবে হাওয়া বইছে!
ঘুম ঘুম চোখ তা'র!
সাধ যায় ঘুমভাঙা
ওষ্ঠের পাপড়িতে
এ'কে দিই দুরু দুরু কম্পিত চুম্বন,
নিঃঝুম নির্জন কুয়াশায়॥

টুপ্ টুপ্! টুপ্ টুপ্! কেয়াবন উন্মন,
টলমল ছলছল গঙ্গায় গৈরিক!
এলোমেলো রাত্রির ঝলমল কুন্তল
পান্নার কান্নায় টুপ্ টুপ্ ঝিলমিল
ঝুরিনামা অশথের
পল্লবে শিশিরের ছন্দ॥

টুপ্ টুপ্! টুপ্ টুপ্! ঝাউবনে শিরশির,
কুয়াশার বুকচেরা হিমঝরা কাঁপনে
ভৈরবীরাগিনীর,
বীণ্ বাজে রিম্‌ঝিম;
অতন্দ্র উদাসীন
দিগন্তে শুকতারা ঝলমল॥

ঝুপ্ ঝুপ্! ঝুপ্ ঝুপ্! শাখে শাখে কাঁপে নীড়
স্বপ্নের রূপকথা জাগে পাখ্‌পাকালি
দিঘিজলে কুয়াশায় শিশিরের টুপ্‌টাপ্
ঘুম ঘুম স্বপ্নের
রক্তিম লগ্নের
হাই তোলে আধফোটা পদ্ম॥

২৬শে নভেম্বর ১৯৩৪

ক্রন্দসী

তোমার পাণ্ডুর মুখে রক্তশূন্য মরণ-যাতনা
তোমার রক্তিম বুকে শব্দহীন বহে ফল্গুনদী,
জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো
সূর্যালোকে মূর্চ্ছাগত
প্রকাণ্ড বিস্ময়ভরা প্রেম তব বহে নিরবধি।

আমার বুকের চিরবিষণ্ণ প্রশ্নের মত তুমি।
ঘুম কেড়ে নিয়ে জাগায়ে রেখেছ রচিয়া স্বপ্নভূমি॥

চিতাশয্যা বিরচিয়া স্বপ্নরাজ্যে হে মহিমময়ী,
অভিসার পথে টানি দুর্যোগের ঘন যবনিকা,
অঙ্গের উত্তাপ তব
একী তীব্র অভিনব
জেলেছ আমার বক্ষে অচঞ্চল বিদ্যুতের শিখা!

সেইতো তোমার প্রেমের মহিমা জীবনের পথে পথে।
রাত হ'তে দিন, দিন হ'তে রাত, যুগ-যুগান্ত হ'তে ॥

অভিশপ্ত আত্মা তব স্বর্গ হ'তে অগ্নিশিখা হরি'
নিখিল কবির মনে জ্বলায়েছে দীপ্ত হোমানল,
প্রেম-বিহঙ্গমী উড়ে
স্বর্ণমেঘসৌধচূড়ে
হিরণ্যপক্ষের ছায়ে জ্বলে লক্ষ স্বপ্নের কমল!

অভিসার তব অলকাপুরীর অলকনন্দাতীরে,
ঝঞ্ঝাছিন্ন মেঘরেখা সম নভোসীমান্ত ঘিরে ॥

বিদ্যুৎ সারথি তব রথচক্রে বজ্র কেঁদে মরে
ঘুমাও সুদীর্ঘ রাত্রি মৌনঝড় তুলিয়া নিঃশ্বাসে
সমুদ্র প্রেমিক মন
ডাকে তোমা' সারাক্ষণ
হে সুপর্ণা মেঘকন্যা, তব প্রেমে বিপুল উচ্ছ্বাসে।

উদয়ের পথে উল্কাচক্ষু মেলিয়া তপন কাঁদে।
রশ্মিতে শত স্বর্ণ-ভ্রমর তোমারি রাগিনী সাথে ॥

বিশাল সৃষ্টির বুকে তুমি এক সৃষ্টিছাড়া মেয়ে
কি যে তুমি চাও প্রিয়ে দাও নাই কোনো সদুত্তর,
রূপের রোমাঞ্চ জাগে
আত্মঘাতী অনুরাগে
ওগো বিদ্রোহিনী তব মুখপানে চেয়ে নিরন্তর।

হে বনবিহগী, একী বনমায়া দিয়াছ আমার মনে।
উদাসীন বুকে দিন কাটে মোর কারণে ও অকারণে ॥

দুঃখের প্রচণ্ড সুর বৈশ্বানরী দীপক রাগিনী
অদ্ভুত বীণায় তব শব্দহীন বাজে অন্ধকারে,
আঘাতের উন্মাদনা
মর্মে মোর হে উন্মনা,
জাগ্রত করেছ তুমি মহাকাব্য ছন্দের ঝংকারে।

তোমার হংস শ্বেতপাখা মেলি হে প্রিয়ে কাব্যময়ী,
চিরঅতৃপ্ত আত্মারে মোর করেছে মৃত্যুজয়ী ॥

২৭শে জুলাই ১৯৩২ —দাক্ষিণায়ন

রাজকন্যার প্রেম

শুধু চোখে দেখে হায়, ভালোলাগা
জানি কী যে নিদারুণ মায়া!
যেন শূন্যের চাঁদ শূন্যে থাকে
কাঁপে দিঘিতে সোনালী ছায়া।

কত রাত জেগে শোনা রূপকথা
রাঙা রাজকুমারীর প্রেমে,
আনে রাখালের বুকে মধুঋতু
ভয়ে যৌবন ওঠে ঘেমে॥

শুধু চোখে দেখা প্রেমে দুঃসাহস
যেন আকাশে ছোঁয়ায় মাথা!
জানি বলিষ্ঠ বাহু বীর্যবান
বুকে শরাসন আছে পাতা।

তবু সংকেত যদি না পাই তা'র
সেই চোখে দেখা নীরবতায়
হায় বৃথা ঝড় তুলে অন্ধকার
কাঁদে নিভৃতে খাতার পাতায়॥

লঘু হৃদয়ের যত বাসনারা
মিছে চোখে চোখ রেখে হাসে,
ভাবে অভিসারিকার ছায়াপথে
বুঝি চুপিসাড়ে রথ আসে?

জানি সে রথের নাম পক্ষীরাজ
তা'র চাকা নেই আছে ডানা
সে যে মাটিতে কখনো ছোটেনাকো
সে যে ধরাতলে রাতকানা॥

হায় রাজকুমারীর বাঁকাচোখে
যদি বিদ্যুৎ যায় খেলে;
জানি নীরবে সে করে নির্বাচন
কোনো আদুরে রাজার ছেলে!

শুধু চোখে দেখে হায়, ভালোলাগা
জানি করুণ কাব্যমায়া!
যেন শূন্যের চাঁদ শূন্যে থাকে
মিছে দিঘিতে কাঁপায় ছায়া॥

২৭শে এপ্রিল ১৯২৭

দ্বাদশীর চাঁদ

সিঁথিতে তোমার ধূধূ মরুভূমি বক্ষে পদ্মানদীর চর
বারো পেরুতেই শেষ করে এলে স্বামীর ঘর!
মুখের হাসিটি নিষিদ্ধ হ'ল, নিষিদ্ধ হ'ল পান খাওয়া
ওষ্ঠ রাঙানো সহজ প্রাণের গান গাওয়া।
নবমকুলিত তনুতটে
শাস্ত্র-শাসনে সংকটে
কেটে গেল চল-চপলা কিশোরী রঙীন মনের সুরগুলো
নিষিদ্ধ হ'ল সমবয়সের উচ্ছল যত খেলাধুলো।

আমার জীবনে তুমি এলে যেন পথহারা ঝড় এলোকেশে
সভয়ে চকিত অঞ্চলে ঢাকা সর্বনাশের হাসি হেসে!
হাতে ছিল বনপথে যেতে যেতে নির্জনে তোলা একটি ফুল
নীরব সে ফুল চয়নে তোমার বাসনার কোনো ছিল না ভুল!
তোমার আমার মাঝে শুধু
নিষিদ্ধ মনোবিনিময় যেন মরুভূর মতো ছিল ধূধূ!

হাত থেকে ফুল পড়ে গেল ধূলিতলে
বিদ্যুৎভরা ডাগর চোখের জলে
জ্বালালে আমার বিদ্রোহী বুকে নিষিদ্ধ প্রেম-মরুশিখা,
কিশোর ললাটে পরালে গোপনে রক্তজবার জয়টিকা!
ধূলি থেকে রাঙাফুল তুলে নিয়ে পরায়েছি তব কবরীতে
নিঝুম দুপুরে জাগেনিকো সাড়া সেদিন দৈত্য-নগরীতে,
তোমার মনের রক্তিম আশা মরণকাঠিতে ছিল অসাড়
চারিদিকে ছিল ভ্রূকুটি নিষেধ খাড়া পাহাড়।
তনুতে তোমার দ্বাদশীর চাঁদ
জ্যোৎস্নায় ঢেকে সজল বিষাদ
ফোটালো বিজনে পাখিডাকা-মনে ভীরু ত্রয়োদশ ফুলকলি
ধূলি থেকে তোলা ফুল হাতে নিলে নিভৃত-প্রেমের অঞ্জলি।

১২ই নভেম্বর ১৯২৯

বন্দিনী

রুদ্ধ ছিল দ্বার
উচ্চকণ্ঠে তাই বারবার
ডেকেছি তোমায় তবু দাওনি উত্তর
সে ডাকের প্রতিধ্বনি ফিরায়ে দিয়েছে তেপান্তরে।
পাহাড়ে ভীষণ ধাক্কা খেয়ে
সে ডাক এসেছে ফিরে শূন্যের তরঙ্গ-পথ বেয়ে
সে ডাঁকের নিস্ফলতা
ভেঙেছে রাত্রির গম্ভীরতা
বৃন্তচ্যুত মুকুলের অকাল-মৃত্যুর অন্ধকারে
সে ডাক খুঁড়েছে মাথা তোমার নির্মম দুর্গদ্বারে।
জানি কেন তুমি
পারো না উত্তর দিতে বিষণ্ণ তোমার স্বপ্নভূমি
পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা;
সজাগ প্রহরী যত শাস্ত্র-বণিকেরা
রেখেছে বন্দিনী ক'রে
ভাগবতী শুদ্ধতায় শৃঙ্খলিত মুক্তির কবরে।
গবাক্ষের ছিদ্রপথে একদিন দিয়েছিলে দেখা
সেদিন হয়তো ছিলে একা,
দিয়েছিলে শৃঙ্খলিত প্রাণের ইঙ্গিত
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বেদনার দীপক সঙ্গীত
বেজেছিল সেইদিন থেকে
রুদ্ধদ্বারে বারবার তাই গেছি ডেকে!
নির্বিকার কারাদুর্গ হায় তবু দাওনিকো সাড়া
কতদিনে সুরু হবে বাসুকির ক্রুদ্ধ মাথানাড়া?

১৪ই মে ১৯৩৮

বাসবদত্তা

বৃথাই হায় জীবন যায় দিন গুনে
ওঠেনা তা'র আঁচলে আর রামধনু
ফোটেনা প্রেম-কাননে শ্বেতমল্লিকা
বিরহলীন কাটেনা রাত কবিতাতে।

অঙ্গে তার নেই চাঁপার স্বর্ণাভা
উষ্ণ সুখ রেশমী-লাল ওষ্ঠেতে
রুদ্ধ মন কাব্যে আর ছন্দ নেই
শান্তি নেই ব্যর্থ এই জন্মেতে।

বিফলে মোর দেহের বল ঘুচিয়েছি
আশার প্রেত তবুও দেয় হাতছানি,
আকাশে তাই মঙ্গলের লালদেহ
রাতে জ্বালায় ভাগ্যে মোর লালবাতি।

এখন তা'র রক্তহীন শবদেহ
করাল মারীগুটিকা-ক্ষতে কুৎসিতা,
চিনবে না মোর বাসবদত্তারে
ভ্রমরহীন শুক্‌নো ফুল নেই মধু।

একদা নীল আকাশে হায় যার তরে
তারুণ্যের পক্ষিরাজ উড়িয়েছি,
আজকে তা'র শূন্যে লীন মেঘ-নগর
জীর্ণ তা'র স্বর্ণকেশ রুক্ষতায়।

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

ভুলে যাবো

অনেক অনেকবার ভেবেছি তোমায় ভুলে যাবো।
ভুলে যাওয়া সোজা নয়, তবু ভুলে গেছি
অন্ততঃ ভোলার ভান, ঠিক ভোলা নয়,
তুমিও সে কথা জানো
তবু আত্মপ্রতারণা অসম্ভব অসম্ভব প্রিয়ে।

এখনো যৌবন আছে রূপবতী অনূঢ়া তরুনী
নিতান্ত সহজলভ্যা বহু আছে সুলভ-সমাজে,
তবু প্রেম অসম্ভব ফেনিল বুদ্বুদ নিয়ে খেলা
যাত্রার নায়ক সাজা হাস্যকর বিড়ম্বনা প্রিয়ে!

আছে তো অনেক সঙ্গী বহু প্রিয় বহু প্রিয়তমা,
তবু কেন তোমাতে আমাতে
হ'ল না বিচ্ছেদ আজো মানসিক, শারীরিক নয়
শরীর যদিও মুখ্য তবু আছে পুরাতন বাধা
পুরাতন নীতিকথা, বোধোদয়, মনু-সংহিতার
সমাজ-মণ্ডুকছত্রতলে।

অনেক অনেকবার ভেবেছি তোমায় ভুলে যাবো,
বিস্মৃতির তীর্থযাত্রা অসমাপ্য ক্রম-পলাতক

বিস্মৃতির ভগবান দশচক্রে ভূত হয়ে গেছে
তোমার স্মৃতির স্বর্গে।
তুমি আজ নারী নও, প্রেমের মাণিক্য হয়ে গেছ
স্মৃতির গহন খনিতলে
উজ্জ্বল স্ফটিকবর্ণে বিচ্ছুরিত সে প্রেমের আলো
হিরন্ময় অনঙ্গের মুকুরের মায়া,
তাইতো কবিতা লিখি।

প্রেমের কবিতা নয়, যে প্রেম অতৃপ্ত রয়ে গেল
বিচ্ছেদের নীহারিকা, বিচ্ছেদের অশ্রুবাষ্পে, বিচ্ছেদের মেঘে,
যে প্রেমে শরীর নেই। দূরে দূরে থাকা
যে প্রেমের পরিস্থিতি,
অনেক অনেকবার ভেবেছি সে প্রেম ভুলে যাবো।
যে প্রেমে মননশক্তি মরে পঙ্গুতায়
কূর্মগতি অসুস্থ আত্মায়
সে প্রেম আশ্রয় করা অসম্ভব অসম্ভব প্রিয়ে।

তাইতো কবিতা লিখি
সে কবিতা তোমার আমার
বিচ্ছেদের আঘাতের অতৃপ্তির মায়াবাষ্প নয়।
প্রকাণ্ড পৃথিবী পড়ে আছে
অনেক সমস্যা আর জাগতিক বহু দুর্ঘটনা
অনেক চাঁদের কথা অনেক সূর্যের ইতিহাস
অনেক অরণ্য গিরি সমুদ্র আকাশ
মুখর মৌনের ডাকে নিঃশেষে তোমায় ভুলে যাবো।

২৭শে জুলাই ১৯৩৪

স্মরণ

সেদিনও দেখেছি তাঁকে।
সেই মুখ সেই নাক সেই দু'টি বড় বড় চোখ,
অবাক চাহনি সেই ষোলোটি বছর আগেকার
আজ সে পড়েছে ঠিক বত্রিশ বছরে!
জ্বলন্ত যৌবনশিখা অবনম্র স্তিমিত কোমল
নিতান্ত সহজ আর স্বাভাবিকতায়
জেগেছে সর্বাঙ্গে তা'র ঋজু গম্ভীরতা
পূর্ণাঙ্গী নারী সে আজ!

সেদিনও দেখেছি তা'কে
কবরীর পারিপাট্যে অলঙ্কৃতা কবিতার মতো
শঙ্খশুভ্র-কণ্ঠে সূক্ষ্ম কারুস্বর্ণহার
অর্ধস্ফুট দু'টি পদ্মমুকুলের বুকে
অনাঘ্রাতা সুরভিতে বিহ্বল চঞ্চল।

ষোলটি বছর আগে উন্মুখ যৌবন জুড়ে তার
সলজ্জ প্রাণের বৃন্তে মুকুলিত রোমাঞ্চ কম্পিত
গান ছিল ছন্দ ছিল সুর ছিল প্রাচুর্যে উদার
সতেজ সরল তীক্ষ্ম অনভিজ্ঞতার।
আজ সে পড়েছে ঠিক বত্রিশ বছরে
সে তীক্ষ্ম শরীর আজ,—সে নিটোল বয়োসন্ধিকাল
গম্ভীর মন্থর ক্লান্ত,
সে চঞ্চল যৌবনের ঊর্ধ্বমুখী শিখা
করুণ নিস্তেজ নম্র
নমিত যুগলপদ্ম পূর্ণ প্রস্ফুটনে।
অপরিচয়ের দ্বিধা নেই আর রঙীন জ্যাকেটে
চঞ্চল তরঙ্গ নেই লাল শায়া ফিরোজা শাড়ীতে
সিঁথিতে সিঁদুর জ্বলে অগ্নিসাক্ষী-করা
বাম হাতে নোয়াবাঁধা স্বামীর জীবন!

ষোলোটি বছর আগে তা'র দুটি বড় বড় চোখে
ছিল এক যাদুকরী বশীভূতা আজ সে গৃহিণী
প্রণয়ের বোঝাপড়া কবে যেন শেষ হয়ে গেছে!
যৌবন-যমুনাতটে কোকিল কূজনে
কেটে গেছে ষোড়শ ফাল্গুন
মকরকেতন আজ নিঃশেষিত তূণ
তারুণ্যের স্বর্ণসন্ধ্যালোকে।

আজ মনে হয়
একা একা সামুদ্রিক দীর্ঘ ব্যবধান
পার হয়ে ষোলটি বছর
এসেছি কি বহুদূরে?
যৌবনের তটপ্রান্তে ফেলে আসা ষোড়শী-হৃদয়
আজো কি স্মরণ করে সেদিনের বিচ্ছেদের স্মৃতি
বত্রিশ বসন্তপুষ্ট তরুণীর সমস্ত শরীরে?

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

প্রেমশিখা

তুমি নেই তাই শূন্যঘরের অন্ধকারের মধ্যে
একা একা প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ঝড় এল কালবোশেখী
ঘোলাটে মেঘের উদ্দাম গতি এলোমেলো হাওয়া বইছে!
তোমার হাতের সূচীশিল্পের সবুজপর্দা উড়ছে!
তুমি নেই তাই মন উদাসীন
স্মরণের বীণা বাজে রিম্‌ঝিম্‌
বিজনঘরের স্তিমিত আলোয় প্রদীপেব বুক পুড়ছে!

তুমি নেই তাই প্রতীক্ষাময়ী চঞ্চল ঝোড়ো রাত্রে,
আচমকা শুনি পায়ের শব্দ। অস্ফুট ভাষা শুনেছি!
বহিরাকাশের প্রান্তরে কত মেঘ-তুরঙ্গ ছুটছে
চোখে বিদ্যুৎ নিকষ আঁধারে অগ্নি-মুকুল ফুটছে
অস্ত গিয়েছে মিলনের চাঁদ
মেঘে মেঘে তাই গভীব বিষাদ
আবছা আঁধারে হৃদয়ের দীপে শিখায়িত প্রেম কাঁপছে।

৪ঠা এপ্রিল ১৯৩০

চিহ্ন

সাদা কুয়াশার শবাচ্ছাদনে ঢাকা
পাহাড়ী আকাশ পউষের উষালোকে,
ঘুম ভেঙে মন বিমর্ষ হ'ল কেন?
ভোরের পাখিরা কাঁদে অকারণ শোকে।
তুমি কাছে নেই শূন্য শয্যা মোর
এখনো চোখের কাটেনি স্বপ্নঘোর॥

ঘন রোমাঞ্চে এখনো কাঁপিছে দেহ
স্মৃতির চিহ্ন ক্লান্ত শরীরে আঁকা,
হিমেল হাওয়ায় দেবদারুবন কাঁপে
পাহাড়ের চূড়া কোমল হিমানী ঢাকা।
শাসীর গায়ে তুহিন বাষ্প লেগে
রাতের অশ্রু এখনো রয়েছে জেগে॥

৫ই এপ্রিল ১৯৩০

প্রভাতে

আজ এই সূর্যোদয়ে মনে মনে বলি ঃ
হে প্রভাত অবসাদ অপরাধ যত
ধুয়ে দাও সোনার আলোয়!
এ জীবনে যেন আর আসে না আমার
অশ্রুমুখী রাতের আলেয়া।

পিছুডাকা রাতজাগা অতি-অসহন
অপমানে মরে-থাকা মন
আর না আর না হে প্রভাত,
সয়েছি তো দুঃসহ অনেক আঘাত
সময়ের কালোজলে
নোনাজলে ঢেউ খেয়ে সাঁতার কেটেছি
সারারাত।
মনে মনে লঘু সুরে আজ তাই
করি উচ্চারণ ঃ
হে আকাশ খোলো খোলো
অসহ রাতের কালো মোহ আবরণ!

৬ই এপ্রিল ১৯৩০

প্রতিমা

প্রতিদিন তাঁকে দেখি সেও যেন আমাকেই দেখে
সরে যায় অন্তরালে আবার দাঁড়ায় বাতায়নে,
আমাকে দেখেও যেন দেখেনা, সে ছবি যাই এঁকে
নিরিবিলি কবিতায় সে যখন থাকে আনমনে॥
দু'শ গজ দূরে সেই লাল বাড়ীটার জানালায়—
তাকে দেখি মনে হয় সেও যেন নীরবে তাকায়॥

অপরূপ সুন্দরী সে প্রত্যহ দাঁড়ায় বাতায়নে,
চোখে চোখে দেখা হয় নীরব নিথর বাসনায়;
একদিন দেখি তাকে চলেছে সে ভাইটির সনে,
ভয়ে ভয়ে রাজপথে দু'চোখে পলক নেই হায়!
দূর থেকে স্বপ্ন দেখা নিমেষেই হ'ল অবসান—
রূপসীর চোখে নেই চাহনির দান প্রতিদান॥

২১শে মার্চ ১৯৩২

চঞ্চলা *

প্রথম তোমায় দেখে মনে ছিল ভাবনা
কালের জোয়ার-জলে মিশে গেলে পাবো না!
জেনে শুনে তবু আজো ফুলফোটা ফাগুনে
পাখি ডাকে সুরে নয় স্মরণের আগুনে।
সোনালী চাঁপার শিখা গোধূলিতে পুরবী
রাগিণীর ছায়া কাঁপে। ভেসে আসে সুরভি।
প্রথম দেখার সেই লঘু মনোবাসনা
জানি সেদিনের মতো আর তুমি আসো না
পাতাঝরা বনপথে। আজ বেলা বেড়েছে,
ছোট রাত দু'চোখের ঘুম তাই কেড়েছে
বুকে চেপে রাঙাফুল। কবিতায় বনিতায়
রচি' পদবিন্যাসে ভঙ্গীতে ভনিতায়
বিরহের মায়াপুরী। এলোমেলো ভাবনা
বুকে হানে করাঘাত পাবো আর পাবো না!

২৮শে মার্চ ১৯৩২

সেই কথাটি

সেই পাখিটার নাম কি জানি? হঠাৎ ডেকেছিল
শেষ কথাটি শুনিয়ে দেবার চরম সময়টিতে।
নিকষ-কালো কাজল মেঘে আকাশ ঢেকেছিল
সেই কথাটি বলতে যাওয়ার নিঝুম পৃথিবীতে॥

সেই কথাটি হাল্কা বড়ো সেই পাখিটি কালো
সুর-জাগানো রঙ-মাখানো তোমার মনের বনে
হারিয়ে গেলে সে কোন চাঁদের শিখায় প্রদীপ জ্বালো?
সেই কথাটির লাবণ্য কি পাও খুঁজে নির্জনে?

লগ্ন খুঁজে পাই না যখন সেই পাখিটার নামে
কাজল-কালো ডানায় ঢাকা ফাগুন মাথা খোঁড়ে,
সেই কথাটির পাপড়িখসা রাত্রি যখন নামে
লাল-জোনাকির চপলপাখায় নীল-বাসনা পোড়ে!

আকাশ-পিদিম জ্বালিয়ে খুঁজি সেই পাখিটার বাসা
দিগন্তহীন অন্ধকারের অকূল তেপান্তরে,
পাই না খুঁজে বলতে-যাওয়া সেই কথাটির ভাষা
দু'চোখ বেয়ে ঝাপ্‌সা রাতের শিশিরকণা ঝরে।

১১ই জুলাই ১৯৩০

রূপান্তর

আমার মধ্যে তুমি বেঁচে আছো তোমার মধ্যে আমি
কী যে অদ্ভুত বানানো মিথ্যে কথা।
অমাবস্যার অকূল তিমিরে যে চাঁদ অস্তগামী
সে চাঁদের প্রেম কোথা পাবে অমরতা?

বরং যেখানে বেঁচে থাকাটাই প্রবল-ইচ্ছা হ'য়ে
পৃথিবীকে বলে, 'তুমি আছো, তাই আছি!'
অক্ষয় যদি না হয় জীবন প্রতিদিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে
জ্বলন্ত মোমবাতিটার মতো বাঁচি।

আমার কথায় তুমি হ'বে সুখী তোমার কথায় আমি?
শোনে যদি সুখ অসুখে মরবে ভুগে।
আকাশের কথা পৃথিবীর কাছে কোনদিনই নয় দামী
তাইতো পৃথিবী সুখী হয় যুগে যুগে।

একালের মন জয়ী হ'তে চায় সকলের মন কেড়ে
একা মরে যাওয়া, অসহ্য অপমান,
প্রতিটি প্রাণের সুরে সুর বাঁধা একক সাধনা ছেড়ে
রোমাঞ্চকর কালের ঐকতান।

তোমার আকাশে মেঘ জমে যদি আমার আকাশে ঝড়
রাঙাবিদ্যুৎ চমকানো মনোরথে;
কিসের দুঃখ? ভেঙে তো এসেছি সাতশো রাজার গড়
শিলায়-ব্রোঞ্জে-লোহায় বাঁধানো পথে।

আমাকে না-পেলে কি হতো তোমার, তোমাকে না-পেলে আমি
কী যে করতুম সে কথা অবান্তর!
দিন তো থামে না কত যে বাসনা দুরন্ত সংগ্রামী।
কত শত প্রেম পেয়েছে রূপান্তর।

২৩শে মার্চ ১৯৫৫

নিরবধি প্রেম

আমাদের পৃথিবীর অনেক অনেক কথা অনেক পুরোনো ইতিহাস,
স্মৃতির আকাশে আর মনের তলায় শুয়ে চুপি চুপি ফেলে নিঃশ্বাস।
যখন বসিয়া থাকি পোড়োবাগানের কাছে অথবা নদীর ভাঙাঘাটে,
যখন দিবসগুলি নির্ভাবনায় আর অলস উদাস মনে কাটে;
কত পাখি উড়ে যায় নাম জানিনাকো তা'র নাম জেনে লাভ নেই কিছু,
ওরা পাখি জানি আর এ-ও জানি কখনও উড়িব না উহাদের পিছু।

বনের নানান্ ফুল নানান্ গন্ধে মিশে জাগায় আবেশ বুকে কত
অনন্ত বাসনার বাজে বেণু বীণা কা'র অন্তর মাঝে অবিরত!
জীবনের কত কথা, কত মোহ মাদকতা, পাওয়া না-পাওয়ার কত স্মৃতি
নিঃশেষে ভুলে গেছি একা ব'সে সাধি তাই নতুন দিনের প্রেমগীতি।
নতুন ফাগুন এলে যে মুকুল ফুটে ওঠে পুরানো তরুর শ্যামশাখে,
সে কি জানে তা'র আগে কত ফুল ঝরে গেছে কতবার কত বৈশাখে?

চপল নদীর বুকে কখনো জোয়ার আসে কখনো বা আসে ক্ষীণ ভাঁটা
গোলাপ ফুলের বনে কখনো গোলাপ ফোটে কখনো বা পড়ে থাকে কাঁটা।
আমাদের পৃথিবীকে ভালো ঠিক বাসি কিনা জিজ্ঞাসা জাগে মনে মনে,
ভালো তা'কে বাসিনাকো নিজেকেই ভালবাসি এই কথা ভাবি অকারণে।
কারণ আমাকে নিয়ে আমার পৃথিবী আর পৃথিবীর যত ইতিহাস,
তাই তা'রা আমার এ হৃদয়ের তলে তলে কবিতায় ফেলে নিঃশ্বাস।

আমি যাকে ভালবাসি তাহার গোপন বুকে কণা প্রেম নাহি থাকে যদি,
তবে কি বলিবে ভাই বৃথাই বহিয়া যাবে আমার এ ভালবাসা-নদী?
তখন আবার আমি তা'রি প্রেম সেধে লবো যার বুকে আছে ভালবাসা,
একজনে হারালে কি অপরজনের প্রেম পাইবার নাহি থাকে আশা?
জানি এই পৃথিবীতে অনেক লোকের বাস মান আর অভিমানে ভরা,
একূল ওকূল নেই আশার সাগর নাচে প্রতি মানুষের বুকভরা।

আজিকার বন্ধুরা কাল যদি চলে যায় তা'তে আর কি এমন ক্ষতি?
প্রথমা প্রেয়সী যদি নতুন প্রেমিকে পেয়ে রাতারাতি হয়ে পড়ে সতী?
তখনো জানিও ভাই এ বিরাট সংসারে আরো কত আছে নরনারী
আরো কত আছে প্রেম, কত সুখ, কত আশা, বুকভরা পিপাসার বারি।
বিফলে যায় না কিছু এ বিরাট পৃথিবীতে পড়ে থাকে কত ইতিহাস
সে আশায় অমরতা লভি আর মনে মনে স্বস্তির ফেলি নিঃশ্বাস।

২৪শে মার্চ ১৯৩১

শাশ্বতী

এসেছে অনেক ঝড় বহু যুদ্ধ প্রলয় প্লাবন
উন্মত্ত বরাহদন্তে ভীমকায় নৃসিংহনখরে
বিজয়ীর অশ্বক্ষুরে যান্ত্রিক আঘাতে
শতদীর্ণ হয়েছে পৃথিবী
বিধ্বস্ত বিকৃত অসহায়!
মিশে গেছে রোমাঞ্চিত নিরালম্ব মহাকাশপথে
দীর্ঘনিঃশ্বসিত হাহাকার
প্রাচীন পুরাণ প্রাজ্ঞ অজোহনিত্য শাশ্বত আত্মার।

আজো তবু মরেনি পৃথিবী
তুমি আমি সমুদ্র আকাশ
বেঁচে আছি শতকোটি অর্বুদ বৎসর।

বহুবর্ণে ফুল ফোটে সবুজপাতার ফাঁকে ফাঁকে
অরণ্যে বিহঙ্গগীতি, জনারণ্যে মানবিক ভাষা
ভেসে ওঠে স্বপ্নময় প্রবালের দ্বীপ
প্রেমের হিরণ্যদ্যুতিময়
যৌবন-সমুদ্র বুকে।
পৃথিবীর স্বপ্নে আজো সংখ্যাহীন তুমি আর আমি
পান করি অধরে অধরে
তৃপ্তিহীন কামতপ্ত সোমসুধারস
উন্মাদ রোমাঞ্চকর মদস্রাবী গাঢ় আলিঙ্গনে।

ভেসে যায় সর্বসত্তা অপ্রমত্তা মিলনে তোমার
ভেসে যায় নীতিবাদী পুরাণের লক্ষ অবতার
যতক্ষণ সৃষ্টির উল্লাসে
না আসে জন্মের লগ্ন অনাগত অঙ্কুর আত্মার
অন্তহীন প্রেমোল্লাসে আমরাও ভেসে চলে যাই
তুমি আমি, মানব মানবী,
আনন্দের প্রাণ-পদ্মে অবিচ্ছেদ্য গন্ধ-পরিমল।

এসেছে অনেকবার ঝঞ্ঝাময়ী বিপ্লব-রজনী
অতিকায় সরীসৃপ, বুদ্ধ খৃষ্ট তৈমুর চেঙ্গিস
বলিষ্ঠের—দুর্বলের, ক্ষণিকের—স্থায়িত্বের মোহ
ক্ষণমাত্র দেয়নিকো দোলা,
আমাদের উৎসবের অন্তহীন আদিম প্রহরে,
তোমার আমার প্রেম আজো তাই জরামৃত্যুজয়ী।
মদোন্মত্ত মিথুনের সুনিবিড় আতপ্ত নিঃশ্বাস
স্তম্ভিত করেছে বিধাতাকে!
পাপপ্রসূ দাসত্বের শাস্ত্রীয় বন্ধনে
অর্থহীন আত্মসমর্পণ
শিলীভূত সনাতন অজ্ঞতার অজৈব বিধাতা।
একমাত্র সত্য শুধু তুমি আর আমি,
তুমি বহ্নি-বিহঙ্গমা প্রেমলুব্ধ জ্বলন্ত ক্ষুধার
আমি সৃষ্টি-সাধনার ভীমপক্ষ বিহঙ্গ দুর্বার।

তিন কেন্দ্রে তুমি আমি সচলা পৃথিবী
অবাধ্য কালের পায়ে পরায়েছি অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল।

তাই ফোটে ফুলদল তাই ওঠে তারা,
ঘামে ঘুম আদিত্যের চোখে
ধন্য হয় বসুন্ধরা ঐশ্বর্যশালিনী
ধন্য হয় বহুজনসুখায় জীবন।
হে প্রিয়ে তোমার—
প্রাণশক্তি উদ্বোধক অনন্ত-প্রেমের সিংহদ্বারে
আমাদের কামনার সূর্য দেখা দেয়
জীবন্ত-বহ্নির পিণ্ড ভবিষ্যের নিয়ন্তা দুর্জয়,
উপেক্ষিয়া ঝড় বৃষ্টি প্রলয়ের ভ্রূকুটি-বিলাস।

৪ঠা বৈশাখ ১৩৪৫

অমৃত

নাগ-বাসুকির ফনার ওপর আদ্যিকালের মেয়ে
পৃথিবী গো তোমার নাকি বাসা?
অঙ্গে তোমার রতির বিলাস সৌর-আকাশ ছেয়ে
পঞ্চশরের খুঁজছে ভালবাসা।
জীবন মরণ জড়িয়ে রেখে নিবিড় মায়াজালে
রূপান্তরের ঘূর্ণী তোমার ঘোরাও কালে কালে॥

হাজার তারার চুমকি-আঁকা নীলাম্বরীর নীলে
জ্বলছে কত সাধ্য-সাধন-সাধ!
নীল-বাতাসের আঁচলখানির একটু কাঁপন দিলে
কক্ষপথের ঘটায় পরমাদ।
দূর্বাদলে শিশির জ্বলে কান্নাঝরা গানে
পলকহারা তাকিয়ে থাকে আকাশ তোমার পানে॥

সূর্যে প্রেমের প্রদীপ জ্বলে মাথায় চাঁদের মণি
মত্ত সাগর লাবণ্যে চঞ্চল!
বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে লক্ষ রূপের খনি
লতায় পাতায় জড়াও শ্যামাঞ্চল।
সম্ভাবনার সুধায় ভরা তোমার বুকের মধু
প্রথম প্রেমের ওষ্ঠে ধরে প্রথম রাতের বধূ॥

১২ই জানুয়ারী ১৯২৭

প্রাণ-যাত্রা

ঝড়ের দোলায় অতিকায় মেঘ-বিহঙ্গদল পাখা নাড়ে
পালকে পালকে চমকায় রাঙা-আলো
চঞ্চল পদধ্বনিত রাত্রি তোমার আমার ঘুম কাড়ে
অসমপথের ছায়া কাঁপে কালো কালো।

তৃষা-কম্পিত ওষ্ঠে তোমার ক্ষণ-চুম্বিত জ্বলে শিখা
ঘন-বন্ধনে স্পন্দিত দু'টি মনে
ভীরু প্রেমিকের স্বপ্ন-মথিত এ মিলন নয় মরীচিকা
জাগ্রত যুগ-সাধনার মহাবনে।

পুঞ্জিত মেঘ-বিহঙ্গদল ঈশানের কালো গুহা ছেড়ে
ধূসর পক্ষে ছেয়ে ফেলে মহাকাশ
তোমার আমার শ্বাসে প্রশ্বাসে শ্রম-তরঙ্গ ওঠে বেড়ে
প্রত্যাশী মনে ঝড়ের পূর্বাভাস।

শ্রেণী-শঙ্কিত বিষমপথের ছায়া-গম্ভীর বাঁকে বাঁকে
অযুত মশাল নেভে জ্বলে বারবার,
বিপ্লবী প্রাণশিখার আগুন জনারণ্যের ফাঁকে ফাঁকে
ধৈর্যে অটল উদ্যত ক্ষুরধার।

বারবার কত ঝড়ের দোলায় আমাদের প্রেম দোলায়মান
পাওয়া না-পাওয়ার ঘন-অরণ্য শাখে,
বহু যুগ পরে দীপ্ত প্রাণের রুদ্র-বীণায় শুনেছি গান
দূরে অনাগত কালের কোকিল ডাকে।

সুখাবেশে আঁখি নিমীলিত নয় চারিচোখে জ্বলে শুকতারা
দু'টি জীবনের শুভ্র আকাশপটে,
কোনো মোহ আজ তোমার আমার করেনি চিত্ত দিশাহারা
সচেতন যুগসৃষ্টির তনুতটে।

অনঙ্গ আজ অঙ্গ ধরেছে কোটি অঙ্গের বন্ধনে
কোটি কোটি রতি করেছে ভাগ্যজয়,
অশরীরী ছায়া শরীরী কায়ায় ভুলেছে অলস ক্রন্দনে
প্রেমের দ্বন্দ্ব ঘুচেছে বিশ্বময়।

বৃথা নিষেধের পুঞ্জে প্রলাপ এলোমেলো বয় ঝোড়ো রাতে
ভ্রূকুটি কুটিল গর্জিত গুরু গুরু,
কোটি কোটি দেহে তুমি আর আমি প্রেম-চুম্বিত বরষাতে
বাঞ্ছিত প্রাণ-যাত্রা করেছি সুরু।

১৭ই ফাল্গুন ১৩৪৫

ফাল্গুনী

যদি কোনোদিন ফাল্গুনী হাওয়া লেগে
অস্ফুট রাঙা মুকুলের ঘুম ভাঙে,
মদির পীড়নে যদি ওঠো তুমি জেগে
রাঙা অধরের পরশে অধর রাঙে।

ঢেকো না চিকুরে চকিত সরমখানি
জেবলে রেখো দুটি চোখের দীপ্তশিখা
মনোরথে মন কামনার সন্ধানী
রেখো সচেতন স্বপ্নের নীহারিকা।

অনুরাগে যদি না ফোটে মনের কথা
শুধু চেয়ে-থাকা রাতের অন্ধকারে
বাহুপাশে শত স্বর্গের নিবিড়তা
জাগায়ো প্রেমের প্রগল্‌ভ ঝংকারে।

প্রমত্ত প্রেম-সাধনার বেদিতলে
রূপ থেকে রূপে অমরী দীপান্বিতা,
মেখলায় জানি সমুদ্র-শিখা জবলে
তাই তুমি মোর জীবনে অনিন্দিতা।

আকাশ তোমায় পারেনি জড়াতে বুকে
পৃথিবী পারেনি সাজাতে বাসরঘর
দূর থেকে সাতসমুদ্র নতমুখে
পিছু হটে গিয়ে তুলেছে ক্ষুব্ধ ঝড়।

অথচ রাতের মদালস বন্ধনে
হে আমার প্রেম যখনি দিয়েছ ধরা
রাঙা-অধরের নিবিড় নিষ্পেষণে
কাব্যের বীণা বেজেছে সপ্তস্বরা।

১৪ই জানুয়ারী ১৯৪২

নবীনতা

হাজার রূপের আকাঙ্ক্ষাঘেরা প্রেম আমার!
জীবনের পথে এতটুকু সাধ নেই থামার।
হৃদয়ের শতসূর্যের তাপ
রাঙালাবণ্যে মুক্তাকলাপ
তোমারি কথার বিনিসূতো দিয়ে মালা গাঁথার,
তারা হয়ে তুমি ফুটে ওঠো সারারাত আলোকরা নীল-পাথার।

স্বপ্ন-দেখার কত যে আঁধার
বিজয়ী রক্তদীপ জ্বালাবার
কাছে এসে দূরে ছুটে পালাবার জটিলতায়
তুমি শুধু শিখা জেলে দিতে পারো বাধা দিতে পারো বাহুলতায় ॥

একটি আধারে স্বপ্ন হাজার
সূর্যের মালা গেঁথে পরাবার
জ্বলন্ত প্রেম রাঙাকামনার সজীবতায়,
কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি-কাঁপানো চুম্বন তুমি নবীনতায় ॥

১৭ই অক্টোবর ১৯৩৭

আশ্লেষ

চাঁদ ওঠে পেঁচা ডাকে চঞ্চল স্বরে
পুরোনো পাতারা ঝরে যায় বুনো-হাওয়ায়।
সমুদ্রে ঝড় ঢেউ খেয়ে খেয়ে মরে
সৈকতে বসে সুখ নেই গান গাওয়ায় ॥

যখনি হৃদয়ে বাঁধো তুমি আশ্লেষে
ঢেউগুলি দেয় উল্লাসে করতালি।
চাঁদের মিছিল সাগরের জলে ভেসে
কাব্যে জাগায় তুমি যেন্ চৈতালী ॥

বনচূড়াগুলি রূপালী আভায় জ্বলে
মৃদু মর্মরে স্বপ্নেরা কথা কয়।
ঠোঁটে ঠোঁট রাখা তপ্ত বাহুর তলে
কমনীয় দু'টি বুক কাঁপে মনোময় ॥

মদির মাটির মহিমার গান গেয়ে
তোমাতে আমাতে সাজাই বাসরঘর।
না-পাওয়া হৃদয় বাহুতে স্বর্গ পেয়ে
সাগরে ভাসাই সুখের নৌবহর ॥

২১শে অক্টোবর ১৯৩৭

শুভলগ্ন

তোমার যদি হঠাৎ পেতুম দেখা
পথ-হারানো গোলকধাঁধার বুকে
সত্যি ক'রে বলছি মনের কথা
পলক-পড়া বন্ধ হতো চোখের।

তেপান্তরে ঘুলিয়ে যেতো মাথা
খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ-দেখার মানে
ছন্দ-পতন ঘটতো প্রেমের ছড়ায়
বলতে গিয়ে পথ-দেখানোর কথা!

সেদিন যদি পথ হারিয়ে যেতে
যেদিন ছিল অবাক-হাওয়ার বয়েস
ভুল-ঠিকানায় দিতুম জেনো পাড়ি
তোমায় নিয়ে পথ-দেখানোর পথে।

ঘরের টানে ফেরার কথা ভুলে
কাঁপতো বুকে প্রথম দেখার মায়া
সোনার চেয়ে হাজার গুণে দামী
অবাক-চোখে তোমায় কাছে পাওয়া।

হিসেব ক'রে হয় কি উধাও মন?
পথের সীমা যায় না খুঁজে পাওয়া
রক্তে যখন জোয়ার আসে বুকে
তোমার আঁচল কাঁপায় চাঁদের হাওয়া।

সেদিন যদি অচিন আকাশ থেকে
আসতো শুভলগ্ন তোমায় পাওয়ার,
তারায় তারায় জ্বলতো হাজার মাণিক
অবাক হয়ে চারটি চোখে চাওয়ার।

২৭শে অক্টোবর ১৯৩৬

অ-ধরা

ঘুমুলে তোমায় কী যে সুন্দর দেখায়!
সোনার অঙ্গে কাঁপে যৌবন প্রতিটি রেখায় রেখায়।
অগোছালো শাড়ী মাথায় বিনুনী ভাঙা
বাসনার রঙে রাঙা
বালিশে ছড়ানো কালোচুলে ঘেরা ঘুমন্ত মুখখানি।

সারা আকাশের তারা পড়ে নুয়ে
ব্যাকুল বাতাস তনু যায় ছুঁয়ে
মদির আবেশে বিহ্বল চাঁদ সারারাত জেগে থাকে,
অলস ফাগুন হাওয়ায়
বৌ-কথা-কও পাখিটা হঠাৎ ডাকে॥

শাল মহুয়ার মধুঝরা বায়ু
নবফাগুনের চঞ্চল আয়ু
তোমার মদির নিঃশ্বাসে বহে যায়।
রাঙা-বাসনায় চাঁদের চুমায়
স্বপ্ন-বিভোরা তনুটি ঘুমায়, অপলকে চেয়ে থাকি
সময়ের ঢেউ দোলা দিয়ে যায়, ডাকে রাতজাগা পাখি।

চোখের পাতায় মৃদুকম্পিত রক্তিম আকুলতা,
ভীরু-পাপড়ির আড়ালে যুগল-ভ্রমর
বেঁধেছে স্বপ্ন-পদ্মে আপন ঘর।
ঘরে জ্বলে নীল আলো
সোনার অঙ্গ কেঁপে কেঁপে ওঠে অপরূপ শিহরণে,
তবু কাছে যেতে কী গভীর মায়া
পাছে ও-তনুতে পড়ে কালোছায়া
বাঁধভাঙা রাঙা-অধরের পরশনে।
যৌবন-মায়া-মৃণালে তোমার ঘুমের পদ্ম ফোটে,
এলোমেলো সুর অলস ছন্দ
কোমল পাপড়ি অমল গন্ধ
তুমি কাছে তবু কাব্য-কাননে কস্তুরীমৃগ ছোটে।

হৃদয়ে আমার শুভ্র নিথর জ্বলে ক্লামনার শিখা
ছন্দায়মান সৃষ্টির নীহারিকা!
নিভৃত নীরব প্রেম ওঠে জেগে
মর্ম-ফুলের সৌরভ লেগে
ছোটঘরখানি অধীর আবেগে কাঁপে!
ঘুমাও ঘুমাও জাগাবো না মিছে সৃষ্টির উত্তাপে।

রিম্‌ঝিম্‌রিম্‌ ঝিঁঝি-ডাকা রাত সম্ভ্রম জাগে মনে,
তোমার শয়ন এলোমেলো তবু স্বপ্নের উপবনে
উরসে বিবশ ভুজবল্লরী সুপ্তির বেদনায়
ঈষৎ চমকে বিধুর পুলকে সন্ধানী বাসনায়।
অন্তরে মোর রূপের পিয়াসী
জাগে অকারণ অলস উদাসী
আকুল অধীর প্রতীক্ষা নিয়ে উন্মুখ কামনায়।

শিয়রে তোমার জেগে থাকি একা সুখের লাল-কমল,
বিবশ অঙ্গে শিহরায় তব অঙ্গের পরিমল!
জ্যোৎস্না-জড়ানো ফাল্গুন জাগে আমার কাব্য ঘিরে
ঘুমাও ঘুমাও অধরা স্বপ্নে
বাসন্তিকার বাসরলগ্নে
যৌবন-নদীতীরে॥

৭ই মার্চ ১৯৩৫

বিভাসা

তুমি বলেছিলে আসবে সবাই ঘুমালে
প্রাণপদ্মের মৃণালে।
তুমি বলেছিলে চাঁদ ডুবে গেলে
শেষ-রজনীতে সংসার ফেলে
নীলজ্যোৎস্নায় হংসমিথুন অলসপক্ষ ভাসালে,
তুমি বলেছিলে আসবে আকাশ ঘুমালে।

তোমার তনুতে মহাপৃথিবীর আদিমছন্দ জাগায়ে
আঁখিতে কাজল লাগায়ে,
যে মায়াকাজলে অন্তরতলে
সহস্রশিখা মায়াদীপ জ্বলে
প্রেমের সুপ্তিলোকে
রেখায় রেখায় শরীরী-স্বপ্ন কামনার নির্মোকে।
তুমি বলেছিলে সংসার ফেলে
শেষ রজনীতে চাঁদ ডুবে গেলে
চির-প্রত্যাশা মেটাবে আমার নির্জন অভিসারে
তুমি বলেছিলে আসবেই চুপিসাড়ে।

রাত কেটে গেল তবুও এলে না তুমি
কাকজ্যোৎস্নায় মূর্চ্ছিত তাই বিবশ স্বপ্নভূমি।
ভোবেব আলোয় শ্যাম-আঙিনায় ধূসর কুয়াসাঘেরা
শেষ-অঘ্রাণ হাই তোলে ঘুম ভেঙে
তোমার ললাটে চন্দনলেখা মুছে গেছে চুম্বনে।
পূবের জানালা ধরে
তুমি চেয়ে আছো দিগন্ত পানে,
প্রবাল-শৈল শিরে
মহাপৃথিবীর প্রাণ-স্পন্দন কাঁপে,
তুমি এসে ঘুম ভাঙালে আমার
সুদীর্ঘতম প্রেম-সাধনার শেষে,
প্রাণপদ্মের স্বর্ণ-মৃণালে জ্বালালে সৌরশিখা
তুমি নও প্রিয়ে স্বপ্নের মরীচিকা।

১৭ই বৈশাখ ১৩৪৩

জয়মতী

আপন ভাগ্য জয় কোরে তুমি আসবে
ভালো যদি লাগে স্বেচ্ছায় ভালোবাসবে
প্রবল প্রাণের সম্ভ্রমবোধে
হবে না স্বেচ্ছাচারিণী;
অন্ধকারের বুকচেরা বাঁশী বাজানো
সুরের শিখায় সারি সারি দীপ সাজানো
অমাজয়ী রাঙা-যুগাবর্তের
তুমি হবে মনোহারিণী।

ভালো যাকে বাসে সে যদি না বাসে ভালো
নতুন প্রদীপে আবার জ্বালাবে আলো
বিচ্ছেদ হবে চিরবরণীয়
বাসনার সংঘাতে!
ক্ষণ-বিরহের উদারা মুদারা তারা
থেমে যাবে ঢেউ সুনীল শূন্যে হারা
কামনার পটে জলছবি যত
মুছে দেবে দুই হাতে।

নবাগত প্রেম হৃদয়-সুরবাহারে
বিনিদ্র রাতে যৌবন-ঝংকারে
সহকার শাখে চ্যুতমঞ্জরী
জাগাবে মদির সুখে;
সুরেলা মনের সংহত অভিসার
অপলক চোখে বসন্ত-বাসনার
আকুল আবেশে কাছে টেনে নেবে
বিজয়ী আগন্তুকে।

আপন ভাগ্য জয় কোরে জয়মতী
পৃথিবীর বুকে আনবে অমরাবতী
পশুতে মানুষে বিরোধের শেষ
রাত্রির অবসানে;
আয়ত বিশাল কাজল-চোখের চাওয়া
যে দিকে মেলবে মিটে যাবে সব পাওয়া
কুলহারা প্রেম-সমুদ্র বুকে
কল-কল্লোল গানে।

১৭ই মে ১৯৫৫

॥ বৈশাখ ॥

বৈশাখী ঝড় দেয়ালে দেয়ালে হুমড়ি খেয়েও ছোটে
কার্ণিশে মাথা ঠোকে বেসামাল আকাশের বাঁধভাঙা
এলোমেলো হাওয়া চঞ্চল মেঘ-মল্লার কাঁপে ঠোঁটে
চিলে-কোঠা ছাদে লঘু সংঘাতে হৃদয়ের ছবি রাঙা।

বেহিসাবী তালে সঙ্গত চলে বজ্রের পাখোয়াজে
নতুন বছর সিংহের মত সোনালী কেশর-ফোলা
ধ্রুপদী ঢঙের গর্জনে মেঘ প্রতিধ্বনিতে বাজে
শতপাকে বাঁধা মহাজীবনের জটিল গ্রন্থি খোলা।

হৃদয়ে স্তব্ধ সমুদ্রে ঢেউ প্রলয়ের নীলপাখি
বিশাল সহরে প্রাসাদের চূড়া ভেঙে আর বাসা বাঁধে
ডানার ঝাপটে উড়ে যায় লঘু-বাসনার যত ফাঁকি
থাকে না মনের স্বপ্নজড়িমা মমতায় সুর সাধে।

বৃষ্টি এখনো ঝরেনি বাতাসে বর্ষার মাদকতা
জাগেনি স্নিগ্ধ বনরাজিনীলা দিগন্তে রামধনু,
পাথরে লোহায় মাথা ঠোকে ঝড় নিভৃতে সাজাই কথা
মৌসুমী-মেঘে বিজলীশিখার চপলা তন্বীতনু।

কাল-মহাকাল আবহতত্ত্বে ঘড়ির কাঁটায় চলে
বৈশাখী হাওয়া বাঁধানো সড়কে সংকোচে বুকে হাঁটে
ঝড়ের ঝাপট স্তম্ভিত মহানগরীর পদতলে,
তাণ্ডবী সুরে উদ্দাম মনোবাসনার দিন কাটে।

॥ জ্যৈষ্ঠ ॥

স্তম্ভিত নীল শূন্যে হঠাৎ মেঘ
শ্বাসরোধী জ্বালা ক্ষুব্ধ শরীরে মনে
নিঝুম বাতাসে থমথমে উদ্বেগ
একটিও পাতা নড়ে না সবুজ বনে।

ঘুম নেই ঘামে ভিজে যায় গোটা রাত্রি
জেগে-থাকা বুকে স্বপ্নের দল হায়না
তিমিরগর্ভ জ্যৈষ্ঠের অমাধাত্রী
স্বচ্ছ-আকাশে রূপে খুঁজে তা'র পায় না।

কপিলের গুহা সংসারে অভিশপ্ত
জীয়ন্তে ছাই জনতা সগর-সন্তান
প্রচণ্ড তাপে আকাশের তামা তপ্ত
ভগীরথ নেই সুদূরে মুক্তি সন্ধান।

জমাট গরমে পচ্ ধরা আম কাঁটালে
নীল মাছিদের প্রাণান্তকর গুঞ্জন
মজাপুকুরের মড়কের জল ঘাঁটালে
সুলভ-স্বর্গে অক্ষয় সুখভুঞ্জন।

মাঝে মাঝে বুনোমোষেরা লাফায় আকাশে
চোখে বিদ্যুৎ ক্ষুরে ক্ষুরে জ্বলে মেঘ
একটিও পাতা ভেজে না সজল বাতাসে
গুমোট প্রাণের থমথমে উদ্বেগ।

॥ আষাঢ় ॥

তুমি এলে প্রাণ বাঁচে রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্।
আঁধারে মাণিক জ্বলে কাঁপে রাঙাপিদ্দিম॥
রক্ত-সবুজশিখা জোনাকির, তুমি এলে।
গ্রামপথে ঝংকৃত ঝিল্লির ছায়া ফেলে॥

রাত্রির করুণায় নিকষ নিবিড় মায়া।
প্রাণ বাঁচে মেটে বুঝি গ্রীষ্মের অশনায়া॥
মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ গুরু গুরু গর্জনে।
ছড়ায় ভোরের আলো প্রভাতী দিগঙ্গনে॥

বীজবোনা মাঠে মনোময়ূরীর নীলপাখা।
তুমি এলে রিম্ ঝিম্ সোনায় সবুজে আঁকা॥
শস্যের সফলতা ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী।
পালক কাঁপায় নিশিগন্ধার রেণু মাখি॥

আউসের ক্ষেতভরা শ্যামল সবুজ মায়া।
তুমি এলে স্বচ্ছল আষাঢ়ের গান-গাওয়া॥
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ হাসির হীরক জ্বলে।
ঝিরি ঝিরি ঝুরু ঝুরু কদম্ব বনতলে॥

মেঘডাকা আকাশের আনন্দে শিখীনাচে।
নবধারাবর্ষণে তুমি এলে প্রাণ বাঁচে॥

॥ শ্রাবণ ॥

বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনম্
ঘোরঘনমেঘে এলো শ্রাবণ।
উতল সিন্ধু-হিন্দোলে বুঝি
আদিগঙ্গায় এলো প্লাবন॥

পর্জন্যের অন্নে প্রাণ
বাঁচে যদি ঘোচে অসম্মান।
জীবনশস্য মাঠে মাঠে খুঁজি'
হাঁটুজল ভেঙে খাটে কৃষাণ॥

টইটুম্বুর দিঘি ভরা
শাঙনমেঘের জলঝরা
শূন্য-কুটির দীপনেভা ঘরে
যক্ষবধূর মন মরা॥

অভিসারে দুঃসাহসিকা
বিধুরা প্রোষিতভর্তৃকা
চকিত-চরণ বনমর্মরে
সংকেতে প্রিয়রঞ্জিকা॥

কজ্জল-মেঘ-নির্ঝরে
স্বচ্ছনিটোল জল ঝরে
সুর-নটিনীর বাজে মঞ্জীর
ঝম্ ঝম্ পথে প্রান্তরে॥

॥ ভাদ্র ॥

মনের আকাশ রুদ্ধ নিশাস্ মুক্তির পথ নেই জানা
হিম সিম্ খায় গুমোট পৃথিবী গোলা-বারুদের কারখানা।
ঘনতালীবন-বেষ্টিতমায়া কেল্লার মাঠে নেই কোথাও
গঙ্গায় তবু রূপো ঝলমল চলে ইলিশের জালটানা॥

কূল থেকে কূলে যাওয়া আসা করি সূর্যাস্তের রাঙামেঘে
পথহারা বক পিপাসা মেটায় ঢেউয়ের চূড়ায় ডানা রেখে।
জলভরা নদী আকুল বাসনা দূরে সমুদ্রে ছোটে উধাও
ময়ূরপঙ্খী কল্পনা আজো নোঙর ফ্যালেনি ডাঙা দেখে॥

আকাশ চোঁয়ানো বৃষ্টিতে ভিজি ভিজে শরীরেও ঘাম ঝরে
শূন্য কুটিরে আসে না তো কেউ ফুলেভরাসাজি বাম করে।
মৈথিলী মন 'ই ভরা বাদরে' বৃথা বলে প্রেমতরী ভাসাও
হঠাৎ কণ্ঠে সুর কেটে যায় কে যেন কোথায় নাম করে॥

মেঘভাঙা রাঙা-রোদ্দুরে মন নাচে খঞ্জন ফুলশাখী
যাদের কাব্যে আমরা তাদের হারানো পথের ধুলোমাখি।
শুভ্রকাশের ঝিলমিল সুরে মন বলে আজ সুর মেলাও
এ যুগের প্রেমে কোনোমতে চলে বিদ্যাপতির তুলনা কি ?

॥ আশ্বিন ॥

ইন্দ্রনীল শূন্যে কাঁপে সোনালী আকাশ সোনার দিন
তোমার কথাই ভেবেছি তুমি আসবে-ব'লে জীবনে আজ।
কত যে ধুলো-ওড়ানো জল-ঝরানো ব্যথা বিরামহীন
সয়েছি তুমি এসেছ ব'লে হঠাৎ যেন বেড়েছে কাজ॥

ধোঁয়ায় কালো কান্নাভরা ভাদ্র গেছে ঘোলাটে রাত
দুকুল ছাপা গঙ্গাজলে দিয়েছি তা'কে বিসর্জন।
কাজল মেঘের দুর্গ ভেঙে বাড়িয়ে দিলে সোনার হাত
শেকল-ছেঁড়া শুভ্রমেঘের তাইতো লঘু-সঞ্চরণ॥

কাঁদছে বোবা অতীত প্রেম এসেছে আলো দুর্নিবার
এসেছে একী বিহ্বলতা এখনো চোখে জড়ানো ঘুম।
সামনে দেখে সোনার খনি থেমেছে বুকে কান্না তা'র
তোমায় দেখে গোপনে বুঝি ফুটেছে বুকে বন-কুসুম॥

অপরাজিতা-করবী-কাশ-ছাতিমছায়া শারদনীল
মনের ময়ূরাক্ষীতটে শিউলী-ঝরা প্রাণোল্লাস।
বলাকা-মেঘে আকাশে ডানা কাঁপায় রাঙা শঙ্খচিল
নীবার-শালি-শস্যেভরা প্রাণ-জাগানো মাঠের চাষ॥

মাটিতে কোটি পদধ্বনি আকাশে বাজে লক্ষ শাঁখ
জীবন-সাগর বাজায় কাঁসর শক্তিপূজার ঘণ্টাতে।
এবার হবে অসুর [illegible] ঘোচাবে তুমি দুর্বিপাক
সোনালী নীল-স্বর্গজয়ের দশটি হাতের সংঘাতে॥

॥ কার্তিক ॥

মন যেন এক কুয়াশায় ঢাকা নদী
তটরেখাহীন নিস্তল নিরবধি
গাছপালাঘেরা কোজাগরী পূর্ণিমা
নিঝুম নিথর দুর্বোধ বনমর্মর ভঙ্গিমা।

অন্ধকারের উদ্বেল আত্মায়
শিশিরের মোতি মরকত জ্বলে রূপালী কৃত্তিকায়
দূর আকাশের ধূসর শূন্যপটে
মুক্তির পথ খোঁজে পৃথিবীতে কুয়াশার সংকটে।

ভুলে যাই তুমি ঢেকেছ আমার মন
কী যে দুঃসহ নিভৃত নিষ্ক্রমণ!
হিমঝরা এই রাতের কুয়াশা থেকে
অন্তঃসলিলা ফল্গুর ঘুম ভাঙেনাকো ডেকে ডেকে।

ভোর আসে যেন ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে মুখ
সূর্যোদয়ের পথ চেয়ে চেয়ে উদাসীন উন্মুখ
মেঘলেশহীন ভিজে আকাশের বোঝা
বুকে নিয়ে তা'র অবিরাম রাঙারোদের কিরণ খোঁজা।

কার্তিক তুমি আসোনি ময়ূরে চড়ে
তোমার আকাশে কুয়াশায় ভিজে অলস কাকেরা ওড়ে
পাকা শালিধান বুলবুলি খেয়ে যায়
মেঠোচাষীদের বুকফাটা যাতনায়।

॥ অগ্রহায়ণ ॥

কুণ্ঠিত কোরে কেন মুখ ঢাকো কুয়াশার আবরণে?
তুমি হায়ণের অগ্রগামিনী মায়া!
কনকধান্য ভরে দাও ভূমিলক্ষ্মীর অঙ্গনে
তবু কুণ্ঠায় কেন মুখ ঢাকো কুয়াশার আবরণে?
নিশ্চল-গিরিচূড়ায় বন্দী করেছ দিগ্বারণে
সংহত হিমশৃঙ্গচারিণী ছায়া।

পিঙ্গল হেমরৌদ্রে ধূমল নীল-অরণ্যশাখা
নির্জীব কেন নিষ্প্রাণ গীতরিক্ত?
পৃথিবী তোমার পুঞ্জ পুঞ্জ অশ্রুবাষ্পে ঢাকা
স্তম্ভিত হেমরৌদ্রে ধূমল নীল-অরণ্যশাখা
দিক্-দিগন্তে পীতপাণ্ডুর ঢেকেছ অঙ্গরাখা
নির্বাক নীলরাত্রি শিশিরসিক্ত!

তুমি ছিলে নববর্ষরূপিনী বিস্মৃত ইতিহাসে
অমিতশস্যপালিনী কুজ্ঝটিকা!
দাক্ষিণ্যের করুণায় ভূমিগর্ভের অভিলাষে
অন্নপূর্ণা রূপ ধরেছিলে বিস্মৃত ইতিহাসে
আজ কেন এলে পাণ্ডুচাঁদের নিষ্ঠুর পরিহাসে
কুয়াশায় জেগে ক্রূর হেমন্ত-শিখা ?

॥ পৌষ ॥

এখনো গাছের হু হু রিক্তশাখা
শুকনো হাওয়ায় তোলে অট্টহাসি!
জমাট-বরফ মরামাটির বুকে
জীবন হারায় লঘু স্বপ্নরাশি॥

উদীচী-পথের রাজহংস তবু
কাঁপায় মুক্তডানা তুষার-ঝড়ে।
খরবেগে ছোটে হিমবন্যাধারা
বিপুল কাঁপনে গিরিশৃঙ্গ নড়ে॥

মৃত্যু-শীতল হাড়কাঁপানো হাওয়া
হু হু বয় ধানকাটা শূন্যমাঠে।
রসলোভে খেজুরের শুকনো গলা
শিউলীরা ভাঁড় বেঁধে হেঁসোয় কাটে॥

নবান্ন ঘরে ঘরে তবু হতাশায়
ডোঙাপেট ক্ষেতচাষী ভুখায় মরে।
মড়কের সন্ধানী লুব্ধ শকুন
ওড়ে নীল ঘননীল নীলাম্বরে॥

দুকূলে গঙ্গাধারা শীতজর্জর
পড়েনি সোনার পলি বন্যাজলে।
রিক্তশাখায় কাঁপে বনস্পতি
ক্রান্তি-বলয়ে হিমসূর্য জ্বলে॥

॥ মাঘ ॥

তুমি কি আমার প্রেমের উত্তরায়ণে
তীব্র নিখাদে বাজালে সুরের বীণা ?
হিমবন্যার মদির তপ্ত গাহনে
স্বাধিকারে হ'লে নিভৃতে অঙ্কলীনা।

যৌবনদূতী তুমি এলে নিশিগন্ধায়
জড়ালে শীতল সুরভিস্নিগ্ধ বাহুতে
তুহিন চাঁদের জ্যোৎস্নার মধুছন্দায়
যে চাঁদের কণা স্পর্শ করেনি রাহুতে।

তুমি সেই চাঁদ এনেছ অমৃত-চুম্বন
তুষার-কিরীটী পর্বতচূড়া লঙ্ঘি'।
শুরু হ'ল নবমুকুলে ভ্রমর গুঞ্জন
রসপিপাসিত-পঞ্চশরের সঙ্গী॥

পাহাড়ে পাহাড়ে তুষারশৃঙ্গচারিণী
তুমি আর নও স্তিমিত শীতল-সংগা!
সিন্ধুর ধ্যানে চঞ্চলা দুর্বারিণী
কান পেতে শুনি শরীরে তোমার গঙ্গা!

জীর্ণশাখায় জাগালে সরস বাসনা
কুন্দ-মালতী সাড়া দেয় বুঝি আভাষে?
মানসতীর্থে শুভ্র মরাল-আসনা
শোনাও পরজ্-বসন্তে সুর আকাশে॥

॥ ফাল্গুন ॥

মৃত্যুপুরীর হিমতোরণের
খিলান-ফাটানো উত্তরণের
ইন্দ্রধনুতে অতনু-আকাশ ঢেকে।
প্রতীকী-প্রাণের প্রতিমায় গড়া
শিরে শিখীপাখা গলে পীতধড়া
এলে তুমি চোখে দলিতাঞ্জন এঁকে॥

ময়দানে দেখি পলাশের ভিড়ে
কুহু ডেকে-ওঠা বায়সের নীড়ে
নীলপটে আঁকা কৃষ্ণচূড়ার শাখা।
মৃত্যু হঠাৎ চোখ মেলে দ্যাখে
মরাঘাসে ফুল ফোটে একে একে
হলদে চাঁদের মণ্ডলে কাঁপে রাকা॥

সেতু বেঁধে দিলে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে
বিজয়ী প্রেমের আকাশে মাটিতে
রাঙাপলাশের পাপড়ি-কাঁপানো হাওয়া।
অশোকের শোক রাঙারঙে ধুয়ে
কম্পিত কাঁচ-কিশলয় ছুঁয়ে
মেটালে বনের সুরভিত চাওয়া-পাওয়া॥

সহরের কলকোলাহলে তুমি
উৎসবে নবযৌবনভূমি
রাঙালে রক্ত-কিংশুকে রাঙাফাগে।
প্রেম-যমুনার বাঁশীতে তোমার
মূর্ছনা তুলে বাজালে বাহার
নব-বসন্তে ফাল্গুনী অনুরাগে ॥

॥ চৈত্র ॥

হাহাকার এল আকাশে
রুক্ষ বাউল-বাতাসে
একতারা হাতে ক্ষ্যাপা বসন্ত
পাতাঝরা-পথ বেয়ে
গাজনের গান গেয়ে
ভ্রূক্ষেপ নেই কে কোথায় মরে বাঁচে।
পৈশাচী-প্রেমে চৈতালী-হাওয়া ঘুরে ঘুরে ওড়ে শূন্যে,
সজনের ডালে দাঁড়কাক ডাকে মারী-মড়কের পুণ্যে ॥

বেঘোর ঘূর্ণীপাকে
ভুখা সন্ন্যাসী হাঁকে
চড়কের বৃষকাষ্ঠ-দোলায় দুলে।
আমের মুকুল-ঝরা
আসে দুরন্ত খরা
মৌমাছি আর ওড়েনাকো ফুলে ফুলে।
ভিখারী-আকাশ চৈতীচাঁদের চিতায় জ্যোৎস্না জ্বলে,
তারার ফুলকি আগুনের কণা ছড়ায় নীলাঞ্চলে ॥

যৌবন তবু আসে
দুরন্ত অভিলাষে
সৃষ্টির মহারক্তপদ্মাসনে।
পৃথিবী যে প্রেমময়ী
যুগে যুগে জরাজয়ী
পঞ্চশরের অতনু আলিঙ্গনে ॥
বন-মর্মরে স্বপ্নচারিণী শিহরায় মায়ামন্ত্রে।
বাউল-প্রেমের মূর্ছনা কাঁপে চৈতালী গোপীযন্ত্রে ॥

৫ই এপ্রিল্ ১৯৫৫

রেখা

কাকেরা উড়ে যায় আকাশে আলো-ছায়া
সূর্য উদাসীন।
বিলীন বন-মায়া ঝিল্লি ঝংকারে
বিবাগী বালুচর॥
ওপারে পলাতক পাখিরা উড়ে যায়
সচল মসীরেখা।
বিজন মেটোপথ ধূসর লোকালয়ে
মিশেছে আঁকাবাঁকা॥

৮ই মে ১৯৩০

ছবি

নিঝুম রোদ ঝিমোয় মাঠ চুপ কোরে।
দিঘির পাড় কী নিঃসাড় বসলো বক ঝুপ কোরে'॥
মাথায় নীল আকাশ তা'র তুলির টান দিগন্ত।
পশ্চিমের সূর্য ম্লান দিনের ঝাঁঝ নিভন্ত॥
ক্লান্তি নেই শান্ত বক দাঁড়িয়ে ঠায় একপায়ে।
শুনছে কা'র বাঁশীর সুর বাজছে কোন দূর গাঁয়ে॥
লালশালুর পাপড়িতে বাতাস দেয় হালকা দোল।
কাঁপছে ঢেউ তাকায় বক মৌমাছির মন বিভোল॥
সূর্য যেই ডুবলো বক উড়লো লালমেঘ দেখে।
হাজার বক ফুল ফোটায় শূন্যে তা'র পথ এ'কে॥

২১শে এপ্রিল ১৯৫৫

শালিখছানা ও সূর্য

ছোট্ট একটা শালিখ পাখির ছানা
উড়ে যা'বার শক্তি নেইকো যা'র,
পালক ভরা গজায়নিকো ডানা
জগৎটাকে ভাবছে চমৎকার!
জঙ্গলে তা'র মায়ের বাসায় শুয়ে
তা'র কাছেও সূর্য আসে নুয়ে॥

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

পল্লী-বাংলা

ধানের ক্ষেতে চখাচখী নদীর ঘাটে বৌ।
মৌমাছিদের মৌচাকেতে মিষ্টিফুলের মৌ॥
বটের ডালে বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর প্রেমে।
যে গান শোনায় মাটির বুকে স্বর্গ আসে নেমে॥
সে গান শুনে রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশের বাঁশী।
বিজন পথে টোল খেয়ে যায় রাধার গালে হাসি॥
রঙ খেলে যায় শরম-রাঙা বৃন্দাবনী সুরে।
শিউরে ওঠে ঘোমটা-টানা গঙ্গাজলী ডুরে॥
মেঘের মাদল বাজলে নাচে চাঁপার বনে শিখী।
পেখম-তোলা বেগুনী সবুজ সোনার ঝিকিমিকি॥
চপল শিশুর ছুটোছুটি ক্ষেতের আলে আলে।
শ্যামল বরণ ব্রজের রাখাল বংশে বাতি জ্বালে॥
নাতির নাতি দাদুর দাদু রঙ্গে ওঠে মেতে।
সোনার মাটি কথার যাদু কুড়োয় আঁচল পেতে॥
পদ্ম আঁকা আল্পনাতে লক্ষ্মীমায়ের পা।
ক্ষেত খামারের ফসল বাড়ায় গোলায় ভরে গাঁ॥
এই তো সোনার বাংলা আমার এই তো আমার দেশ।
এই তো আমার শান্তিময়ীর নিত্যকালের বেশ॥

১১ই নভেম্বর ১৯৩৪

চিরন্তনী

ঠাকুরদা গো ঠাকুরদাদা!
তোমার ছেলে আমার বাবা,
তোমার বাবা আমার বাবার
ঠাকুরদা!
বীজের মধ্যে বৃক্ষ আছেন বৃক্ষে আছেন বীজ;
লক্ষ রূপে রূপান্তরে অমর মনসিজ॥

দিদিমা গো দিদিমা
তোমার মেয়ে আমার মা
তোমার মা যে আমার মায়ের
দিদিমা!
একের মধ্যে দুয়ের লীলা দুয়ের মধ্যে এক।
ওরে অবুঝ মন জগতের রহস্যটা দ্যাখ॥

১৮ই ফাল্গুন ১৩৪৩

শীতের রাত্তিরে র‍্যাপার চোর

আমাদের বাড়ী   চোর এসেছিল   কাল রাতে
সারা গায়ে তেলমাখা
অঘ্রান মাস   কনকনে শীত   রাত দুপুর
আকাশ কুয়াশাঢাকা ॥

ঘরের কিছুই   নেয়নিকো চোর   চুপিসাড়ে
খিড়কির দোর খুলে।
শুধু পিসিমার   গরম সবুজ   র‍্যাপারটা
সবে নিয়েছিল তুলে ॥

ভাঙা জানলাটা   নড়ে উঠেছিল   খুট্ কোরে
চারিদিক নিঃঝুম।
ভয় পেয়ে বুড়ি   পিসিমা চেঁচালো   ডাক ছেড়ে
ভেঙে গেল সব ঘুম ॥

তেল মাখা গায়ে   ধরা পড়ে গেল   বেচারা চোর
তাকালো করুণ ভাবে।
বললে, "ঘরেতে   রোগা ছেলেটার   ভীষণ জ্বর
কাঁপুনিতে মরে যাবে ॥

"ঘরে কিছু নেই   চাপা দেবো গায়ে   তাই ভেবে
ঠিক ছিলনাকো মাথা।
চাইলে তো কেউ   দেবেনা র‍্যাপার   এই শীতে
মিছে জানি হাত পাতা ॥

পুলিশের হাতে   দিতে হয় যদি   এখুনি দিন
ছেলেটা মরবে জানি।"
পিসিমার দুটি   পায়ে ধ'রে চোর   কেঁদে বলে,
"মাপ করো ঠাকুরাণি ॥"

পিসিমা বললে,   "র‍্যাপারটা নিয়ে   এখুনি যা'
আগে বাঁচা ছেলেটাকে।"
বুড়ী পিসিমার   দু'চোখে গড়ায়   শান্তি জল
অঞ্চলে মুখ ঢাকে ॥

১৭ই নভেম্বর ১৯২৯

সেই কাকটা

কালো কুৎসিত কাকটা আমার পড়ার ঘরের জানলায় বসে থাকে,
মাঝে মাঝে ঘাড় বাঁকায় কখনো কক্ কক্ ক'রে ডাকে।
কুচ কুচে কালো পালকের রঙ তারো চেয়ে কালো ছুরির মতন ঠোঁট,
কেউ তার কোনো ক্ষতি করলেই নিমগাছটাতে সভা ডেকে বাঁধে জোট।
ভীষণ চালাক সহরের কাক সব দেখে, সব বোঝে!
দোকানে বাজারে ঘর সংসারে সব কিছু থাকে ওদের সজাগ খোঁজে।
সূর্য ওঠার বহু আগে ওরা টের পায় পূব-আকাশে ফটিক-আলো,
ওদের মতন জ্ঞানবান পাখি কোনোখানে নেই রঙটা যদিও কালো।
দল বেঁধে ওড়ে ভোরের বেলায় যে যার এলাকা ভাগ করা ঠিকই আছে,
সন্ধ্যায় ফের দল বেঁধে ফেরে বাসায় ওদের সামনের নিমগাছে।

দুপুরে যখন ভাত খেতে বসি প্রত্যহ সেই প্রবীণ বিজ্ঞ কাক,
আমার ঘরের জান্‌লাতে বসে মাথা নেড়ে নেড়ে মাঝে মাঝে দেয় ডাক।
খাওয়া শেষ হ'লে এক মুঠো ভাত এঁটো কাঁটা দিয়ে মেখে,—
খেতে দিই ওকে খুশির সঙ্গে আয় আয় বলে মহাসমাদরে ডেকে;
প্রায় ছ'টা মাস ভাত দিতে দিতে কাকটার সাথে হয়ে গেল সখ্যতা,
একটুও দেরি হ'তো না বুঝতে কালো কুৎসিত পাখিটার সব কথা।
অসুখে বিসুখে যখনি আমার বন্ধ থাকতো কিছুদিন ভাত খাওয়া,
আহা কী করুণ মনে হ'তো যেন সেই কাকটার ফ্যাল ফ্যাল করে চাওয়া!
কালাচাঁদ বলে' ডাকতুম তা'কে কক্ কক্ ক'রে দিতো সে আমায় সাড়া,
ভাড়াটে বাড়ীটা ছেড়ে এসে আজো কাকটার স্মৃতি দিয়ে যায় বুকে নাড়া।

১১ই জানুয়ারী ১৯২৯

আত্ম-ভাষণ

মনে মনে অনেক ভেবেছি প্রতিকূল
হয়তো আমারি ভুল
নতুনেরা পেয়ে গেছে কাব্যের জগত
নতুনেরা সিদ্ধকাম আমি আজো ব্যর্থ-মনোরথ।
শিখিনি ভাষার যাদু প্রতীকী-মনের
শৃঙ্খলীল-চেতনায় বোধশূন্য লঘুমননের।
এ যুগের শিখিনি রেওয়াজ
শব্দ হবে জলবিম্বে হবে না আওয়াজ
নিঃস্বনিত অরণ্যের ছায়া-কাঁপা সমুদ্রের জলে
চিহ্নহীন ব্যাপ্তি শুধু ঢেউ ভেঙে গহীন অতলে
মিশে যাবে অবিমিশ্র গানে
নতুন কালের অভিজ্ঞানে।

যে কথাটি অনিবার্য যে কথার পাশে
উচ্চারণে ইঙ্গিতে আভাষে,
যে রঙের পাশাপাশি মানায় যে রঙ্
তা'রা আজ অপাংক্তেয়। এ যুগের ঢঙ্
প্রকাশের অপ্রমেয় নিবিড়-নৈরাজ্যে নতুনের
প্রাণহীন প্রতীকী-মনের।
ভাবি তাই আতঙ্কিত মনে
নতুনের স্থান নেই আমার এ সোচ্চার মননে।

২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৮

রক্ত-শালুক

দিন কেটে যায় গণ্ডগোলে রাত্রি কাটে অনিদ্রায়
স্বপ্নদেখার সময় কোথা? দুর্ভাবনার যন্ত্রণায়।
শ্যাওলাঢাকা জ্ঞানের ডোবায় বুদ্ধি কাটে ডুব-সাঁতার
হৃদয় যেন রক্ত-শালুক পঙ্কেভরা মন-পাথার।
একাই আমার নয়কো শুধু কর্মহারা ব্যর্থদিন
দেশজোড়া এই সর্বনাশে সান্ত্বনা যে অর্থহীন।
অন্ন যে নেই বস্ত্র যে নেই শান্তি যে নেই সংসারে
মুক্তি যেন আকাশকুসুম ভোলায় অলস-মনটারে।
গুমরে ওঠে ব্যথার মেঘে কালবোশেখীর জন্মদিন
চৈত্র-শেষের শুকনো পাতার মরণ জাগে তন্দ্রাহীন।
পরের বাড়ীর চোখ-রাঙানো আঁস্তাকুড়ের ঘরভাড়া
গয়লা মুদী ধোবার দাবি দিচ্ছে প্রাণের ভিত্‌নাড়া।

কল্পলোকের ভূত-ভাগানো গুষ্ঠি পোষার খরচাতে
সরস্বতীর হিক্কা ওঠে অর্থনীতির চর্চাতে।
হায়রে তবু কথার পরে সাজিয়ে কথা নির্বিকার
রিক্তমনের শুকনো-ডাঙায় চাষ ক'রে যাই নির্বিচার।
ঝনঝনিয়ে ছন্দ জাগে অন্ধ বুকের পাঁজরাতে
পদ্য-ফসল বেচতে বেরুই সাজিয়ে ভাঙা বাজ্‌রাতে।
দাম জোটে না ভাবের হাটে রক্তঝরা দিন কাটে
সদ্যলেখা পদ্যগুলোর রুক্ষ ভাষায় বুক ফাটে।
সুরের ফাঁসি গলায় দিয়ে চেঁচিয়ে মরে কোকিলটা
হাতড়ে মরি বুকের মধ্যে প্রেমের পাকা দলিলটা।
দুঃখে মগন বচনগুলো রক্তরাঙা ফুল ফোটায়
স্বপ্নমধু পায় না ব'লে মৌমাছিরা হুল ফোটায়।

১লা শ্রাবণ ১৩৬০

বোধন

আমার আকাশ পৃথিবীর থেকে আলাদা
রাত্রি আমার কান্নার ভাঙাঘর।
দেখেছি দরোজা খুলে
গলিপথ গেছে অস্ফুট এক ভোরের জগতে মিশে।
যেখানে আকাশ শিশির ঝরায়
বনে ফুল ফোটে পাখিরা অধীর ডালে।
আমি ছবি আঁকি দিগন্ত-ছায়াপটে
ঘরে মন নেই
মনে ঘর নেই
দূরের আকাশে জ্বলে জ্বলে শুকতারা।

আমি যেন গাই গলা ছেড়ে মূক
নীরব কণ্ঠ নির্বাক নীল
আমার বুকের নবজন্মের গান
আমি খুঁজি প্রাণ রাত্রির শেষ দিগন্তহীন আকাশে।
ভাঙা ভাঙা কত ছিন্ন ছিন্ন সময়ের সোনা দিয়ে
রচনা আমার সূর্যের রণতূর্যের আহ্বান
আলোর তীব্র-পিপাসা হৃদয়ে জাগানো।

কোনো ভ্রূকুটিতে জীবনে থামিনি কান্নার ভাঙাঘরে
দুটি চোখ শুধু কয়লাখনিতে জ্বলেছে হীরের মত
কালপেঁচা-ডাকা নৈশ-আকাশ কেঁপেছে
মনে ঘর নেই
ঘরে মন নেই
কাঁপেনি মনন জান্‌লা দরোজা কপাটে।

কী এক কঠোর পথ-নির্দেশ পথ থেকে পথে ছুটে গেছে সারারাত
মন থেকে মনে, প্রাণ থেকে প্রাণে প্রাণে
কী এক রুদ্রসুরে ভেসে গেছে সূর্যের অভিযানে।
পৃথিবীর থেকে আলাদা-আকাশ
ভাঙাঘর কালোরাত্রির নীরবতা,
অস্থির মনে যুগচেতনার
কী যন্ত্রনার বুদ্বুদ শত শত
ভেঙে চুরে গেছে রুদ্ধ-তোরণ দেখেছি দুচোখ মেলে
মহাজাগরণ এসেছে রুদ্ধ প্রাণের দরোজা ঠেলে।

হে মোর চিত্ত এই কি পুণ্যতীর্থ ?
নবজন্মের রক্ততোরণ
এই কি আমার প্রাণের বোধন
গলিপথ ছেড়ে দিগন্তহীন শুকতারা-জাগা ভোরে ?
আমার বাঁচার জয় হবে যারা সোজা খাড়া হয়ে বাঁচলে
তাদেরই চেনার দীক্ষা আমার কাব্য,
তাদেরই জানার দুর্জয় এক শপথে ?

১লা মার্চ ১৯৫০

আমি তাহাদের কবি

গরীব বাপের ছেলে হয়ে যারা জন্মেছে এই মাটির বুকে
আমি তাহাদের কবি !
চোখের জলের সাগরে সাঁতার কাটিছে যাহারা অসীম দুখে
আঁকি তাহাদের ছবি।
আমায় তোমরা চেনো বা না-চেনো গ্রাহ্য করি না চেনা ও জানা
স্বার্থের কালো-আকাশে ওড়াও হরষে মেলিয়া দম্ভ-ডানা
তোমাদের দেওয়া কবিযশ নিতে ঘৃণায় আত্মা উঠিছে রুখে
ভাগ্যের খেলা সবি !
ক্ষুধার অন্নে বঞ্চিত যারা ধুঁকিয়া মরিছে মাটির বুকে
আমি তাহাদের কবি ॥

হে দয়াবিলাসী তোমাদের দয়া বিদ্রূপ করে কাঁটার মতো
গরীবের ভীরু·প্রাণে !
দয়া-অভিনয় দেখায়োনা আর গরীবের দল মরিবে কত
দুরন্ত অভিমানে !
তোমরা ঘৃণিত শকুনির মতো মেলিয়া নিয়ত লোলুপআঁখি
শ্মশানের মড়া ছিঁড়িয়া খেতেছ পালকে শীতল রক্ত মাখি'
দরদে চঞ্চু আঘাতিয়া আর বাড়ায়োনা বুকে দয়ার ক্ষত
অসার মুক্তিগানে !
হে দয়া-বিলাসী, তোমাদের দয়া বিদ্রূপ করে কাঁটার মতো
গরীবের ভীরু প্রাণে ॥

গরীব বাপের ছেলে হয়ে যারা লাঞ্ছনা আর বেদনা সহে
তোমাদের অবিচারে
অভাবের জ্বালা আগুনের মতো যাদের আত্মা নিয়ত দহে'
শোষণের কারাগারে।

অপঘাতে যারা মরে যুগে যুগে গুণানল চিরভস্মঢাকা
কুৎসিত কালোবিধাতার শাপ যাদের ভাগ্য-আকাশে আঁকা
রক্তে যাদের প্রলয়ের রাঙা-প্রতিহিংসার ফল্গু বহে
রহিব তাদেরি স্বারে।
অভাবের জ্বালা আগুনের মতো যাদের আত্মা নিয়ত দহে'
শোষণের কারাগারে॥

যাদের প্রতিভা বিদ্যুৎ সম ঘনতমিস্র অন্ধরাতে
পথিকেরে দেয় ধাঁধা।
চকিতে লুকায় তিমিররন্ধ্রে ব্যর্থনিশাস-বায়ুর সাথে
বেসুরো ছন্দে বাঁধা॥
আমি তাহাদের বুকের শোণিতে গৌরবটিকা ললাটে পরি
তোমাদের পানে তীব্র ঘৃণায় ক্রূর বীভৎস ব্যঙ্গ করি
বিধাতার বুকে পদাঘাত করি' মরিব শূন্যে ঝঞ্ঝারাতে
চূর্ণ করিয়া বাধা।
আমার কাব্য ভোজবাজী সম মিলাবে রিক্ত কুটিল-রাতে
বেসুরো ছন্দে বাঁধা॥

১২ই ডিসেম্বর ১৯২৭

ঝড়ের স্বরলিপি

রক্তদীপ জ্বেলে
রচনা ক'রে যাই
মাতাবে মহাকাশ
জ্বালাবে শতশিখা

ক্ষুব্ধ জীবনের
কবে যে জনতার
বজ্রে বিদ্যুতে
প্রলয়-গম্ভীর

ঝড়ের স্বরলিপি
কণ্ঠে গান হয়ে
অগীত গানগুলি
মেঘের বুক চিরে।

তামসীরাত জেগে
ভীরুতা বুকে চেপে
হে মহারুদ্রাণি,
কণ্ঠ আগুনের

কত যে গুন্ গুন্
বাজাই মনোবীণা
ললিত লঘুকথা
ছন্দে উত্তাপে

নীরবে সুর ভাঁজি
অগ্নি-ঝংকারে!
সাজাতে ঠোঁট কাঁপে
জ্বলছে সুরে সুরে।

ঝড়ের স্বরলিপি
পড়বে ভেঙে চূড়া
প্রলয়-ঝন্ ঝন্
শাণিত বিদ্যুতে

রচনা করে যাই
স্বর্ণ-প্রাসাদের
শব্দে শাণ-দেওয়া
গাইবে জনগণ

জানি না কতদিনে
ভিত্তি চিরতরে!
সুরের তরবারী
তামসী বাংলাতে।

আমার গান কবে
ভীষণা বাংলাতে

উঠবে জ্বলে কোটি
নবীনা বাংলাতে

কণ্ঠে ঝড় তুলে
জননী বাংলাতে।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৩২

শতবার্ষিকী

[১৮৪৮-১৯৪৮]

"A SPECTRE IS HUNTING EUROPE, THE SPECTRE OF COMMUNISM."

প্রেত নয়ঃ শুধু ইউরোপ থেকে কবর-ফাটানো
আঁকাবাঁকা রাঙা শতবর্ষের
প্রচণ্ডতম রক্তের ধূম
ঘনীভূত মেঘ ক্ষুব্ধ নিঝুম
বাজে-ঠাসা কালোনিঃশ্বাসে জাগা
প্রেত নয়ঃ নবগোষ্ঠীর শালপ্রাংশু কাঁধের
বিদ্রোহী কালবৈশাখে দোলা-লাগা .

প্রেত নয়ঃ রাঙা থম্‌থমে ঝড়
লৌহ নিগড়
ঝন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌
যন্ত্রের মহাশব্দের ঝড়
উদ্দাম ঝঞ্ঝনা !
নেহায়ে নেহায়ে কোটি কোটি কোটি
ঘামঝরা কড়া-হাতুড়ির ঘায়
রুক্ষ শুষ্ক ভুখা-কলিজায়
প্রেত নয়ঃ গাঢ় অন্ধকারের
দীর্ণবুকের পারমাণবিক
রক্তবহ্নিকণা !

প্রেত নয়ঃ মহাশব্দায়মান
শৃঙ্খলছেঁড়া প্রলয়ের গান
সাইরেণ-রাজা ঈথারে ঈথারে কম্পিত রাঙাধূম...
প্রেত নয়ঃ কোটি কোটি আত্মার
মানবেতিহাসে ঋজু ক্ষুরধার
শতবর্ষের আকাশ-রাঙানো শাণিত-সম্ভাবনা !
আশ্বাসে আর বিশ্বাসে নয় বৃথা বসে কালগোনা...

প্রেত নয়ঃ পদধ্বনিত রাত্রি
প্রচণ্ডতম জীবনধাত্রী,
দুনিয়ার যত শোষিত সর্বহারা
প্রেত নয়ঃ ওরা মহাভুবনের
দুর্জয় ক্ষুধা বিস্ফোরণের
শ্রম-চেতনায় উদ্দাম রণধারা...

প্রেত নয়ঃ রাঙাপ্রাণের মশালে
আঠার শ' আটচল্লিশ সালে
সর্বহারার চেতনায় জাগা ঘুম
প্রেত নয়ঃ ওরা সারা দুনিয়ার
বিপ্লবী মহাপ্রেম-পারাবার
গণ-মানবের রক্তের মহাধুম......

১লা মে ১৯৪৮ —[illegible]

৭ই নভেম্বর

সারা দুনিয়ার সর্বহারার ইস্পাতে গড়া বজ্রমুষ্টি
জানায় তোমায় লাল সেলাম!
কড়া-শপথের অক্ষরে লেখা বাঁকানো-বজ্রে গঠিত সাতুই নভেম্বর
বিশ্বরাঙানো বিপ্লব গানে সুরু করেছিলো যে সংগ্রাম
আমরা যে তা'র জঙ্গী ফৌজ মহিমান্বিত অগ্নিদিনের অজেয় বংশধর।

আমাদের প্রাণধারণের ঘাম-ঝরানো দেহের রক্তে তোমার
স্বর্গজয়ের উদ্দাম-নেশা জাগানো,
কবির কাব্যে গায়কের গানে সজাগ জীবনশিল্পীর ধ্যানে
ভাষায় রেখায় রঙে আর ঢঙে
অজেয় দাবীর সমুদ্রদোলা লাগানো!

যত খুশি ঝড় ঘনাক আকাশে জানি
পার হয়ে যাবো সর্বনাশের বিভেদের কালাপানি
থুতু দিয়ে চিঁড়ে-ভিজানো মালিক-মজুরের নয়া-প্রেমের কুটিল
ভেদপন্থার বড়াই,
আমরা মানি না, মানি শুধু মহাপৃথিবীর পথে সঙ্ঘবদ্ধ
রাঙা আগুনের শিখায় দীপ্ত ন্যায্যদাবীর লড়াই।

আত্মার গায়ে সুড়সুড়ি তাই লাগে না গলদঘর্ম শরীরে
দড়কোচামারা-কব্জিতে আর
আধপেটা-খাওয়া বস্তির পচা পাঁকে,
আমাদের কবি বজ্রভাষায় বিদ্যুতে লেখা ধূম্রমেঘের
বুক চিরে ছবি আঁকে।

কত না ব্যর্থ-বিদ্রোহে আর বিক্ষোভে ভরা যুগ যুগ ধ'রে
হাতড়ে মরেছি শোষিত-প্রাণের মুক্তির সোজাপথ,
সুবিধাবাদীর বেইমানী আর বিভেদের ষড়যন্ত্রের পাপে
ব্যর্থ হয়েছে বার বার কত বিদ্রোহী মনোরথ।

সুদীর্ঘতম মহড়ার শেষে এলো উনিশ-শো' সতেরো সালের
মেরু-তুষারের কোলঘেঁষা গণ-জীবন-চেতনা জুড়ে,
সর্বহারার বুকের আগুনে সেদিন তোমার রাঙা-মশালের
কেঁপেছিল ছায়া গৌরীশৃঙ্গচূড়ে।
সারা দুনিয়ার শোষিত রিক্ত অজেয় বুকের ব্রোঞ্জে শিলায়
তাম্রফলকে শোণিতাক্ষরে খোদিত শুভঙ্কর,
স্বর্গ-মর্ত-নরকজয়ের রচে ইতিহাস রোমাঞ্চকর
সেলাম তোমায় সাতুই নভেম্বর!

৭ই নভেম্বর ১৯৪৭ —করতোয়া

বিপ্লব

পূর্বাচলের দিকে মুখ ক'রে তিমিরান্তক চেতনায়
তমোভিভূত সংসারকে বলেছি,
ক্ষমা করো আমার নির্মমতাকে।
আমার এই আপাতরুদ্র-ভীষণতা কল্যাণেরই বাণীবাহক!
অগ্নিকে জয় করেছি উর্বশী-পুরুরবার প্রদীপ্ত সঙ্গমে,
পৃথিবী হয়েছে রত্নগর্ভিণী ধাতুবিপ্লবের ঐশ্বর্যময়তায়,
দুর্বিনীত নদনদী পায়ের তলায় আছড়ে পড়েছে,
নতি-স্বীকার করেছে উদ্ধত বিন্ধ্যগিরি!

আমার সেই অরিন্দম-প্রত্যয়ের রক্তিম উচ্চাশা
মানব মানবীকে শিখিয়েছিল পথচলার ছন্দ
শিখিয়েছিল নিষ্ঠুরতাকে ঘৃণা করতে
ঘৃণা করতে স্বার্থপরতাকে
আর সমাজগঠনের হৃদয়ধর্মী কমনীয়তাকে ভালবাসতে।
আজ আমার এই স্তব্ধ-সংকল্পের দৃঢ়তাকে ভয় কোরো না হে সংসার॥
যতদিন থাকবে অন্যায়ের অস্তিত্ব
ঐশ্বর্যবণ্টনের বৈপরীত্য
পাপের ঔদ্ধত্য
বিকৃতবুদ্ধির পশ্চাদ্গামিতা,
ততদিন আমার এই শুভবুদ্ধির শাণিত-খড়্গ
সদাসতর্ক থাকবে প্রত্যাঘাতের অনমনীয়তায়।

আমার এই সজাগ বিদ্যমানতা শুধু আমার জন্য নয়,
আমি আমার মুক্তি চাই না ধর্মনিষ্ঠ রহস্যময়তার নিরবয়ব অন্ধকারে,
ভারাক্রান্ত পরাজিত পশুর ঐশ্বরিক দীর্ঘশ্বাস আমার নয়।

মানববুদ্ধির প্রথম উন্মেষ-লগ্ন থেকে
আমি মুক্তি চেয়েছি ঃ
প্রতিটি মানুষের
প্রতিটি শস্যকণার
প্রতিটি মঞ্জরী-মুকুল-পুষ্পের,
মুক্তি চেয়েছি
নৃত্যের সঙ্গীতের কাব্যের
মহান উদার জড়জাগতিক চিন্তাশীলতার।

ইতিহাসের অন্ধকার-যুগে প্রথম যেদিন লিখতে শিখেছিলুম,
আমার সেই রচনাযন্ত্রের আদিম রেখাসঞ্চারে
যে অদ্ভুত শব্দগুলি রূপায়িত হয়েছিল
তা'ব প্রত্যেকটি অগ্নিবর্ণ অক্ষর দিয়ে আমি রচনা করেছি
এই অন্তহীন মানব-সংস্কৃতির কাব্যধারা,
এই অপ্রতিরোধ্য প্রগতির গতিশীলতা!

> আমি তাই চিরঞ্জীব উদ্ধত বিবাট উজ্জীবন
> সৃজনেব মহেশ্বর বিষ্ণু আমি বিশ্বপালয়িতা
> প্রদীপ্ত প্রভাতস্বপ্নে ব্রহ্মা আমি হংস পদ্মাসন
> আজো করি উচ্চাবণ অন্তহীন সৃষ্টিব সংহিতা।

আমাব বক্তমুখ ক্রোধ দেখে যারা ভয় পাচ্চো
সর্বনাশেব প্রতিভূ মনে ক'রে অভিশাপ দিচ্চো
স্থিতবুদ্ধিব কষ্টিপাথবে ঘষে তা'বা আজ যাচাই ক'রে নাও
আমাব সামগ্রিক-চেতনাকে।

দীর্ঘবিলম্বিত প্রাণযাত্রাব শম্বুকগতিতে
আমার আস্থা নেই
বিশ্বাস নেই নিশ্চেষ্ট বুদ্ধিবিলাসেব আশাবাদী সান্ত্বনায়।
আচম্বিত ঈশানের কালঝঞ্ঝাবেগে আমাব ঐতিহাসিক পদক্ষেপ
সুসংগঠিত অভ্যুত্থানের অব্যর্থতায়;
আমি বিপ্লব
আমি জয়শ্রীমণ্ডিত আগামীকালের শঙ্খনির্ঘোষ!
হে সংসাব, আমাকে ভয় কোরো না,
আমি তোমার বন্ধু
আমি তোমার অনিবার্য-সংকটমোচনের বৈজয়ন্তী গান।

১লা মে ১৯৫৪

দম্‌কা হাওয়া

ক্লাইভের আমলের পুরোনো বাড়ীটার হাড়-পাঁজরা খসিয়ে
আচম্‌কা এলো একটা দম্‌কা হাওয়া
এমন হাওয়া আর কখনো আসেনি।
ঝরে গেল বালির পলেস্তারা, আল্‌গা শুরকি, ঘেঁসের গাঁথ্‌নির দেয়াল,
মচ্‌মচ্‌ ক'রে উঠ্‌লো জান্‌লার ছিট্‌কিনী, খড়খড়ি, কব্জাগুলো,
বাড়ীটা যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে।
জমিদারীর চৌহদ্দী-আঁকা মানচিত্রখানা
দম্‌কা হাওয়ায় উড়ে গেল—
বাজে-তাড়া পায়রার মতো।

উড়ে গেল বহুকালের জমানো ধুলো
পোকায় কাটা পাঁজীর জীর্ণ হলদে পাতা
পরচা দাখিলা ঠিকুজী কোষ্ঠী,
দেয়ালে টাঙানো বংশ-পরিচয়ের তালিকা
সেই দম্‌কা হাওয়ায়—
এমন হাওয়া আর কখনো আসেনি।

জং-ধরা হুক্‌ উপড়ে চুরমার হ'লো ফ্রেমে-বাঁধা ছবি
চোগা-চাপকান-সাম্‌লা-আঁটা প্রপিতামহের,
কোম্পানীর আমলের হোমরা-চোমরা দেওয়ান বাহাদুর
হুমড়ি খেয়ে পড়লেন দম্‌কা হাওয়ায়
কী দুর্দান্ত সেই ওলোট-পালোটকরা হাওয়া?

খোওয়া-ওঠা-মেঝের ওপর আছড়েপড়া ঝাড়-লণ্ঠনের আওয়াজে
ঝন্‌ ঝন্‌ করে উঠলো দু'শ বছরের ইতিহাস
অবিশ্বাস্য ভূতুড়ে গল্পের মতো সেই দমকা হাওয়ায়
বাম দিকের আকাশ জুড়ে এলো সেই
পলাশ-কৃষ্ণচূড়ার হৃদয়-রাঙানো
বৈজয়ন্তী-হাওয়া!

উথ্‌লে ওঠা প্রাণ-সমুদ্দুরে
লাফিয়ে চললো তুমুল ঢেউ সংসারের কূলে কূলে,
দক্ষিণপাড়ার আটচালা ভাসিয়ে
আঁৎকে-ওঠা তাঁতঘরের কাদার পাঁচিল ধ্বসিয়ে
হুড়মুড়িয়ে ভেঙে-পড়া চণ্ডীমণ্ডপের তলায়
চাপা পড়লো রামনামের মাহাত্ম্য।
চরকায় কাটা সুতোর পাঁজে জটপাকানো আধ্যাত্মিকতা
ভাসিয়ে নিয়ে চললো সেই দম্‌কা হাওয়া।

আচমকা এলো সেই দমকা হাওয়া
বাঁ দিক থেকে ডাইনেঃ
পুরোনো গাছ-পালার শেকড় উপড়ে
পরশ্রমজীবীদের দালানকোঠার ভিত টলিয়ে
দুর্গ-প্রাসাদ-জেলখানার লৌহকঙ্কাল
ঝনঝনিয়ে উঠলো ভয়ংকর শব্দে!
চরমপরীক্ষার কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে গেল।
মরুচারী অশ্বারোহী দস্যুর মত
বিদ্যুতের বল্লম হাতে
শাঁ শাঁ শব্দে ছুটে এলো
আকাশ চিরে শিষ্‌দিয়ে-ওঠা উড়ন্তবোমার মতো সেই হাওয়া।

৭ই নভেম্বর ১৯৫০

উত্তরাধিকারীরা আসে

মাটির ওপর কান পেতে সারারাত পদশব্দ শুনিঃ
এক দুই তিন চার একশো হাজার লক্ষ কোটি
গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌ উদ্দাম পদশব্দ...
কারা আসে? ওরা কারা?
শিরায় শিরায় চনচনে রক্তধারা
চমকে ওঠে উত্তেজনায়।
ভিৎ টলে, ফাটল ধরে, চিড় খেয়ে যায় স্ফটিক-মর্মরে
বুনিয়াদী ভাবনার চত্বরে।

মাটির ওপর কান পেতে শুনিঃ
তারিখ মাস সন শতাব্দী গুনি।
কয়েক হাজার বছরের একটানা-রাত্রি
পদশব্দের ধাত্রী।
আকাশে বাতাসে
গোঙানি শব্দ আসে
গুণটানা ধনুকের মতো নাড়িতে নাড়িতে টান লাগে
বিপুল সম্ভাবনার রক্তমাখা ভ্রূণ জাগে।

পথের ধুলোয় উদ্দাম পদশব্দ!
দুনিয়ার অবিসংবাদী মালিকেরা আসেঃ
উথলে ওঠে নোনাঘামের সমুদ্র
ফুটন্ত গরম নোনাঢেউ
আসে অগুন্তি আঘাতের অব্যর্থ শব্দ-তরঙ্গে।

নোনাঘামের জারকরসে জারিয়ে দেয় সমাজ রাষ্ট্র রাজনীতি!
মরচে ধরায়
পেটমোটা সিন্দুকের ইস্পাতী কব্জায়
ভোঁতাবুদ্ধির জটপাকানো মাথার খুলিতে
আড়াই হাজার বছরের কচকচানি বুলিতে
আকাশ ভেঙে পড়ে
তরঙ্গিত নোনাঘামের সামুদ্রিক ঝড়ে।

পৃথিবী জুড়ে দুরন্ত পায়ের আওয়াজ ঃ
তারা খসে, চাঁদ জ্বলে
নদী চলকায়, পাহাড় টলে
ছিঁড়ে যায় মধুপক্ষ-ফাল্গুনীর স্বপ্ন-জাল।

আমি শুনি! কে আমি?
দেমাকে অহংকারে আসমুদ্রহিমাচল গম্‌গম্‌!
ইতিহাস ধমকে ওঠে;
চোপ্‌রও বেয়াদপ! কে তুমি?
সবাইকে চলতে হবে ঐ আওয়াজের তালে তালে
কলমের ডগায়, হাতুড়ির আগায়, লাঙলের ফালে।

গৌরীশৃঙ্গের চূড়ায় বসে অনেক চাঁদ ধরেছ সূর্যি মেরেছ,
দিনরাত্রির কালি দিয়ে
আকাশের কাগজে কেটেছো অনেক হিজিবিজি!
এবার থামো
পদশব্দের মাটিতে নামো।

জেগেছে যন্ত্রশালা ক্ষেপেছে মাটি
খনিগর্ভের বহ্নিবাষ্প ঘুলিয়ে উঠেছে পার্থিব-চেতনায়।
ফুটন্ত নোনাঘামের ঢেউ লেগে
অতিকায় বুড়োজোঁকেরা কিলবিল করছে
চুপসে যাচ্ছে হাজার বছরের রক্তচোষা ভুঁড়ি।

গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌ গম্ভীর আওয়াজ
কারা আসে? ওরা কারা?
সুরু হয় পূবের দুর্গম্বার খোলা
রক্তবর্ণ গোলা
দীর্ঘরাত্রির সীমান্তগর্ভে তুমুল শব্দে ফাটে
স্যাঁৎসেঁতে জীর্ণের কুয়াশা কাটে
জবাকুসুমসঙ্কাশ-চেতনার স্বর্ণদীপ্তিতে।
স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মিথ্যা নয় একবিন্দু
ফুটন্ত গরম ঘামের সিন্ধু
আছড়ে পড়ছে শোষণের রুক্ষ বালুচরে

কয়েক হাজার বছরের জনারণ্য কেঁপে ওঠে বিপুল মর্মরে!
শির শির ক'রে ওঠে লক্ষ কোটি শিরদাঁড়া
কান পেতে শুনি ছন্দোবন্ধ দ্রুতপায়ের আওয়াজঃ
আসে—আসে—
পৃথিবীর শাশ্বত উত্তরাধিকারীরা আসে!

৫ই আশ্বিন ১৩৫৩ —ফতোয়া

ঝড়

পলাশবর্ণ জীবনের নদী আকাশে রক্তমেঘ
ঝড় আসে, ঝড় আসে!
গণগঙ্গায় উত্তালঢেউ তুমুল বন্যাবেগ
দম্ভের চূড়া ভাসে।
মানসচক্ষে ভেসে ওঠে সেই যুগান্তকারী দিন
জীবনের কল্লোল
জনতার কলমন্দ্রমুখর প্রহর শঙ্কাহীন
উদ্দাম উতরোল!

নভেম্বরের মেঘমন্দ্রিত বিপ্লবী জয়গানে
ভেঙে পড়ে কারাগার
দুর্গপ্রাচীর ধূলিসাৎ গণরুদ্রের অভিযানে
চূর্ণ লৌহদ্বার।
ক্রূরসামন্ত 'কুলাকে'র শব লম্বিত ফাঁসিকাঠে
শোষিতের উল্লাস
ভেসে আসে অনিবার্যকালের অগ্নিমন্ত্রপাঠে
আগামীর ইতিহাস।

আরো দূরে দেখি নিহতবিধির কঙ্কাল দিয়ে গাঁথা
প্রগতির জয়বেদী,
সাম্যের পথে সর্বহারার স্বর্গবিজয়ী মাথা
মহান অভ্রভেদী।
যন্ত্রে শস্যে মধুর আয়াস, জ্ঞানেবিজ্ঞানে ধরা
পুলকে রোমাঞ্চিতা
আহা সেকী সুখ শান্তি-তৃপ্তি-সাম্যে বসুন্ধরা
রূপসী অনিন্দিতা।

প্রেয়সীর বুকে মাথা রেখে সেকী অগাধ স্বপ্নসুখ
আকাশে শুভ্র চাঁদ
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পরমায়ু আর আনন্দে ভরা বুক
মুক্তির সেকী স্বাদ!

প্রকৃতি-বিজয়ী মানব-সাধনা নব নব উপাহারে
সাজায় ভূমণ্ডল
নানা কণ্ঠের দেশ-বিদেশের সঙ্গীত ঝংকারে
ত্রিভুবন চঞ্চল।

দুঃখের অমাশর্বরী বুকে মুক্তির দিন গুণি
দিন গুণি আগামীর
বিশাল ভারতে যুগ-বিপ্লবী শঙ্খ-আজান্ শুনি
জয়গান পৃথিবীর।
ঝড় আসে ঐ রাঙা ঝড় আসে ভৈরব গর্জনে
দুঃখের পারাবারে
বাঁকাবিজলীর হাল ধরে আসে তিমির উত্তরণে
চিনি সে কর্ণধারে।

সহস্রাক্ষ সহস্রপদ সহস্র বীরবাহু
রক্ত-পতাকা হাতে
জ্বালায় মশাল, জ্বলে পুড়ে যায় ধনবাদী পাপরাহু
বিপ্লবী সংঘাতে।
ঝড় আসে ঐ রাঙা ঝড় আসে আকাশ ভুবন ছেয়ে
মুক্তির অভিযানে
মহাবিশ্বের কল্যাণ আসে মৃত্যু-সাগর বেয়ে
সাম্যের জয়গানে।

১লা মে ১৯৪৮

সূত্রধার

তোমার সুদৃঢ় মুষ্টি ইস্পাতের চেয়ে শক্তিমান
সে-কথা বোঝো না তুমি, আগুনের ঝাঁঝে পোড়ামুখ
চুল্লীর হল্‌কায় দীপ্ত ক্রমাগত দিয়ে যাও শাণ
কঠিন ইস্পাত ঘষে, ইস্পাতেরো চেয়ে শক্তিমান
ঘামে রক্ত-জলকরা কলিজার অগ্নিগর্ভ গান।
দুরন্ত খাটুনি খেটে ভাঙেনি লোহায় গড়া বুক
নিঃশ্বাসের মেঘে ঢাকা আদিগন্ত তোমার আস্‌মান!
সে কথা জানো না তুমি অন্ধকারে প্রচণ্ড কৌতুক
যন্ত্রের বিস্ময়কর রূপ দেখে কী যে পাও সুখ?
সে কথা বুঝেও তবু উন্নাসিক বুদ্ধিজীবী মূক।
বোঝো না শাস্ত্রের কথা ধর্ম নেই বস্তির নরকে
শরীর দড়কোচামারা পেশীপুষ্ট যমের অরুচি!

রূখে যদি ওঠো তবে কার সাধ্য সে আঘাতে রেখে
বোহিসেবী জীবনের রক্তরাঙা নেশাখোর চোখে
ঝিমোয় আগামীকাল অতিরিক্ত খাটুনির ঝোঁকে।
তোমার জীবনকথা বার বার লিখি আর মুছি
মধ্যবিত্ত শোণিতের বিকৃত স্বপ্নের কাব্যলোকে;
অলিখিত কেতাবের নেই পৃষ্ঠা নেই কোনো সূচী
তুমি তার সূত্রধার মুক্ত করো জীবন অশুচি
পুঁজিবাদী ভাবনার অভিশাপ যায় যেন ঘুচি।

১৪ই এপ্রিল ১৯৫০

তিনযুগ

এই আমি একদিন বোধিদ্রুম তলে
খুঁজেছি দুঃখের শেষ তপস্যার বলে,
বিরূপাধি নির্বাণের মহারিক্ততায়
এই আমি ডুবে গেছি অতল চিন্তায়
বুদ্ধ আজ শিলীভূত আমি আজো আমি
জীবনের যাত্রাপথে উজ্জ্বল আগামী॥

ঈশ্বরের পুত্রবেশে অর্থহীন ক্ষমা
বুকে নিয়ে খৃষ্ট আমি যন্ত্রণার অমা
রাঙায়েছি পূর্ণিমার রক্তধোয়া জলে
অপঘাতে অন্ধপ্রেম গেছে রসাতলে
খৃষ্ট আজ পুরাতত্ব! আমি আজো আমি
তমোহন্তা-অগ্নিরথে দুর্জয় আগামী॥

অনশনে নির্যাতনে ভ্রূকুটি কুটিল
আমি মার্ক্স মহাবিশ্বচেতনার মিল
এনেছি নির্বাক বুদ্ধ খৃষ্টের স্মরণে
সংঘাতের ইতিহাস-সমুদ্রমন্থনে
সর্বহারা বিপ্লবের জন্মদাতা আমি
বস্তুবাদী বিজ্ঞানের জ্বলন্ত আগামী॥

২৭শে অক্টোবর ১৯৪৯

মুখোশ

সোনার পাহাড়ে ঘেরা মুখোশের দেশে
মুখোশেরা মণ্ডপতি। মুখোশে আবৃত মুখগুলি
মুখোশের গ্যালারীতে উল্লাসে মুখর!
মুখোশের যুগ এটা! মুখোশ! মুখোশ! চতুর্দিকে!
শুয়োরের চামড়া ঢাকা
মাথায় মোষের শিং ভাঁড়ামীর ক্লীব অঙ্গরাখা
শুচিশুভ্র সভ্যতার সর্বাঙ্গে জড়ানো।
মিহি মিহি বচনের সিকিইঞ্চি অর্ধইঞ্চি অমায়িক বর্বর ভাষণ
মুখোশের মুখে শোনো।
মনুষ্যত্ব কৃকলাস প্রেতায়িত প্রেম
আড়ষ্ট ললিতকলা প্রগল্ভ সঙ্গীত
মুখোশের মঞ্চে মঞ্চে!
উপদংশ গুটিকায় বিচিত্রিত মুখোশের মুখে
আঙ্গিকের অঙ্গভঙ্গী দ্যাখো,
দ্যাখো বিজ্ঞ মুখোশের রসাল রসনা
ঝরায় বিষাক্ত লালা!

নাগরিক জীবনের উচ্চাসনে কৃপালু নাগর
ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফ্টে, হুণ্ডি কেটে, মোটর হাঁকিয়ে,
চোরাগোপ্তা শেয়ারের মহিমায় প্রাসাদ বানিয়ে
অবিশ্রান্ত জন্ম দিয়ে যায়
নিরীহ নির্বোধ অসহায়
গরু ভেড়া ছাগ মহিষের
আভিজাত্য-কলুষিত কচি কচি উদ্ধত মুখোশ!

ক্লেদ-পঙ্ক-তিলকের জয়শ্রীমণ্ডিত
এ যুগের রাজসূয় মহাযজ্ঞশালা
পিশাচের প্রদর্শনী সশঙ্কিত সুরক্ষিত দ্বার
টিকিট লাগে না মুখোশের।
মুখ খোলা নিষিদ্ধ এখানে
খোলাকথা খোলাখুলি বলা অসম্ভব,
মুখোশের আভিজাত্য উচ্চপ্রশংসিত!
বনেদী মুখোশঢাকা মুখোশের মহারঙ্গভূমি
এ সমাজ, এ সংসার! পিতার মুখোশে
অনিচ্ছুক জন্মদাতা পিতৃস্নেহে বিবশ বিহ্বল!
মাতার মুখোশে—
চোখ নেই আলো নেই স্তন্যরস-ক্ষরণের জ্বালা
অন্ধ মূক মাতৃস্নেহ!

প্রেমিক প্রেমিকা প্রিয় প্রিয়া
যৌবনের নিরিন্দ্রিয় অভিশপ্ত চলন্ত মুখোশ,
মুখোশ! মুখোশ! চতুর্দিকে!
তোমার মুখোশ দেখে হেসে ওঠে আমার মুখোশ
সৌজন্যে সম্ভ্রমে গদগদ
মুখোশের সুবিনীত মুখভঙ্গী দেখে
খোলাখুলি মনোবিনিময়
অবাস্তব মুখোশের দেশে!

মুখোশেরা যাদুকর মুখ নেই তবু কথা বলে
হাত নেই সম্পদ বিশাল
যাদুমন্ত্রে ধরে রাখে,
বিনাপায়ে হেঁটে যায় পায় যদি বাধামুক্ত পথ
জঠরে জটিল মনোরথ
অহোরাত্র জেবলে রাখে রাবণের চিতা!
দুরন্ত ক্ষুধায় লুব্ধ বিশাল জগত
কখন যে গিলে খাবে বলা অসম্ভব
অতিকায় মুখোশের হাঁয়ে।
মুখোশের আধিপত্যে সুরক্ষিত সোনার পাহাড়
ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি।

ভূরিভোজী ভূগর্ভের তলে
কান পেতে শোনো ভূকম্পন
চাপা ক্রোধ জমাট গর্জন
সুবর্ণ-পর্বতচূড়া ভেঙে বুঝি পড়ে!
আতঙ্কে উন্মাদ মুখোশেরা
মুখোশের রঙ্গমঞ্চে ভুলে যায় নাটকীয় ভাষা
আঙ্গিকের অঙ্গভঙ্গী! দুর্বোধ্য হুঙ্কার!
মুখোশ! মুখোশ! চতুর্দিকে!

চেয়ে দ্যাখো মুখোশেরা নাচে বিনা পায়ে
আত্মঘাতী বীভৎস তান্ডব,
বিনা হাতে তালি দেয়
গলা নেই দোলে মুণ্ডমালা
অনাঙ্গিক হস্তপদ তাথৈ তাথৈ নাচ নাচে!

মুখোশের রঙ্গালয়ে যারা আজো পায়নি টিকিট
অনাহূত উপেক্ষিত অনিমন্ত্রিত
অনন্ত অর্বুদ হস্তপদ
খালি মুখে খোলাখুলি কথা বলে যারা

নিরন্ন নির্জীব পাকস্থলী,
সোনার পাহাড় যারা গড়েছিল ঘামে রক্তে নোনাঅশ্রুজলে
এ সমাজ এ সভ্যতা এ নগরীপথ
নিষিদ্ধ যাদের কাছে।

খোলা মুখ, খোলা বুক, খোলা মন ভৈরব উল্লাসে
তা'রা আসে—দলে দলে আসে
কেঁপে ওঠে রঙ্গশালা
ভেঙে পড়ে নিষিদ্ধ তোরণ!
শুয়োরের চামড়া ঢাকা
খসে পড়ে সভ্যতার ক্লীব অঙ্গরাখা,
পরাক্রান্ত মিছিলের দুরন্ত দুর্জয় পদাঘাতে
রাজপথে গড়ায় মুখোশ।

২৬শে মার্চ ১৯৪০

কামার

টকাস্ টকাস্ টক্। ঠকাস্ ঠকাস্ ঠগ?
নেহায়ে নেহায়ে ওঠে শব্দ।
দড়কোচা-মারা হাতে জ্বলন্ত ইস্পাতে
নিরেট কঠিন লোহা জব্দ॥

দর দর ঝরে ঘাম মেহন্নতের দাম
কামারশালের ছাইভস্ম?
ঝলসানো কালোমুখ কোলকুঁজো ভাঙাবুক
কোঁকড়ানো কাঁপে দেহ-শস্য॥

হাতুড়ীর কড়া ঘায যন্ত্র জীবন পায়
চুল্লীতে কাঁচালোহা পুড়ছে।
টক্ক টক্ক টক্! ছোবলায় তক্ষক
রাঙা রাঙা স্ফুলিঙ্গ উড়ছে॥

সাঁড়াসীর বাঘাদাঁতে রুক্ষ লোহার পাতে
ছেনির আঘাতে জাগে ছন্দ।
দর দর ঝরে ঘাম উল্লাসে উদ্দাম
পুলকিত কাঁপে হৃদস্পন্দ॥

সৃষ্টির চিতানলে কালো অঙ্গার জ্বলে
হাপরের নিঃশ্বাসে হল্‌কা।
হুস্‌ হুস্‌ হিস্‌ হিস্‌ বায়ু-নল দেয় শিস্‌
হে আগুন জীবন কি পল্‌কা?

হে আগুন নহে নহে, তামাটে শরীর দহে
চুল্লীর ঝাঁঝ খেয়ে নিত্য।
তবুও মুক্তিগানে আশার ঐকতানে
জাগ্রত কামারের চিত্ত॥

কোঁচকানো কালো ভুরু বুকে মেঘ গুরু গুরু
হুংকারে ত্রিভুবন টলছে।
নিখিল কামারশালে দধিচীর কঙ্কালে
শিখায়িত বিপ্লব জ্বলছে॥

টকাস্‌ টকাস্‌ টক্‌! ঠকাস্‌ ঠকাস্‌ ঠগ?
প্রচণ্ড প্রশ্নের শব্দ!
দু'চোখ থাকতে কানা কুৎসিত মালিকানা
লজ্জায় ইতিহাস স্তব্ধ॥

২১শে জুলাই ১৯৩৯ —দ্বিপ্রহর

সূর্যমুখী

জীবন যেন ফুল-ফোটানো স্বর্গজয়ের কামনা,
স্বর্গ তবু কাঁদছে আজো শেকলবাঁধা নরকে,
হাওড়া-ব্রিজের লোহায় জ্বলে বল্টুআঁটা সাধনা
মিছিল তবু পাচ্ছে বাধা মুক্তিদিনের সড়কে!
বাড়ছে সহর বিপুল বহব জীবন খোলে পাপড়ি।
জীবনকে হায় রুখ্‌ছে তবু লালবাজারের পাগ্‌ড়ী॥

এস্‌প্ল্যানেড্‌ থেকে ট্রামঘোরানো ইলেকট্রিকের দেয়ালী
কোলকাতাকে ভোলায় মিছে শূন্যে তারা গণনা,
ব্যস্ত প্রাণের থামায় চলায় জীবনটা নয় খেয়ালী
নিওন্‌ আলোয় নয় সে ফাঁকা ব্যবসাদারীর ছলনা।
জীবন আজো সূর্যমুখী সোনার আলোয় কাঁপছে;
ক্ষুব্ধবুকের শতেক জ্বালা গানের সুরে চাপ্‌ছে॥

মনকে বোঝাই আসবে সুদিন স্বর্ণচাঁপার আভাষে
মিছিল যেদিন পোঁছে যাবে স্বর্গজয়ের তোরণে,
যন্ত্রে গাঁথা নগর সহর মাতন তুলুক বাতাসে
চিম্‌নী থেকে বাজুক বাঁশী নতুনযুগের বোধনে।
হাজার বাধা ভাঙছে জীবন চোখের পলক পড়তে
মরণ-জয়ে লক্ষবাহু তৈরী আজো লড়তে॥

১৭ই জুন ১৯৪৯

তোমায় চাই

বাতাস নেই নিঝুম-রাত নীরব নীল আর্তনাদ
স্তব্ধ চাঁদ দিগন্তের মন রাঙা!
গুমোট মেঘ পথ বিজন
ক্ষুব্ধ মন অগ্নিকোণ
বিদ্যুতের চকমকি দিগ্বলয় ঝলসানো,
বটগাছের শুকনো ডাল কালপেঁচার ক্রেংকারে,
বিজন পথ রুক্ষস্বর হঠাৎ বুক চমকানো॥

তোমায় চাই তোমায় চাই ঘুম-পাহাড় লঙ্ঘনে
তোমায় চাই রক্তমেঘ থমথমে!
নীল জমাট অন্ধকার
ভাঙবো আজ দুর্গদ্বার
তোমার প্রেম আনুক ঝড় বিপুল ঝড় গর্জনে,
তোমায় চাই আকাশ তাই অগ্নিমুখ অর্যমার
তন্দ্রাহীন শতাব্দীর সংখ্যাহীন বন্দনার॥

আজ ধরার স্বপ্ন-ভার কাঁপছে ঝড় মেঘ ভাঙার
আঁচল কার ঝাউবনের ঝিল্‌মিলি!
আবছা কা'র হাতছানি
নিথর মন সন্ধানী
শূন্যমাঠ ঝিঁঝির ডাক যায় শোনা;
অনির্বাণ জ্বলছে গান জ্বলছে সুর শতাব্দীর
তোমায় চাই তোমার প্রেম তোমার সুর ঘুমভাঙা॥

কান্না কা'র রুদ্ধদ্বার তমিস্রার বুকচেরা
মন-শ্মশান কম্পমান চুল্লীতে
দিনরাতের নীলচিতার
স্বপ্নলীন দূর বিথার
শব্দহীন রক্তঝড় তোমার প্রেম থমথমে!
চন্দ্রমার লাসকাটা জ্বলছে হাড় ঘুম-পাহাড়
তোমায় চাই তোমার প্রেম শতাব্দীর বুক জ্বলে॥

অন্তহীন পথখোঁজার ক্লান্তিহীন অঙ্গীকার
হে বিপ্লব, তোমার স্তব কী গম্ভীর।
মিলায় রাত আর্তনাদ
তোমার প্রেম শঙ্খনাদ
ছুটছে রথ কী ঘর্ঘর চাকায় বাজ মূর্ছিত!
তোমার প্রেম তোমার সুখ বিদ্যুতের বল্গাতে
আমার মন উধাও আজ কী উদ্দাম ঝঞ্ঝাতে॥

আওয়াজ কা'র বুক কাঁপায় নীলমাটির নামলো ধ্বস্‌
কী নিষ্ঠুর হোমশিখায় লকলকে
রক্তজিব মৃত্তিকার
চাটছে নীল অন্ধকার
চাটছে হাড় তমিস্রার বিদ্যুতের চকমকি;
চন্দ্রমার ঘুমপাহাড় হিমশীতল যন্ত্রণার,
শূন্যে লীন অগ্নিময় রক্তজিব মৃত্তিকার॥

তোমায় চাই তোমায় চাই আকাশ তাই ঘুমহারা
তোমায় চাই ভোরবেলার শুকতারা।
ভাঙলো আজ দুর্গদ্বার
শূন্যে লীন অন্ধকার
উতল আজ সাতসাগর, সপ্তরঙ, সপ্তসুর,
লক্ষ মন লক্ষ প্রাণ নিষ্পলক নির্ণিমেষ
তোমায চাই সফল তাই শতাব্দীর বন্দনা॥

আমার মন তোমার পথ তোমার মন আমার পথ
বিশ্বদীপ হে বিপ্লব ঘুমভাঙা!
আমাব সুর তোমার গান
তোমাব সুব কম্পমান
সংখ্যাহীন বহ্নিমান চিতাব বুক চমকানো,
তমিস্রাব জ্বালায় বুক জীবনপথ রক্তমুখে
তোমার প্রেম তোমার সুখ ঘুমভাঙার অগ্নিঝড়॥

আকাশময় ঝড়ের গান কী উদ্দাম উল্লাসে
শর্বরীব বুক্ষকেশ ভৈরবী!
আমাব পথ তোমার মন
সংখ্যাহীন মুক্তিপণ
উধাও আজ তোমার পথ তমিস্রার বুকভাঙা;
ছুটছে রথ কী ঘর্ঘর বিদ্যুতের বল্গাতে
রাঙলো তাই সংখ্যাহীন রক্তমুখ হুল্কাতে॥

১লা মে ১৯৪৯

শেষ-প্রহর

কান্নার বীণা আছড়ে ফেলেছি ভেঙে
রাত প্রায় শেষ-প্রহরের কাছাকাছি,
নিষ্ঠুর শান-বাঁধানো ঘরের মায়া!
শূন্যের বুকজুড়ে তবু বেঁচে আছি।

রাস্তার আলো বকুলের কালোছায়া
দেয়ালে কাঁপায় বাতাসের দোলালাগা,
রাত প্রায় শেষ-প্রহরের কাছাকাছি
দু' চোখের পাতা জ্বলে যায় রাতজাগা।

ফুল দিয়ে আর চাঁদ দিয়ে গাঁথা প্রেমে
শত শত যুগ হয়ে গেছে নিঃশেষ
রাত প্রায় শেষ-প্রহরের কাছাকাছি
ভেঙে গেছে বীণা থামেনি সুরের রেশ।

কার বীণা কবে বেজেছিল কোন সুরে
ছায়ার শরীরে লেখা নেই কোনোকথা
রাত প্রায় শেষ-প্রহরের কাছাকাছি
পূবে আকাশের রক্তিম নীরবতা।

পায়েলা ঘুঙুর মঞ্জীর বাঁধা পায়ে
লঘু-কামনারা খেলে গেছে কানামাছি
ফেটে চৌচির শাণ-বাঁধা বুক কত
রাত প্রায় শেষ-প্রহরের কাছাকাছি

পৃথিবী কি চিরযৌবনা রয়ে গেল
সুর বেঁধে বলে, তুমি আছো তাই আছি!
আকাশের বুক অনুরাগে হ'লো রাঙা
রাত প্রায় শেষ-প্রহরের কাছাকাছি।

২৭শে জুন ১৯৩৯

কালবৈশাখীর প্রার্থনা

ঝড়ের ডমরু বাজে গুরু গুরু বৈশাখে
মহাজাগরণ রাঙা-চন্দনে চর্চিত,
ক্ষুব্ধ অষ্টকুলাচল শোনো ঐ ডাকে
শিখরে শিখরে রক্ত-পতাকা অর্চিত!
মেঘে মেঘে রাঙাবিদ্যুৎ বলে, শান্তি দাও!

সমুদ্র ওঠে ফুলে' ফুলে' নীল সংঘাতে
প্রশান্ত অতলান্ত পারের তটভূমি,
কাঁপায় শান্তি-শঙ্খের ধ্বনি ঝঞ্ঝাতে
রণদানবের কেঁপে ওঠে ক্রূর পটভূমি।
আতঙ্কে শোনে দিক্-দিগন্ত, শান্তি দাও!

কতোবার ঝড় উঠেছে রুদ্র বৈশাখে
কত যে ভীষণ দধিচীর হাড়ে ঠোকাঠুকি,
আগুনে-মাটির ফাটা বুক শোনো ঐ ডাকে
পাতালে সীতার কান্নার হও মুখোমুখি।
শোনো শোনো মাতা বারবার বলে, শান্তি দাও!

শুনেছে পাঞ্চজন্য সাগর স্তম্ভিত
মৈনাক হবে মুক্ত নবীন বৈশাখে,
এখনো শিবের কণ্ঠে ভুজগ লম্বিত
শান্তির শ্বেত কুন্দকুসুম কৈ শাখে?
কৃষ্ণা-কাবেরী-জাহ্নবী বলে, শান্তি দাও!

মুকুলে সুরভি বনে বনে কাঁদে বন্দিনী
জাগেনি স্নিগ্ধ কিশলয় আজো শ্যামায়মান,
পৃথিবী যে রাঙা প্রভাতী-আলোর নন্দিনী
যুগে যুগে গায় তিমির ভেদিয়া মুক্তিগান!
বনরাজিনীলা দিগন্ত বলে শান্তি দাও!

জীবন-শস্য যৌবনমায়ামণ্ডিত,
নবশ্যামলিমা শঙ্খশুভ্র সঙ্গীতে,
এসিয়ার আশা জাগরণী গানে মন্দ্রিত
কোটিকণ্ঠের বিজয়দৃপ্ত ভঙ্গীতে।
হে কালবোশেখী, উদয়তীর্থে শান্তি দাও।

১৫ই এপ্রিল ১৯৫৫

উটপাখি

মরুতে বিহার ভূচর বিহঙ্গম
দু'চোখে রোদের দিগন্তহীন জ্বালা!
তৃণতরুহীন রুক্ষ অসংযম
যাত্রাপথের জোটেনি পান্থশালা!

মরা-উট মরা-পথিকের কঙ্কালে
ঠোঁট ঘষে ঘষে জানি না কি সুধা পাও?
পালকে সূর্য তরলবহ্নি ঢালে
পঙ্গুডানার যাতনার গান গাও।

হু হু ক'রে ওঠে সাগরশুকানো ধুলো
দীপ্ত গগনে নিথর প্রহর কাঁপে,
ঘূর্ণীঝড়ের উদ্দাম প্রেতগুলো
ভাঙে বালিয়াড়ী নৃত্যের সন্তাপে।

দেখেছি তোমার ক্ষিপ্ত অসংযম
ডানাঝাপটানো বালুকা-সিন্ধুবুকে,
যে মরুশয়নে সূর্যের সঙ্গম
মরু-বিহগীর রোমাঞ্চকর সুখে।

পঙ্গুডানায় সৌরশোণিত মেখে
গিলে গিলে খাও শূন্যের মরীচিকা,
মরু-বিলাসের রুক্ষতা চেখে চেখে
ভুলে গেছো শ্যাম-সমতল মৃত্তিকা।

শাণিতনখের থাবা-আঁকা পথে পথে
মরুপাহাড়ের মাংসাশী হুঙ্কার,
জীবনে মরণে সংঘাত পদে পদে
জীবন তবুও মরুজয়ী দুর্বার।

উটমুখো-মন ছাড়ো ছাড়ো উটপাখি
মরুপারে শ্বেতকপোতেরা শোনো ডাকে,
অশোকে পলাশে শান্তির রাঙারাখী
গুঞ্জনগানে গাঁথে ওরা রাঙাশাখে।

হে মরু-বিহগ মরুবিজয়ের দিনে
ছাড়ো ছাড়ো ভীরু মদালস চোখবোজা!
সিংহেরা আসে অতর্কে পথ চিনে
প্রতিরোধ নয় বালুকায় মুখ গোঁজা।

২২শে জুন ১৯৫১

কেন স্বাক্ষর

বোবাকণ্ঠের গোঙানিতে শোনো বিদীর্ণ-হৃদয়ের
অতলান্তিক তরঙ্গরোলে ইতিহাস মানবের
মূকআদিমের অন্ধ-আকুতি উপনিষদের ওম্
রাগে ফেটেপড়া ধূমোদ্গারিত যন্ত্রশালার চোঙ
ক্ষুধিত ধূমল তপ্তরসনা আকাশের তারা চাটে
গুরুভারে মেরুদণ্ডী জীবন বেদনায় বুকে হাঁটে
প্রলয়ঙ্কর বিশ্বাসে তবু বেঁচে আছে ধুঁকে ধুঁকে
অযুত আঁখির নোনাজলে ভেজা মরুহাড় শুঁকে শুঁকে
জীবনের পথে পায়নিকো যারা শান্তির অনুকণা
অনাগত মহাস্বপ্নে যাদের অনলস দিন-গোনা
উদাস করুণ ফ্যালফ্যালে চোখে বিশ্বব্যথার শান্তি চায়
বঞ্চিত কোটি মানবাত্মারা বন্ধনহারা শান্তি চায়
ক্ষুধিত প্রাণেব অগীত গানের সুরে সুরে ওরা শান্তি চায়।

ওদের শান্তি গণ-মিনাবের আজানের আহ্বান
ওদের শান্তি-হুঙ্কার শুনে স্তব্ধ মেসিনগান
স্বর্গের বুকে লাথি মেরে ওরা ইন্দ্রের টুঁটি টিপে
বাজ কেড়ে নিয়ে রক্তপতাকা ওড়ায সপ্তদ্বীপে
ওরা পৃথিবীতে রণোন্মাদের অজেয শাস্তিদাতা
নখে ছিঁড়ে ফেলে শোষকের বিধি ব্রহ্মার কাঁচামাথা
ওদের ঘবের মায়েরা বধূরা ভীমা ভৈববীবেশে
শান্তিস্বপ্নে বাঁধেনি গ্রন্থী রুক্ষ ভ্রমরকেশে
থমকে দাঁড়ায় গোটা ইতিহাস স্তম্ভিত ভ্রূকুটিতে
ঝনঝন করে তাম্রশাসন প্রলয়-শর্বরীতে
নয়নে অগ্নি জননী ভগ্নি কন্যা বধূরা শান্তি চায
পালক-জনক-সন্তান-স্বামী-ভাই-বন্ধুরা শান্তি চায
গোটা পৃথিবীব ব্যথিত অধীর মুক্তিকামীবা শান্তি চায়।

থামাও তর্ক সূক্ষ্মকথার বিমূঢ় বুদ্ধিজীবি
ছুঁড়ে ফেলে দাও কুলটা-ভাষার কটিতে নিলাজ-নীবি
জনসভাতলে বেইমানী আর সহে না ওড়না-ঢাকা
সুরুচির শুচিগ্রস্ত মনেব বাক্য-বিলাস ফাঁকা,
আজো কি বোঝো না কী বিপুল দেনা জমেছে মাটিব বুকে
মারমুখো হয়ে উঠেছে মানুষ সূক্ষ্মকথায় রুখে
কাস্তের ধারে রৌদ্র ঠিকরে ঘামঝরা পৃথিবীতে
কিষাণের ব্যথা লুণ্ঠিত মৃত ধানের মঞ্জরীতে
শোষণের ঝড়ে শস্যের চিতা ধু ধু জ্বলে ফাঁকা মাঠ
অট্টহাসিতে হু হু ক'রে ওঠে বোঝে না শান্তিপাঠ

বিজ্ঞানীমন অমিয়-পঠন কিন্নরী-ভাবন বোঝে না হায়
কাস্তের ধার অসীম অপার মহাজাগতিক শান্তি চায়
ভূমিলক্ষ্মীর কোটি সন্তান কৃষাণী কৃষাণ শান্তি চায়।

যাদের কঠিন হ্যামারের ঘায়ে ইস্পাত হয় সিধে
রিপিটে লৌহ ছেঁদা করে যারা তুরপুন বিঁধে বিঁধে
ঘাটাপড়া কড়া ক্ষত-বিক্ষত ক্ষুধিত অঙ্গ জুড়ে
রোমে রোমে জ্বলে কলিজার জ্বালা গুমে গুমে পুড়ে পুড়ে
বোঝেনাকো তা'রা মদিরাক্ষরা মাধুরীর মায়ারসে
ভিজে ভিজে ভাবা আদুরে-[illegible]তে বসে বসে
কি যে লেখো আর কি যে কও তুমি বোঝে না সর্বহারা
মিহি মিহি হাড়-জ্বালানো হাসিতে প্রজ্ঞার পাঁয়তারা
শীলতার মধুমাখানো ব্যথার ঠোঁটফোলা অভিমান
বোঝে না মজুর কুলিকালোয়ার দুর্জয় বলবান
অমিত সাহসে কৌপীন কষে' ঋজুমাথা তুলে শান্তি চায়
দুর্গপ্রাসাদ ঝনঝন করে হাতকড়া বেড়ি শান্তি চায়
মহাভুবনের গণ-জীবনের শৃংখলছেঁড়া শান্তি চায়।

বোঝে না বিপুল মানব-সাহারা ঝর্ণার এস্রাজে
শৈল-সানুর প্রান্তশায়িনী কি সুর নিভৃতে বাজে
দাবানলে জ্বলা মানবারণ্য অযুত চক্ষে জ্বালা
কখন গাঁথবে গ্রাম্যপথের ঝরা-বকুলের মালা ?
তোমরাও হায় বোঝোনা মূর্খ প্রজ্ঞার পিরামিড,
বিলাসের তাপে শিল্প তোমার পুড়ে পুড়ে ঝামা ইট;
সব তত্ত্বের গোড়ার তত্ত্ব ভুলেছো ভ্রান্তিবশে
জীবন-যুদ্ধে লম্ফের বেগে ব্যাঙাচির ল্যাজ খসে
উন্নাসিকের কেতাবী খেতাব বুর্জোয়া ছলাকলা
শান্তির পথ কুয়াশায় ঢাকে পিশাচী অমঙ্গলা।
তিমির ভেদিয়া কুয়াসা-বিজয়ী সুস্থ মানুষ শান্তি চায়
জ্বলে-পুড়ে-মরা মানব-সাহারা স্নিগ্ধ শীতল শান্তি চায়
রজতশুভ্র শ্বেত-কপোত রৌদ্রোজ্বল শান্তি চায়।

কে দেবে তোমার বুদ্ধির দাম ? যে-বুদ্ধি নরঘাতী
মননশিল্পে দাসখত-লেখা সাধনার বজ্জাতি
সোজা কথা যদি সোজা করে লেখো সে লেখার কোনো দাম
দেবে না রক্তপিপাসুর দল, পশুর মনস্কাম
না যদি মেটাও ক্রুর হেঁয়ালিতে রচিয়া কুজ্ঝটিকা
ভুখা-গণমনে না যদি জ্বালাও বিকৃত যৌনশিখা

স্থির জেনো তবে রাসেলের মতো পাবে না পুরস্কার
এলিয়ট-মম-হাক্সলী-ফ্রয়েড শান দেয় তলোয়ার।
ইতিহাস-জোড়া প্রাণান্তকর সামন্ত-রণনীতি
অযুত বুকের শান্তি সুখের মর্মে জাগায় ভীতি
তাইতো ব্যথিত আর্ত মানুষ চিরজীবনের শান্তি চায়
মারণাস্ত্রের চিরনিষেধের বিপুল দাবীতে শান্তি চায়
সমসুখভোগী মুক্তমানব সমাজের চিরশান্তি চায়।

শান্তি-কপোত হীরকদীপ্র কাঁপায় শুভ্র ডানা
পালকে দীপ্ত উদয়াচলের প্রভাতী ললাট রাঙা
শিশিরে শিশিরে রক্তোৎপল-মণি-মাণিক্য জ্বলে
দানব-দর্প দলনে অযুত শান্তি-সেনারা চলে
পক্ষ-পতাকা বিস্তারি নভে কপোতেরা সারি সারি
মহাকাশ জুড়ে চলে উড়ে উড়ে। ভূতলে অস্ত্রধারী
যুদ্ধবাদীর রণহুংকার নির্জীব ভয়ে ভয়ে
জেগেছে বিশ্বমানব-গোষ্ঠী মাথা তুলে নির্ভয়ে
এটম বমের চেয়ে বলীয়ান একটি শিশুর লেখা
আঁকাবাঁকা নাম শান্তিপত্রে বিপ্লবী রাগরেখা
একটি মায়ের অশ্রু আথব অযুতে শিশুর শান্তি চায়
একটি বাপেব ঘামঝরা হাতে বাঁকা-স্বাক্ষর শান্তি চায়
একটি প্রাণেব রাঙা-স্বাক্ষর বিশ্বপ্রাণেব শান্তি চায়।

১লা মে ১৯৫০ —বিশ্বশান্তি

বিশ্বশান্তি

আমার শান্তি বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্যের নয়
আমার শান্তি বিনয়ী অস্ত্রধর
এমন শক্তি ত্রিভুবনে নেই জ্বালাবে আমার ঘর
আমার শান্তি অজেয় প্রহরী দুরন্ত দুর্জ্জয়।

আমার ঘরের আঙিনায় যদি দস্যুরা দেয় হানা
আমার আকাশে নব-শকুনেরা উড়ে আসে মেলি' ডানা,
তখনি আমার গ্রামজনপদে
শান্ত নিরীহ প্রাণসম্পদে
অযুত বাহুর মশালে মশালে আমাব শান্তিশিখা
তখনি জ্বালায় ভীম দাবানল কেঁপে ওঠে মৃত্তিকা।

আমার শান্তি-সাধনা-স্বর্গে মানুষের স্তবগান
আধি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যুবিজয়ী সুরে,
অমিতবীর্যে আমার শান্তি সহেনাকো অপমান
কত শৃঙ্খল কণ্ঠ কারাগার ভেঙেছে দৈত্যপুরে।
একদা আমার শান্তি-সাধনা মুক্তির হোমানলে
জেবলেছিল শিখা নভেম্বরের রক্তকমলদলে
স্ফুলিঙ্গ তা'র সাম্য সুরভিমাখা,
অযুত প্রাণের শান্তি-সাধনে
সর্বহারার নয়নে নয়নে
বিশ্ববিজয়ী মানবপ্রেমের শোণিতাঞ্জন আঁকা।

আমার শান্তি-পারাবত ওড়ে বিশ্বের মহাকাশে
রোমাঞ্চকর রজতশুভ্র পাখা
অবাধ অজেয় গতিবেগ তা'র মানুষের বিশ্বাসে
প্রেমচঞ্চল রাঙা দুই চোখে সোনালি চাঁদের রাকা।
আমার কপোত ভল্গার জলে মুক্তি-সিনান সারি'
রাঙাঠোঁটে বহি' শান্তিজলের ঝারি
ডানা ঝাপটিয়া সিঞ্চন করে বিংশশতাব্দীরে
রাইন-ডানুব-টাইবার-সীন নদনদী তীরে তীরে।

ইয়াক-ঘণ্টা নিনাদিত চীনাকৃষকের কৃষিভূমি
সয়াবীন ক্ষেত মুক্তধানের মঞ্জরীশিখা চুমি'
রক্ততুষারগিরি-বলয়িত মাঞ্চুরিয়ার পথে
আমার শান্তি-পারাবত ওড়ে পিকিঙের জয়রথে।
নবচেতনায় দীক্ষিত মহাচীনে
চল্লিশ কোটি বিজয়ী-বাহুর ক্ষুরধার সঙ্গীনে
ঝকমক করে শিব-সুন্দর-শান্তির বরাভয়
ঘোষণামুখর বিদেশী বণিক-দস্যুর পরাজয়!
প্রশান্ত মহাসাগরের কল্লোলে
শান্তিঘাতীর মৃত্যু-ঘোষণা গর্জিছে ভীমরোলে।

লোভী দানবের মহাসামরিক কলুষ দাহনে দগ্ধ
মূক যাতনায় বিপুলা পৃথ্বী অসহব্যথায় স্তব্ধ
কত সংসার মুছে গেছে ধরাতলে
সে করুণ স্মৃতি মর্মে মর্মে দিবসরাত্রি জবলে।
চতুর বণিক নির্জীব আজ রিক্ত পণ্যশালা
গঞ্জে বাজারে বন্দরে তা'র রক্ত-প্রদীপ জবালা,
দিকে দিকে তবু নিস্ফল ক্রোধে
হৃত-রাজ্যের গণ-প্রতিরোধে

অণুবজ্রের আস্ফালনের ঘন ঘন হাঁক ছাড়ে
'যুদ্ধং দেহি' 'যুদ্ধং দেহি' রক্তের সুপ্তি কাড়ে।

আমার শান্তি কেড়ে নেয় ওরা মালয়ে রবারবনে
ব্রহ্মে ইন্দোচীনের জমিতে শোণিত প্রস্রবণে
জন্মায় কোটি নারায়ণীসেনা অজেয় দুঃসাহসে
শ্বেত-বণিকের সাম্রাজ্যের স্বর্ণ-মুকুট খসে;
আমার শান্তি দেশদ্রোহীর ভিত্তিতে দেয় নাড়া
লোভী দানবের ভেঙে যায় শিরদাঁড়া!
তবুও ঘৃণ্য বণিকের দল
শান্তির নামে ভীত চঞ্চল
কোরিয়ার নীল আকাশে ক্ষিপ্ত শকুনের মতো ওড়ে
মাটির উষ্ণ বাষ্পের তাপে যান্ত্রিক-ডানা পোড়ে।
তবু ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে নির্লজ্জ
অসহায় নরনারীর মাংস নর-শকুনের ভোজ্য
বাঁকা ঠোঁটে লালা ঝরে
বিশ্বের নিরাপত্তার নামে ডাকে কর্কশ স্বরে।

আমার শান্তি হেসে ওঠে শুনি নিরাপত্তার কথা
ক্রুর বণিকের প্রচণ্ড রসিকতা!
লোলুপ রাজ্যলোভের মহিমা
লঙ্ঘন করে স্বদেশের সীমা
প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
ম্যাকার্থারের বাজে-পোড়া নেড়া নিষ্পনী-তরুশাখে।
পিছু পিছু আসে কাক-চিল-ফিঙে
ঘুঘু-হরিয়াল-গঙ্গাফড়িঙে
পাখনা নাচিয়ে লাফাতে লাফাতে এঁটোভোজী দুরাচার
ডলারের ফাঁদে ঠ্যাং-বাঁধা কদাকার।

আমার শান্তি ওয়াশিংটনের কংক্রিটে গাঁথা ভিত্তি নাড়ে
স্তব্ধ জাপান, ফরমোজা কাঁপে
মার্কিনী জলদস্যুর পাপে
চিয়াঙের মড়া দানো পেয়ে চাপে ম্যাকার্থারের দুষ্ট ঘাড়ে।
আমার শান্তি রাজ্যলোভীর বিশ্বাসঘাতী কলজে ফুঁড়ে
হারপুনে গেঁথা হাঙরের মতো
আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত
ডোবায় সাগরে। আমার শান্তি-শঙ্খনিনাদ এশিয়া জুড়ে।
দেবো না দেবো না মরতে দেবো না
সুখস্বপ্নের মায়াজালবোনা
নিরীহ শান্ত অযুতপ্রাণের দুর্জয় রক্ষণে
আমার শান্তি-পারাবত ওড়ে দীপ্ত কঠোরপণে।

হিরোসিমা নাগাসাকির লক্ষ মড়াপোড়া দুর্গন্ধে
নিঃশ্বাসরোধী বেদনায় মন বিক্ষোভে নিরানন্দে
আমার শান্তিকপোতের আবেদনে
স্বাক্ষর দেয় কোটি কোটি প্রাণ ব্যথিত ক্ষুব্ধ মনে।
আমার অযুত শান্তি-সাধক চাহেনি কখনো যুদ্ধ
তবু নয় তা'রা খৃষ্ট কিংবা শ্রীচৈতন্য বুদ্ধ
সুখে থাকবার বেঁচে থাকবার
সবাইকে নিয়ে দিন কাটাবার
স্বপ্নের মহ[illegible] কী যে সুগভীর মায়া
বুকে বুকে তা'র নন্দনবনে স্নিগ্ধ সবুজছায়া।

কপোতকূজনে মুখরিত শ্যাম পল্লবঘন শাখে
আমার শান্তি দ্বিপ্রাহরিক সূর্য-কিরণে ডাকে
নদ-নদী-গিরি-সমুদ্র-মরু লঙ্ঘি'
মহাভূগোলের নানা জাতি নানা দেশবাসী তা'র সঙ্গী,
আমার শান্তি দু'শ কোটি ঘরে ঘরে
দানবের সাথে শেষ-সংগ্রামে অমেয়শক্তি ধরে।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০ —বিশ্বশান্তি

নতুন বছর

বছর আসে বছর যায়
কী উদ্দাম ঝোড়ো-হাওয়ায়!
নেইকো লোভ হারানো-দিন ফিরে পাবার,
বহুজনের দুঃসময়ে প্রাণের ভয়ে সরে-যাবার।
স্বার্থ আর আত্মসুখ তুচ্ছ হোক
নেইকো আজ মিথ্যে ভয় মিথ্যে ক্ষোভ মিথ্যে শোক!
শস্য নেই শূন্য মাঠ, শূন্য তাই ক্ষেত খামার
কারখানায় মরে ভুখায় তন্তুবায় কর্মকার;
তবুও হায় উচ্চশির নির্বিকার শ্বেত-প্রাসাদ
বহুজনের সাদা হাড়ের পাষাণে গড়া আর্তনাদ।
ঝড়ের বেগে সর্ব পাপ মনস্তাপ যাক উড়ে
মরাবনের ঝরাপাতার জীর্ণস্তূপ যাক পুড়ে।

বছর আসে বছর যায়!
ধূলিধূসর আকাশে কালো মেঘ ঘনায়।
বিস্মৃতির চিতায় জ্বলে দুঃখকর মরাবছর
চৈত্র শেষ দুর্দিনের থাকে না লেশ কালো-আঁচড়।
বৈশাখের আকাশে ছোটে অন্ধমেঘ
ক্রমেই বাড়ে মত্ততায় ঝড়ের বেগ।
রুদ্রকাল বাজায় গাল বিপ্লবের ববম্ বম্
জলদঘটা পিঙ্গজটা নিমেষে ঢাকে সূর্য সোম;
ললাটে দ্রুত বিদ্যুতের লীলা-বিলাস
আগুনে গড়া লক্ষ নাগ আকাশে ছোটে ঊর্ধশ্বাস।

বছর আসে বছর যায়
পুরোনো যুগ পুরোনো দিন নবজীবন-মন্ত্র পায়;
আসে রঙিন চির নবীন উজ্জীবন
ত্রিকালজয়ী কালান্তরের বৈপ্লবিক উত্তরণ,
সোনার আকাশ সোনালি ক্ষেত সোনার দিন
দীপ্তিমান যৌবনের বৈভবের স্বপ্নলীন
কোটিজীবন কোটিমনন প্রার্থনায়
মৈত্রী চায় মুক্তি চায় চিরদিনের শান্তি চায়।

তামার তাব নির্বিকার আকাশচারী বজ্রকে
আলোর মীড় মূর্চ্ছনায় কাজে লাগায় ঝক্ ঝকে,
মেধায় ঘোরে বন্যারোধী হাইড্রলিক
যন্ত্রযুগ-চেতনা জাগে স্বর্গজয়ী কী নির্ভিক!
আসুক আহা আসুক দিন ডাইনামোর
লক্ষকোটি ভোমরা-ডাকা স্বপ্নঘোর!
জাগুক প্রেম সোনালি প্রেম হাসুক দিন কৌতুকে
আসুক বান নীল তুফান মরাগাঙের ভরাবুকে।
শস্যভরা সবুজ মাঠ সবুজ প্রাণ সবুজ বন
নব জীবন! নব জীবন!

৩রা বৈশাখ ১৩৪৬

মে-দিনের গান

আবার এসেছে পয়লা মে!
হিংস্র বোশেখীর রোদমাখা।
ঈশানীমেঘের সন্ধানে
কপালে ভ্রূকুটি আজো বাঁকা।

কোথা ঝড়, কোথা বিদ্যুতের—
খোলাতরোয়াল মেঘে মেঘে ?
ভুখা-কলিজায় বিপ্লবের
ঘুম নেই আজ উদ্বেগে।

সাতসমুদ্রে নোনাবাতাস
রোদের আগুনে তামাটে নীল,
কলের বাঁশীও রুদ্ধশ্বাস
পথে পথে আজ লাখো মিছিল।

শোষকে শাসকে মুখোমুখি
চেয়ে দ্যাখে শুধু অন্ধকার !
পুঁজির পাহাড় জ্বালামুখী
শোনে মিছিলের হুহুঙ্কার।

শহীদের ডাক পয়লা মে
দিক্‌দিগন্তে শোনায় আজ,
কত প্রাণ গেছে সংগ্রামে
উঠেছে বিশ্বে কত আওয়াজ !

আজ তা'রা সব একসুরে
ডাক দেয় সারাদুনিয়াকে,
যারা ছিল বীজ অঙ্কুরে
মহীরূহ তা'রা বৈশাখে।

আজ শুধু গান ঝড়ের গান
বুকের হাতুড়ী ওঠে নামে;
রাঙামেঘ আনে ক্ষ্যাপা ঈশান
আজ যে এসেছে পয়লা মে !

রোদে-পোড়া বুক থমথমে
লালপতাকায় ঝোড়ো-হাওয়া !
প্রাণ-সমুদ্রসঙ্গমে
মত্তদাবীর গান গাওয়া।

আওয়াজ তুলেছে পয়লা মে
দিতে হবে পুরো ঘামের দাম,
মরু-বিজয়ের সংগ্রামে
চলেছে মিছিল কী উদ্দাম !

দুর্গে প্রাসাদে মালিকানা
ঘুলঘুলি দিয়ে চেয়ে থাকে
সোনার পাত্রে দামী খানা
বিঘ্ন ঘটায় পরিপাকে।

ভুখা-মজদুরে রাঙাহাসি
হো হো হো শব্দে হেসে ওঠে,
সূর্যের বুকে রাশি রাশি
স্ফুলিঙ্গ-খসা ফুল ফোটে।

পথের মিছিলে ওঠে আওয়াজ
কেঁপে ওঠে যত পাকাবাড়ী,
মজুর-নায়িকা পরেছে আজ
রাঙা-আগুনের রাঙা-সাড়ী।

খোঁপায় রক্তজবা গুঁজে
মুখে বলে শুধু ইন্‌কিলাব!
ফাটল ধরায় গম্বুজে
ধৃতরাষ্ট্রের ওঠে বিলাপ!

১লা মে ১৯৫৫

প্রচার

[কবি মনীন্দ্র রায়কে]

দুঃখের বোঝা কাঁধে নিয়ে চলি দুঃখজয়ের পথে
ইতিহাস-জোড়া, অত্যাচারের-ঝলসানো-মনোরথে।
মাথা নিচু ক'রে নীরবে হয়েছি পার
কত না যুগের মহাকাব্যের পাষাণ সিংহদ্বার
ইন্দ্রপ্রস্থ দ্বারকা উজ্জয়িনী
শিলালিপি আর তাম্রশাসনে হাড়ে হাড়ে আজ চিনি
রোমাঞ্চকর বাঘনখে লেখা কী করুণ সে কাহিনী!

ভাব-গঙ্গার ঢেউ ভেঙে ভেঙে ছন্দ-কাঁপানো রাতে
যুগ-বিভূতির ভস্ম মেখেছি বিচিত্র সংঘাতে
পদে-পদান্তে ভঙ্গী-ভাবের দ্বন্দ্বে
হার মেনে মেনে জয়ের বাসনা প্রধূমিত নিরানন্দে;
কাল হ'তে কালে তিমির উত্তরণে
ইলাবৃত-কুরু-ভারতবর্ষে ছুটে চলি আনমনে
কবিত্ব তবু জাগেনি মনের ছায়াছবি অংকনে।

গীতোক্ত পরমার্থে মনন কলুষ রক্তমাখা
বাইবেলে পিতা শোকে বিহ্বল কোরাণের চাঁদ বাঁকা
বিবশ বুদ্ধ শিলীভূত মাঠে ঘাটে
কাল-বিহঙ্গ মোছে ইতিহাস নিদারুণ পাখ্‌সাটে।
যুগাবর্তের নিবিড় অন্ধকার
দীর্ঘ রজনী বুকে নিয়ে শুনি গাণ্ডীবে টংকার
সূচীভূমি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত শৃংখল-ঝংকার!

লেখনীতে রাঙারক্ত ঝরাই প্রচারের অপবাদে
কালিঝুলি মেখে হীরা খুঁজি তবু কয়লাখনির খাদে
পাঁজর-জ্বালানো অসহ জ্বালায় জ্বলি
নীল-অঙ্গার-বাষ্পশিখার আকাশে বুলাই তুলি
কৃষ্ণমেঘের বুকচেরা রজনীতে
রেখায় রেখায় প্রলয়ের আলো ফুটে ওঠে বিজলীতে
মহান প্রচারে গণ-মানসের মুক্তির সঙ্গীতে!

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

ঈশ্বর

ঈশ্বর তোমাকে আমি প্রথম দেখেছি ক্রুশকাঠে
দেখেছি তোমার মৃত্যু রক্তমাখা ভক্তের ললাটে
দেখেছি ফাঁসির মঞ্চে ঈশ্বব তোমায়
দেখেছি অন্তিম তমসায়
ক্রৌঞ্চবধূবিলাপের তীব্র-যাতনায়
হে ঈশ্বর দেখেছি তোমায়।
মৃতাজননীর বুকে তুহিন শীতল স্তন্যপানে
শ্বাসরুদ্ধ শিশুরূপে করাল শ্মশানে
তোমায় দেখেছি হে ঈশ্বর
করোটি-কঠিন পথে কঙ্কালের জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

ছিন্ন ভিন্ন হৃদ্‌পিণ্ডের সূর্যাস্তের কৃষ্ণচূড়া ফোটে
শুষ্ক-জীর্ণ-রিক্তশাখে শকুনের রক্তমাখা ঠোঁটে
সর্বস্বান্ত হে ঈশ্বর তোমার অন্তিম যন্ত্রণায়
দেখেছি প্রলয়-পুষ্পে স্তব্ধ হাহাকার
শুনেছি শুনেছি হে ঈশ্বর
সূর্যের শোণিতস্রোতে কল্লোলিত মহামন্বন্তর।

ঘরে ঘরে হত্যাক্লিন্ন আদিমপশুর দন্তাঘাতে
ধর্মান্ধের আত্মঘাতী ক্লীব পদপাতে

রক্তাক্ত শ্মশানে আর মৃত্তিকার বিদীর্ণ কবরে
শুনেছি তোমার আর্তস্বরে
দেবত্বের শেষশয্যা পশুত্বের করাল-চিতায়
সর্বহারা মানবের আকুল অধীর যন্ত্রণায়
দেখেছি দারিদ্র্যক্লিষ্ট বিষণ্ণ বর্বর
তোমায় করেছে হত্যা নিষ্ঠুর নখরে হে ঈশ্বর।

কৃষিতীর্থ ভারতের শস্যকীর্ণ অবারিত মাঠে
সর্বহারা রিক্ত যা'রা আজো বুকে হাঁটে
তা'দের পঞ্জরতলে তোমার অনন্ত অনশন
প্রত্যহের অভিশাপে হে ঈশ্বর করেছি দর্শন।
চুঁয়ে চুঁয়ে রক্তঝরা শ্রমশিল্পশালা
অতিলুব্ধ বণ্চকের শোষণের চিতাচুল্লী জ্বালা
হাপরের দীর্ঘশ্বাসে চিমনীর ধোঁয়ায়
গগনের প্রতিবিম্বে মেঘবর্ণ দেখেছি তোমায়
শ্রমক্লান্ত রক্তমুখ অগ্নিদগ্ধ-কাযা
মানচিত্রে প্রলম্বিত অতিকায বিপ্লবের ছায়া
দেখেছি তোমায় হে ঈশ্বর
অপমানে ক্রুদ্ধমুখ বহ্নিমান প্রখর নখর।

[illegible]৬

শেষ-উইল

বুড়ো ভগবান নুযে নুয়ে চলে ভুল বকে আর গাল দেয়,
বস্তা-পচানো কাশ্মিরী শাল পাটে পাটে পোকাকাটা
শিথিল অঙ্গে জড়ায।
সাদা ধবধবে বাজকীয পাকাদাড়ী
লাল হয়ে গেছে কড়া তামাকেব ধোঁয়ায।

বুড়ো ভগবান কুঁজো হযে চলে পিঠে উইলের বস্তা!
গোলমেলে এই দুনিযাব সম্পত্তি
কাকে দিয়ে যাবে? ভাবনায সারা মাথাটায় টাক ভর্তি।
ভুল বকে আর অভিশাপ দেয়
পথের দুদিকে কেবলি তাকায়
এত বড় সম্পত্তি,
কা'কে দিয়ে যাবে?
বারে বারে তাই পুরোনো উইল পালটায়।

বুড়ো ভগবান নুয়ে নুয়ে চলে দু'দিকে নোংরা বস্তি,
হঠাৎ একটা ধুলোকাদামাখা ন্যাংটা ছেলে
বুড়োর সামনে ছুটে এসে বলেঃ
ও বুড়ো তোমার কি আছে পিঠের বস্তায়?
ভগবান মুখ খিঁচিয়ে ওঠে
ভুল বকে আর গাল দেয়,
ন্যাংটা ছেলেটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বস্তির দিকে ছোটে!
বুড়ো ভগবান হেবো স্যাকরার দোকানে এসে
ঝুলি থেকে নিয়ে সনাতন হুঁকো কল্কে,
তামাক ধরায় মাঝে মাঝে ওঠে কেসে;
"আহা কচিমুখ ন্যাংটা ছেলেটা— ? দুত্তোর"
ব'লে বুড়ো ভগবান আবার চলে।

বুড়ো ভগবান খুক্ খুক্ কাসে ক্ষয়কাসে বুক ঝাঁঝরা,
ফুটপাতে বসে দম নেয় আর কেঁপে ওঠে কোটিবছরের হাড়পাঁজরা!
দম নিয়ে ফের বিড়বিড় বকে সংস্কৃত-চীনে-হিব্রু,
বোঝা দায়! বোকা মানুষ তাকায়,
বুড়ো ভগবান মহারেগে যায়
রক্তের চাপ বেড়ে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে তবু গাল দেয়।
বুড়ো ভগবান বড় অসহায়, ঘোলাচোখে চায়,
দু'দিকে নোংরা বস্তি!
ছানি-পড়া চোখে সন্ধ্যা ঘনায়
কাশ্মিরী শাল ধুলোতে লুটায়
কুলী কালোয়ার ছোটলোক যত জড়ো হয় আসেপাশে,
ধরাধরি ক'রে বুড়োকে শোয়ায় সাবধানে ভাঙাখাটে।

মুদ্দফরাস মুখে জল দেয়
হাবুডোম টাকে বরফ বুলায়
করিম কামার, জোসেক চামার বলে, "ঘাবড়ো না বুড়ো!"
মিছে সান্ত্বনা বুড়ো মরে যায়
কুলী বস্তির মেটে-আঙিনায়
ভোর হয়ে আসে ভাঙা খাটিয়ার ধারে—,
আসেপাশে লোক ভর্তি!
বস্তির যতো ধুলোকাদামাখা ন্যাংটা ছেলের নামে
বুড়ো ভগবান লিখে দিয়ে যান নতুন উইলে তা'র,
গোলমেলে এই দুনিয়ার সম্পত্তি!

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ —দ্বিপ্রহর

জনগণেশায়

হে জনগণেশ, যাহারা তোমার বন্দনা-গান করে
তা'রা কি দেখেছে সিঁদুর-মাখানো চকচকে তব ভুঁড়ি ?
বাজারে ব্যাঙ্কে বন্দরে হাটে উচ্চ-আসন 'পরে
গণ-শোণিতের চন্দন মেখে রয়েছো সমাজ জুড়ি !

হ্রেষারব করে হে গণ-নায়ক তব সুবর্ণরথে,
ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ চতুরঙ্গের ঘোড়া,
জনগণেশায় গান গেয়ে যারা ঘুরিতেছে পথে পথে,
তাদেরি কঠিন চামড়ায় তব রথের রশ্মি মোড়া।

'মিলে' 'মিলে' উঠে অমিলের ধোঁয়া বিষবাষ্পের মতো
কত কোটি কোটি কঙ্কালসার দেহদীপাধার হ'তে,
হে গণেশ তব আরতির লাগি ধূপ জ্বলে যায় কত
তোমারি পূজার পদ্ম ফুটিছে তপ্তশোণিতস্রোতে।

ইঁদুরের মতো বাহনেরা তব সিঁদুর জোগায় নিতি
নিঃসাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ পথ সমাজভিত্তি তলে,
সের-বাটখারা তুলাদণ্ডের করতালে উঠে গীতি
মহাজন তব মহিমা প্রচারে গদ গদ আঁখি জলে।

চাদরে ঢাকিয়া সিঁদুর-মাখানো চকচকে তব ভুঁড়ি
হে গণেশ শুধু শুণ্ড-শোভিত মুণ্ডটি কেন সাদা ?
মাঝে মাঝে কেন ডিগবাজী খাও হর্ষেতে দিয়ে তুড়ি
যুগে যুগে যারা বঞ্চিত জীব তাহাদের লাগে ধাঁধা !

অর্থশাস্ত্র নাম দিয়ে যারা রচিছে গণেশায়ন
শ্বেতমুণ্ডের বরণে তোমার সিদ্ধির ধ্বজা তুলে,
মুখেতে বিশ্বমৈত্রীর বাণী প্রচারিছে মহাজন
শ্বেতমুণ্ডও লাল হয়ে যায় এ কথা গিয়াছে ভুলে।

বহু অভাবের উৎপীড়নের কঠিন পাথরে চাপা
হে জনগণেশ মরিছে পঙ্গু তোমার বেদিকাতলে,
সমাজভিত্তি ইঁদুরের দল কাটিয়া করেছে ফাঁপা
মাঝে মাঝে তাই ধ্বস্ ভেঙে ভেঙে পৃথিবীর মাটি টলে।

১১ই আগস্ট ১৯৩৫ —দক্ষিণায়ন

বণিক

সোনার স্বপন দেখি রাশি রাশি বিশুদ্ধ সোনার।
গহন সুড়ঙ্গ পথে ভূগর্ভের কালো অন্ধকারে
লোলুপ রসনা মেলি পান করি তীব্র হলাহল
অগ্নিবর্ণ গলিত সোনার। স্বপ্নের আকাশ জুড়ে
কোটি কোটি স্বর্ণকীট পক্ষধর-নক্ষত্রের মতো
উড়ে চলে অফুরন্ত আদিঅন্তহীন। বসে থাকি
রাজকীয় আদর্শের দম্ভের ময়ূর-সিংহাসনে
মূর্খ অন্ধ শ্রমজীবী দুর্ভাগার কঙ্কাল-মর্মরে
সমাধি রচনা করি স্বপ্ন-তাজ প্রেমের বিলাস
মানবিক প্রেম নয়, আত্মঘাতী অহংবাদী প্রেম
আভিজাত্যে জগতের অন্যতম মসৃণ বিস্ময়।
নরমেধযজ্ঞভূমে রুধিরাক্ত পৃথিবীতে বসি
রত্নাকর স্বর্ণসিন্ধু নিঃশেষে আকণ্ঠ করি পান
দানবিক অট্টহাস্যে। বেড়ে যায় তৃপ্তিহীন তৃষা।
স্বপ্ন দেখি জ্যোতির্ময় রাশি রাশি বিশুদ্ধ সোনার,
সংখ্যাহীন স্বর্ণকীট পক্ষধর-নক্ষত্রের মতো
জীবন আচ্ছন্ন করে। নির্মম কামনা-খড়্গ হানি
ধরিত্রীর রক্তবহা নাড়ী ছিঁড়ে সমাজ সংসার
হেলায নিক্ষেপ করি তপ্ততোয়া বৈতরণীতলে
পৈশাচিক মহোল্লাসে। হিরন্ময় পাষাণ-আত্মার
আজন্মপূজারী আমি মদোন্মত্ত বণিক দুর্বার।

৬ই মার্চ ১৯৩৯ —দক্ষিণায়ন

সব্যসাচী

গাণ্ডীবে তব টঙ্কার কই মহাভারতের সব্যসাচি ?
বেদব্যাসের স্তবস্তুতিগান শূন্যে বুঝিবা মিশিয়া যায় !
বাসবদত্ত অক্ষয়তূণে লোকক্ষয়কর শায়ক কোথা ?
কুরুদের চতুরঙ্গবাহিনী পৃথিবীর মাটি চষিছে হায়।
পথেপ্রান্তরে তৃণদল কাঁপে মৃত্যুর পদশব্দ শুনে
বিপ্রলব্ধা স্রোতস্বিনীর ক্ষীণজলরেখা শ্যাওলা-ঢাকা,
দুর্যোধনের দুর্জয়পণ ভাঙেনি দ্বৈপায়নের তীরে
চাঁদের ললাটে জাগে কলঙ্ক তোমারি বংশতিলক আঁকা।

বৈশ্যজগতে আসিবে না জানি ওগো দ্বাপরের সব্যসাচি,
নরতন্ত্রের ধারা খুঁজি তাই রথচূড়ে তব কপিধ্বজে,
কুটিলেশ্বর কৃষ্ণে স্মরিয়া স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বাঁচি
নিঃস্ব আত্মা বিশ্ব-বিধান ভক্তিতে আর ভয়েতে ভজে।
ভজহরি-ভজ কৃষ্ণ-ভজ হে! খোলে খোলে পড়ে লক্ষ চাঁটি,
কদাচারী বুনো বর্বর বলি সাঁওতাল যত তীরন্দাজে,
উটমুখো হয়ে পথ চলি, ভুলে কবে যে গর্ত রেখেছি কাটি'
স্বখাদ কবরে ডুবে যাই মরে, মরে বেঁচে যাই অনেক লাজে।
গাণ্ডীবে তব টঙ্কার কই মহাভারতের সব্যসাচি?
কত সভ্যতা গেছে রসাতলে আজো তবু মোরা বাঁচিয়া আছি!

২৪শে মে ১৯৩১ —দক্ষিণায়ন

পেঙ্গুইন

যে দেশে রসিক নেই রসবস্তু দুর্বোধ্য জটিল
পেঙ্গুইন মানুষেরা পঙ্গু যেথা বৈদিক বিলাপে,
কাব্যের আকাশে যেথা স্বর্ণচঞ্চু শ্বেতশঙ্খচিল
স্বাপ্নিক সঙ্গীতে মত্ত অর্থহীন মায়বী কলাপে।
বৃথা রোষে রুদ্রগান বায়বীয়-খড়্গ আস্ফালন
নিরিন্দ্রিয় আয়ানের পঙ্গু প্রেম রক্তশূন্যতায়
প্রজ্ঞার বল্মীক ঢাকা জম্বুদ্বীপ গণজাগরণ
ধ্বংস করে অহমের নির্বিকল্প নিষ্কাম চিতায়।

সে দেশে তথাপি মোরা মন্দকবিযশঃপ্রার্থীদল
তত্ত্বময় কাব্য রচি জনতার সাহিত্য-বিদ্বেষী
বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভায় ভূতাবিষ্ট-চেতনা-সম্বল
দুঃস্বপ্নে জড়াই বুকে উর্বশী মেনকা মিশ্রকেশী।
আমাদের মৃত্যু তাই পাঠকের পেঙ্গুইন বুকে
শ্যামের বংশীর রন্ধ্রে শবাকাব শিবশিঙ্গা ফুঁকে।

১০ই আগস্ট ১৯৩৯

বৈপরীত্য

নরকেরে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি পাপ আর কদর্য কুৎসিত যাহা সিছু
তবু সেই নবকের বন্ধহীন অন্ধকারে জ্বলে কালোকামনার শিখা!
ইচ্ছার সমষ্টিগুলি দেয়ালি-পোকার মতো নিত্য ধায় সে শিখার পিছু
অনাত্ম সে তমসার অজ্ঞেয় রহস্যগর্ভে যেথা জ্বলে ভ্রান্তি-মরীচিকা।

সিন্ধুর উন্মত্ত ঢেউয়ে আর্তনাদে কেঁদে ডাঠ তবু রাচ সাগরের গান,
গ্রহশূন্য অম্বরের নিষ্ঠুরতা হেরি কাঁপে দিকভ্রষ্ট জীবনের তরী,
আবার সিন্ধুর কূলে, নীলাম্বুর নৃত্যতালে মুগ্ধ হই ভাবমগ্ন প্রাণ
এ বড় বিস্ময় লাগে নরকে পাঠাই যারে তাহারেই পুনঃ বক্ষে ধরি ?

শ্যামরূপে হে মরণ তোমারে বরণ করি, ছন্দে রচি মধুর বন্দনা,
হায় বন্ধু তুমি যবে দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে কর আসি অস্তিত্ব চর্বণ,
তোমার সে পিরিতির চুম্বনে চীৎকার করি, দন্তাঘাতে অসহ্য যন্ত্রণা
সহি আর কহি শ্যাম পিরিতির মেঘ-জটা দাও সখা দাও বিসর্জন।
বিচিত্র চরিত্র এই স্বপ্নজীবী মানুষের, লক্ষ্য তা'র স্থির নাহি কিছু,
ইচ্ছার সমষ্টিগুলি দেয়ালি-পোকার মতো ধায় কাম-বহ্নিশিখা পিছু।

২রা অক্টোবর ১৯৩৮ —দক্ষিণায়ন

ডার্বিটিকিট

ডার্বি'র টিকিট কিনে হরিবাবু প্রতি বছরেই
কল্পনায় ধনী হয় লটারীর কল্পিত টাকায়
প্রথম প্রাইজ তবু কান ঘেঁষে প্রত্যেক বারেই
ফস্‌কে যায় হবিবাবু তথাপি টিকিট কিনে যায়।
জুয়াড়ী ইংরেজদের প্রাণে কোনো দয়ামায়া নেই
লক্ষ লক্ষ ভাগ্যদাস মানুষের রক্ত শুষে খায়
তারি মধ্যে গুটিকয় ভাগ্যধর প্রাইজ পাবেই
হরিবাবু বিগলিত ডার্বি-টিকিটের সততায়।

বছরে দু'একজন পৃথিবীতে হয় যদি ধনী
বিলিতি ঘোড়ার পুণ্যে জুয়ার অপার মহিমায়
লক্ষ বর্ষে লক্ষ জন লটারীব পাবে স্পর্শমণি
অহো সেকী অসম্ভব! হরিবাবু বোঝেনাকো হায়!
হরিবাবু ক্রমাগত কিনে যায় ডার্বি'র টিকিট
ক্রমশঃ বার্ধক্য আসে মিশে যায় পেট আর পিট!

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

বঙ্গোপসাগর কূলে

আদিগন্ত ঘোলাজল তটরেখাহীন
শূন্যতায় সূর্য ডোবে, ধূ ধূ অবকাশ
সাগরসঙ্গমে সন্ধ্যা গম্ভীর আকাশ
গঙ্গায় বঙ্গোপকূলে অতল গহীন

স্বপ্ন কাঁপে। অরণ্যের প্রান্তে ওড়ে হাঁস
ঘনায় তামসী প্রেম, মর্মর বাতাস
ঝিল্লিমন্দ্র অন্ধকারে কাঁপে রিমঝিম্
বাংলার মমতাময়ী বেদনা অসীম।

একা চলি দূরে দেশে সাথে নেই তুমি
দুঃসহ নির্জন গঙ্গা অকুল অগাধ
ঘোলাটে তরঙ্গে কাঁপে রিক্ত মায়াবাদ
বাঘের গর্জনে কাঁপে দূর বনভূমি
স্তিমিত সূর্যের রক্ত সারা গায়ে মেখে
কৃষ্ণসার রাত্রি নামে অতন্দ্র উদ্বেগে।

১১ই মার্চ ১৯৪১

রুদ্র-মল্লার

আকাশে তারা নেই বাতাসে কান্না
শুকনো মরানদী নিশির ডাক শোনে
দু-তীরে বালুচর। জনতা নিরাশায়
ঘুরছে পথে পথে। রুপালী গঙ্গায়
ঝড়ের জটাজালে শিবের সংগা
হাসছে খল খল। আকালে খড়কাটা
চাষীর ফাটাবুকে ঘোলাটে জ্যোৎস্না।

হাড়ের ঢেউ ওঠে বাতাসে সারারাত
ক্ষুধার জঞ্জালে। ডাকে না পাপিয়া
শৃগাল মড়া সোঁকে। শ্মশানে হরিবোল
কবরে আল্লা। চাতক-চাতকিনী
ফটিকজল খোঁজে আকুল-পিপাসায়।
জ্বলছে সারারাত জ্বলছে সারাদিন
রক্তচিতানল, ধোঁয়ায় তারা ঢাকা।

তোমায় ডেকেছি মা, নিবিড় তমসায়
ডেকেছি কতবার রাত্রি মুছে দাও!

দিনের আলো যে মা দেখিনি কতকাল
সে কথা মনে নেই। প্রাণের ঢেউ তুলে
জোয়ারে উতরোল তুমি কি ভাসাবেনা
শুকনো মরানদী? পদ্মা-মেঘনার
বিপুল বন্যার তাই তো রচি গান
তাইতো জেগে আছি নিবিড় তমসায়।
হঠাৎ আধোঘুমে শুনছি কোলাহল
সিন্ধু-মন্থনে অমৃত-হলাহল
উঠছে একই সাথে বিপুল সংঘাতে
শান্তি-সাধনায় মুক্তি-শতদল।
মেঘের ঘনঘটা কাঁপছে শিবজটা
রুদ্র-মল্লারে বিজলী চমকায়!
লক্ষকোটি বুকে ডমরু ডিমি ডিমি
হাসছে কঙ্কাল। থেমেছে কান্না।
শুনছি নিশিদিন পিনাকে টঙ্কার
রাত্রি মুছে দাও বাংলা মা আমার!

১৫ই আগস্ট ১৯৫৩

সোনার বাংলা

[বিশ্বভূষণ দাশগুপ্ত সুহৃদ্বরেষু]

এখানে চাঁদের আলো আসে আর যায়,
রেখামাত্র পড়েনাকো মনের খাতায়।
শুক্ল আর কৃষ্ণপক্ষ মেলি দুই ডানা
ক্ষুধার বিহঙ্গ ওড়ে লক্ষ্য নেই জানা,
ঠোঁটে রক্ত, পালকের অশান্ত ঝাপটে
মুছে দেয় চন্দ্রলেখা আকাশের পটে।
এখানে জ্যোৎস্নার আলো নিত্য উপবাসী
মলয় বহিলে ওঠে খুক খুক কাসি
অনাহারে ক্ষয়কাসে প্রেয়সীর বুকে
বুভুক্ষু যৌবন আজো মরে ধুঁকে ধুঁকে
শিথিল মুঠিতে কাঁপে গোলাপের বোঁটা
চাঁদের ললাটে তাই কলঙ্কের ফোঁটা।

জীবন ও জীবিকার প্রচণ্ড সংঘাতে
জ্যোৎস্না ঝরে চন্দ্রমার পীত-রক্তপাতে
আদিগন্ত জলাভূমি মুক্তির আলেয়া
এ-কূলে ও-কূলে নেই তরণীর খেয়া,

গগন-ললাটে জ্বলে নক্ষত্রের শিখা
ধ্রুবপথ কত দূরে ? ধূ ধূ মরীচিকা !

আশা আছে অনাগত জীবনের আশা
ভাষা আছে অকথিত মননের ভাষা
সুর আছে রুদ্ধবুকে অগীত গানের
প্রেম আছে অভিমানে আহত প্রাণের
শক্তি আছে অফুরন্ত কর্ম-সাধনার
তবু কেন অপঘাত স্বপ্ন-কামনার ?
তুমি জানো আমি জানি সকলেই জানে
চাঁদ সত্য তবু জ্যোৎস্না কাঁদে অপমানে,
রুক্ষমাঠে কৃষাণের কঙ্কালের জ্বালা
মজুরের লাঞ্ছনায় কাঁদে যন্ত্রশালা
বিত্তহীন মধ্যবিত্ত স্বপ্নে দিশাহারা,
প্রতিবাদে চন্দ্রমার বহে রক্তধারা।

১৪ই মে ১৯৪৬

রবীন্দ্রনাথের তাজমহল

হে কবি তোমার তাজমহল,
কালের কপোলে সমুজ্জ্বল
অমরকীর্তি সম্রাটের
প্রেম দিয়ে গড়া মমতাজের
স্ফটিক শুভ্র শ্বেতপাথর
স্বপ্নসৌধ কী ভাস্বর !
তোমার স্বপ্ন-কুঞ্জবনে
দখিনা-মন্ত্র গুঞ্জরণে
কোন্ মালঞ্চে শ্যামাঞ্চল
ছড়ায় ধূলায় ছিন্নদল ?

অন্ধকালের সময় নাই
আবার শিশিররাত্রে তাই
আবার ফোটায় কুন্দরাজি
হেমন্তিকার অশ্রুসাজি !
হায় রে হৃদয় বারে বারে
দিনের রাতের পারাপারে

সব সঞ্চয় ফেলে রেখে
যেতে হয় জলছবি এ'কে।
তাই বাদশাহ শাহজাহান
প্রেমের মূল্য করিতে দান
গড়েছিল নাকি তাজমহল
কালের কপোলে সমুজ্জবল ?

তাজমহলের রূপ দেখে
যে-ছবি কাব্যে গেলে এ'কে
পাঠ করি আর ভাবি একা
এই কি তোমার সব দেখা ?
জ্যোৎস্নারাতের প্রেয়সীরে
আদরে যে নামে ধীরে ধীরে
ডাকতো স্বয়ং শাহজাহান
সেই নামে নাকি ভরেছে কান !
স্তব্ধ বধির অনন্তের
স্বপ্নসৌধ সম্রাটের ?

হে কবি তোমায় প্রশ্ন আজ
সত্য কি তব স্বপ্ন-তাজ
গড়েছিল নিজে শাহজাহান
প্রেমের মূল্য করিতে দান ?
প্রেম আগে নাকি শ্রম আগে
অজ্ঞ-মনের ভ্রম জাগে,
যারা গড়েছিল তাজমহল
বুকের রক্ত করিয়া জল
পাথরের 'পর গে'থে পাথর
ভুলেও হয়নি ঘুমে কাতর,
সারাদিন সারারাত জেগে
যারা গড়েছিল উদ্বেগে
কে তা'দের মনে রেখেছে আজ
যাদের কীর্তি স্বপ্নতাজ ?

তা'রা কারিগর দীন শ্রমিক
গম্বুজে উঠে কী নির্ভিক
গড়েছিল এই তাজমহল
ঘষে মেজে মেজে কী উজ্জবল !
হায় কবি তুমি তাদের নাম
ভুলে গেলে কেন ? দিলে না দাম ?

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩২

ভারতের মুক্তি

ভারতের মুক্তি নেই তপোবনে আশ্রমে মিশনে
মুক্তি নেই অর্থহীন আত্মার গহনে।
কমণ্ডলু কৌপীন সম্বল
ব্রহ্মবাদী যন্ত্রনার জটিল জঙ্গল
ভারতের কাম্য নয়, কঠিন ল্যাঙোটে
অবরুদ্ধ যৌবনের সর্বাঙ্গে বিষের কাঁটা ফোটে।

শরীরের অন্ধকার নবদ্বার পথে
নিষ্কাম আত্মার মনোরথে
ধ্যানের দুর্বোধ্য পরিক্রমা
মায়াবাদী রিক্ততায় ঢাকে মৃত্যু-রজনীর অমা,
দুঃসহ নির্বেদ যন্ত্রনার
ঢাকে দীপ্তি জৈবচেতনার।
বৃক্ষতলে জ্ঞানার্জন কী যে প্রাণান্তক
তপোবনে মুক্তি নেই ব্রহ্মচর্য জানি নিরর্থক।

দারিদ্র্য ভূষণ হোক, মন্ত্র হোক ঈশ্বরের কথা
অসহ্য এ উপদেশ প্রবীণের ক্রূর প্রগল্‌ভতা
শুনে শুনে পচে গেছে কান
জ্ঞানবৃদ্ধ ভারতের এ যে অপমান
শতাব্দীর অগ্রগতি পথে
বস্তুবাদী বিজ্ঞানের প্রবুদ্ধ জগতে।

ঋষিত্বের নেই প্রয়োজন
বিবাট ঐশ্বর্যস্বপ্ন বুকে নিযে ক্ষুব্ধ জনগণ
যন্ত্রে শস্যে নভঃস্পর্শী মর্মব-প্রাসাদে
নাগবিক সমৃদ্ধির সমভোগবাদে
রোমাঞ্চিত ভাবত-প্রগতি
একমাত্র লক্ষ্য তা'র শান্তিকামী মানব-সংহতি।

সুন্দরেব শ্রেষ্ঠ এ সাধনা
যুগে যুগে ভবিষ্যের স্বপ্নজালবোনা
সিদ্ধ হবে একদিন শৃঙখলমুক্তির যুদ্ধশেষে
ঐশ্বর্যের উপাসক বেশে।
তপোবনে মুক্তি নেই ল্যাঙোটে কৌপীনে প্রাণায়ামে
মুক্তি নেই ব্রহ্মলোকে কৈলাসে বৈকুণ্ঠে স্বর্গধামে।

২৮শে মে ১৯৩৭

নিরুক্ত

পা নেই অথচ চলে মুখ নেই তবু বলে ভূতলে বা রসাতলে
পাবে না দেখা।
মাথা নেই মাথাব্যথা ভাষাহীন জটিলতা অনাগত প্রাচীনতা
অকূলে একা॥

যেভাবে যেখানে ডাকো মাঠে বা সাগরে হাঁকো ফুল দাও লাখো লাখো
কাছে বা দূরে।
গগনের নেই কায়া পবনের নেই ছায়া স্মরণের মিছে মায়া
গানের সুরে॥

কোনো ব্যাধি নেই যার ওষুধে কি হবে তার? মিছামিছি হাহাকার
কাঁদুনি মিছে।
নেই কোনো মন্তর তবু ভীরু অন্তর ছুটিছে নিরন্তর
আলেয়া পিছে॥

কান নেই শুনিবে কে? সোজা মন যায় বেঁকে ক্ষেপে ওঠে থেকে থেকে
সুস্থ দেহ।
কত জ্ঞানী হ'লো বোকা কত বুড়ো হ'লো খোকা প্রাণের আদিম ধোঁকা
ভোলেনি কেহ॥

নেই জয়-পরাজয় অভিশাপ-বরাভয় বৃথা খোঁজো ধরাময়
ক্ষ্যাপার মতো।
লিখেছে যে দেখেনি সে, শুনেছে যে বোঝেনি সে, ইহা উহা তাহা মিশে
কাহিনী কত॥

১৮ই জানুয়ারী ১৯৩৪

—দক্ষিণারঞ্জন

কাশ্যপেয়ং

ভারতের ইতিহাস আশ্চর্য অদ্ভুত
ব্রহ্মবাদী সাধনার মহাপীঠস্থান
তর্পণের জল হেথা পান করে ভূত
অরণ্যে পর্বতে যত অনার্যের স্থান।
আর্যপিতা কশ্যপের যত নাতিপুত
দেশের সম্পদ যত তাঁরা শুধু পান
কোষাগারে ধনরত্ন রাখেন মজুত
সগর্বে করেন কভু খেয়ালের দান।

রাজারাই এ-দেশের পুরুষপ্রধান
যুদ্ধ হ'লে প্রজা মরে অযুত নিযুত
রাজার আদেশে ম'লে স্বর্গে ঠাঁই পান
ঈশ্বর-দর্শন হয় কুশাগ্রে-বিদ্যুৎ!
নরকে পচিয়া মরে অনার্যের প্রাণ
মৃত্যুহীন কশ্যপের যত নাতিপুত।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

প্রাচীন ভারতের প্রতি

হে ভারত! অতীতের তপোবন থেকে
তুমি যদি ফিরে এসে দাঁড়াও আবার
জটাজুটবিলম্বিত বার বার ডেকে
এ-যুগের কোনো সাড়া পাবোনাকো আর!
তপস্বীর বেশে যদি ছাইভস্ম মেখে
শোনাও তুমুলনাদে প্রণব ওঙ্কার
তা হ'লে তোমায় দেবো রঙ্গালয়ে রেখে
বুড়োদের করতালি পাবে অনিবার।
শেষে যদি মরে যাও স্মৃতিসভা ডেকে
শোনাবে মাহাত্ম্য তব সভাপতিগণ
হে প্রাচীন! মূর্তি তব কৃষ্ণবাসে ঢেকে
দেশভক্ত-প্রবীণেরা করিবে রোদন।
তা'র চেয়ে হে ভারত ফিরোনাকো আর
অতীতের বুকে হোক সমাধি তোমার।

২০শে মার্চ ১৯৩৩

সামন্ত-স্বপ্ন

মান্ধাতার যুগে সৃষ্টি প্রাসাদের গলিত পঞ্জরে
নির্বোধ সামন্ত-স্বপ্নবিলাসী হায়রে
উচ্চাশার দুরাশার সূত্র খুঁজে মরে!
নিষ্প্রাণ গোমেদশিলা অর্বাচীন বোবাদৃষ্টি তা'র
পথ খোঁজে আত্মপ্রতিষ্ঠার,
উৎকট সাধনা!
জীর্ণভিত্তি-গর্ভতলে বাস্তুসর্প দ্রাবিড়-কল্পনা
হতদর্প বিষরিক্ত ফণা!

প্রাসাদের গলিত পঞ্জরে
বনেদী হাঘরে
স্বাপ্নিক সন্ধানী দৃষ্টি হানে
লুপ্ত পাপ ফিরে যদি আসে তা'র পঙ্গু ক্লীব প্রাণে!
প্রেতায়িত প্রাসাদেব ওঠে অট্টহাসি
কেঁপে ওঠে আবর্জনারাশি।

প্রাসাদের নোনাধরা বালিখসা দ্যালের আড়ালে
চোরাকুঠিবব অন্তবালে
হয়তো লুকায়ে আছে ধূলিকীর্ণ দম্ভের জঞ্জাল
বিশুষ্ক-ত্বগস্থিমাংস বন্দীব কঙ্কাল
অশবীরী প্রজাদের ছায়াময় ক্ষুধার্ত শরীব
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের কত বিদ্রোহীব!
কোনো ইতিহাস
শোনেনি যাদের দীর্ঘশ্বাস!

ময়দানবেব সৃষ্টি প্রাসাদেব জীর্ণলৌহদ্বাবে
জটায়ুর মূর্তি-আঁকা স্তম্ভের দুধারে
পাষাণ প্রকোষ্ঠে নেই দ্বাবী বিভীষণ,
অলিন্দে প্রাঙ্গণে অগণন
প্রতিহারী, দূত, মন্ত্রী, সান্ত্রী, সেনাপতি
কেহ নাই, ধ্বংসস্তূপে বীজ-বনস্পতি
তন্দ্রাহীন অবণ্যের সূচনা-সঙ্গীতে
কালের ইঙ্গিতে।

প্রাসাদের ভিত্তিগর্ভে হযতো বা আছে গুপ্তধন
সোনার কলসপূর্ণ হীরা-মোতি-মাণিক্য-রতন
অভিশপ্ত শত শতাব্দীর
প্রেতায়িত অন্ধকাবে যক্ষশিশু বিদেহশরীর
অহোরাত্র জাগে নিষ্পলক
বাতাসের অট্টহাসি মুখরিত কী যে প্রাণান্তক।

তবু কী উচ্চাভিলাষ অভিজাত হাঘবের প্রাণে
ঘুবে মরে উত্তেজিত পৈত্রিক শ্মশানে
দারিদ্র্যজর্জর অভিমানে।
সূর্যবংশরক্তধারা বহে ক্ষীণ শিরায় শিরায়
দুঃস্বপ্নের প্রজাপতি ছায়াস্পর্শে শূন্যে উড়ে যায়।

২১শে জুন ১৯০৮ —দক্ষিণায়ন

রামমোহন রায়

"The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers but between liberty and tyranny throughout the world; between justice and injustice and between right and wrong."

—*Ram Mohun Roy*

দাসত্ব-তিমিরমগ্ন ভারতের মহাক্রান্তিশিখরে প্রথম সূর্য তুমি
রাজতন্ত্রী রাজা নও, কোটি কোটি নির্যাতীত শৃঙ্খলিত আত্মার আত্মীয়
মুক্তির মশালে রক্তশিখা জেলে অমাজয়ী উজ্জ্বল করেছ জন্মভূমি
অগ্নিমন্ত্রে স্বদেশের ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিলে হে মহাসৈনিক অদ্বিতীয়।
হে বরেণ্য বিশ্ববন্ধু স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদাত্ত প্রলয়-শঙ্খনাদে
উদ্বুদ্ধ করেছ বিশ্ব-মানুষের মনুষ্যত্ব-বিধায়ক মহামানবতা
জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রতিটি মুক্তির যুদ্ধ নন্দিত করেছ আশীর্বাদে
অজ্ঞতা-বিজয়ী জ্ঞান-সাধনায় চিরদিন দেখেছি তোমার প্রসন্নতা।

সূর্যপ্রভ হে নায়ক, মুক্তির সহস্রদল প্রাণ-পদ্মে চেতনা-সৌরভ
ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচরে তোমারি স্বপ্নের তীর্থ স্বদেশের অগ্রগতি পথে
সনাতন হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-ইসলামধর্মে সমদর্শী প্রাণেব গৌরব
তুমি দেখেছিলে মহাসাম্যে হ'বে একাকাব বস্তুবাদী বিজ্ঞান জগতে।
ব্রহ্মে শূন্যে ভেদ নেই, নিরাকাব প্রার্থনার মায়াবাদী আবরণে ঢেকে
জনগণে বৈপ্লবিক মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিলে প্রজ্ঞাদীপ অনির্বাণ রেখে।

১০ই মে ১৯৩৪

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার মনীষাদীপ্ত-যুগপ্রবর্তক
নাগরিক শৃঙ্খলার শুভ্র শুচিতার
স্রষ্টা তুমি জ্ঞানান্বেষী নির্ধূম পাবক
স্থিতপ্রজ্ঞ অগ্রগামী ব্রাহ্মচেতনার।
শীলভদ্র পিতামহ সমৃদ্ধি-সাধক
নবযুগ-জাগৃতির মূর্ত কর্ণধার
শালপ্রাংশু বীর্যবান রবীন্দ্র-জনক
মুক্তিকাম ভারতের দীপ্ত অঙ্গীকার।

প্রশান্ত বলিষ্ঠকায় বরেণ্য বাঙালী
প্রতিভার পরমোৎস বিশ্বের বিস্ময়
আগ্নেয়-ঔরসে কবিসূর্য-দীপ জ্বালি
করেছ এ ভারতের অন্ধকার জয়।
তোমার তপস্যা এক আশ্চর্য মনন
এ যুগের শান্তিতীর্থ শান্তিনিকেতন।

১৫ই মে ১৯৩৫

ডিরোজিও

HENRY LOUIS VIVIAN DEROZIO

• [1809-1831]

নবজাগ্রত বাংলার ঊষালোকে
হে চিরকিশোর "ফকির জাঙ্গিরার!"
ফিরিঙ্গী তুমি আগ্নেয়-নির্মোকে
চিরবিদ্রোহে মেধাবী দুর্নিবার।

ফেরঙ্গ-ব্যাধিমোচন মন্ত্রে গানে
নববঙ্গের তারুণ্যে দিলে দীক্ষা,
চেতনায় চারু চার্বাকী অভিযানে
বাংলাকে দিলে যুগবিপ্লবী শিক্ষা।

নাস্তিক ঋষি হে যুগাচার্য তুমি
জড়ের জৈববিজ্ঞানী-জয়রথে
যুব-বাংলার জীবন্ত পটভূমি
সৃষ্টি তোমার সেদিনের এ ভারতে।

প্রগতি-কাব্যসাধনার আদিগুরু
হে চিরকিশোব "ফকির জাঙ্গিবার,"
বিশ্বচেতনা তোমাতেই হ'লো সুরু
কবি ডিরোজিও তোমারে নমস্কাব!

১০ই এপ্রিল ১৯৩৪

রেভারেণ্ট লঙ

REVT. JAMES LONG

[1814-1887]

জাতিতে ইংরাজ তুমি মাননীয় হে ফাদার লঙ্!
তবু ভালবেসেছিলে নিপীড়িত বাংলার মাটিকে,
অত্যাচারী নীলকর-পশুদেব শোষণে যখন
নিরীহ কৃষকগোষ্ঠী জর্জরিত ছিল চারিদিকে!
অনন্য ইংরাজ তুমি প্রতিবাদে দাঁড়ালে তখন
ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অসহায় সর্বহাবা কৃষকের পাশে;
জরিমানা কাবাগার হাসি মুখে করিলে বরণ,
স্বজাতির প্রায়শ্চিত্তে শোষিতের মুক্তির বিশ্বাসে।
দরিদ্র বাংলার তুমি গণবন্ধু আদর্শ খৃষ্টান
শাসকের কুশাসনে আত্মা তব ছিল বহ্নিমান।

২৩শে মার্চ ১৯৩৪

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সাগরের জল নোনা, রক্ত অশ্রু ঘাম
সমধর্মী। তুমি ক্ষুব্ধ চেতনা-সাগর,
অবিদ্যাবিজয়ী তব দুরন্ত সংগ্রাম
নব্যবঙ্গে মুক্তিদূত হে বিদ্যাসাগর!
জ্ঞানবাদী-সাধনায় তুমি অবিরাম
অজ্ঞতার যুদ্ধজয়ে ছিলে অস্ত্রধর,
ইতিহাসে রেখে গেছো কী উজ্জ্বল নাম
বাস্তব জীবনপথে চেতনা প্রখর।

অভিশপ্ত সমাজের ঘুণধরা মূলে
রুদ্ররোষে কী অব্যর্থ হেনেছ কুঠার,
পঙ্ক হ'তে পাপমুক্ত ঊর্ধ্ববাহু তুলে
শুনায়েছ জাগৃতির কেশরী-হুঙ্কার।
পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববাঙালীর
তুমি ছিলে মুক্তিদাতা প্রশান্ত গম্ভীর।

১২ই আশ্বিন ১৯৪০

অক্ষয়কুমার দত্ত

বিজ্ঞান তোমার আত্মা। জড়বাদী প্রত্যক্ষ জগত
প্রাণতত্ত্বে ক্রমোন্নত শাণিত-বুদ্ধির অভিযানে
বেদান্তে ভোলোনি ব্রহ্ম বোধিতে পারোনি তব পথ
ভক্তির রসাল বসে কোনো সাড়া জাগেনিকো প্রাণে।
পরিশ্রমে শস্য হয়, এর চেয়ে বড় সত্য নেই
কি লাভ সে পরিশ্রমে যোগ দিয়ে ঈশ্বরের নাম?
উপাসনা অর্থহীন, ফললাভ ইহজগতেই
অনিবার্য সত্য তাই বস্তুনিষ্ঠ জীবন-সংগ্রাম।

এই তত্ত্ব লিখেছিলে একটানা তত্ত্ববোধিনীতে
ব্রহ্মবাদী-নেতাদের বিশ্বাসের ভিত্তি-বিদারণ
তোমার অক্ষয়কীর্তি। স্বদেশের নতুন মাটিতে
বিপ্লবের আদিবীজ করেছিলে একাকী বপন।
বাহ্যবস্তু-নিয়ন্ত্রিত মানুষের জান্তব-প্রকৃতি
বোঝেনা দু'চোখ বুজে কানে-শোনা বেদান্তের গীতি।

১৭ই জুন ১৯৪০

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

পয়ার লাচাড়ী ছন্দ-মুখরিত বাংলার অঙ্গনে
হে পুরুষসিংহ কবি হে ভৈরব রুদ্র-চারণ,
আদিরসে আর্দ্র হিয়া বাঙালীর হৃদয় স্পন্দনে
উদাত্ত গম্ভীর স্বরে মহাছন্দ করি উচ্চারণ
পৌরুষ জাগায়ে দিলে। প্রগতির ওগো দীক্ষাগুরু
প্রাণময় ছন্দ তব বন্ধনের নাশি মায়াজাল
অবারিত মুক্তগতি অব্যাহত যেন মহাকাল
দেখাল তান্ডবনৃত্য। বৈপ্লবিক যাত্রা হ'লো সুরু
তব কাব্য-সমুদ্রের উত্তাল গর্জন শুনি বক্ষ তাই করে দুরু দুরু!

অভিশপ্ত যে বীরেন্দ্র একদিন স্বর্ণলঙ্কাপুরে
বিসর্জিল তনু তা'র নিকুম্ভিলা-যজ্ঞসভাতলে
বাসববিজয়ী বীর দুর্মদ রাবণি; অশ্রুজলে
সিক্ত করি আত্মা তা'র তুমি কবি সেই শ্রেষ্ঠশূরে
উদ্ধারিলে বাল্মীকির অবজ্ঞার কারাকক্ষ হ'তে।
হেরিল রসিকচিত্ত ধীরে কবি আঁখি উন্মীলন
মাতৃভক্ত বৈনতেয় করে বুঝি অমৃত হরণ
স্বর্ণপক্ষ আন্দোলিয়া ঊর্ধ্বগতি দূর স্বর্গপথে
তুমি সেই বৈনতেয় সুধাভান্ড হরেছিলে রামায়ণ-বসম্বর্গ হ'তে।

রচিল লেখনী তব সংশোধিত মহারামায়ণ
শিক্ষা দিলে বীরপূজা, মেঘনাদ গর্জিল আকাশে
দেহজ প্রেমের ক্ষুধা পরিপূর্ণ নহে কামায়ণ
জন্মেছিল দৈত্যভাষা বীর্যমান তোমার নিঃশ্বাসে
বৈপ্লবিক কাব্য হেরি মূর্খ যত বালখিল্যদল
সেদিন তোমারে ঘেরি অর্বাচীন বালকের মতো
প্রশ্নবাণে জর্জরিয়া চেয়েছিল করিতে বিব্রত
গর্বিত গরুড় সম তুমি শুধু হাসি অচঞ্চল,
সফরীলীলায় মত্ত বিলাসীর অঙ্গরাখা জ্বালাইলে স্বপ্নের অঞ্চল।

বজ্রাগ্নি জ্বালায় পূর্ণ তুমি মেঘ বঙ্গের আকাশে
প্রতিভার আভিজাত্যে ক'রে গেলে যে গুরু হুঙ্কার
জীর্ণপত্রপুঞ্জ সম উড়ে গেল উন্মাদ বাতাসে
পুরাণ ও পাঁচালীর ক্ষীণকণ্ঠে রাগিনী-ঝংকার।
বঙ্গবাণী-প্রবাহের কল্লোলিত 'কপোতাক্ষি' জলে
'সাগরদাঁড়ি'র ছন্দ শুনি শেন অপূর্ব অদ্ভুত
শুধু নহে বীররস নবরস নবমেঘদূত
কী বিরাট অনুভূতি জেগেছিল তব চিত্ততলে
লোকলোকান্তরে তাই মৃত্যুহীন তব স্মৃতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সম জ্বলে।

বিরচিয়া মধুচক্র তৃষাতুর গৌড়জন-চিতে
রস-মন্দাকিনীধারা দিলে ঢালি হে মধুসূদন!
সুরস্বপ্নলীন তব মধুছন্দা কাব্যের সঙ্গীতে
অমৃতভাষিণী দেবী ভারতীর করিলে পূজন,
যাঁর বরে সিদ্ধি লভি নরহন্তা দস্যু রত্নাকর
ভুবনবিখ্যাত হ'লো রচি' মহাকাব্য রামায়ণ
সৃজিল মানসপুত্র রাঘবেন্দ্র নরনারায়ণ
তুমি সেই বাগ্দেবীর যোগ্যপুত্র হে কবি-ভাস্কর!
সাহিত্যের ইতিবৃত্তে অমর জীবনী তব চিরদিন রহিবে ভাস্বর!

নিয়ম মানিয়া কভু চলো নাই সমাজের বুকে
জ্বলন্ত আত্মারে ঘেরি ক'রে গেছো উৎসব অপার,
ঐশ্বর্যে করিয়া হেলা দারিদ্র্যেরে বরিয়া কৌতুকে
বিদেশিনী প্রেয়সীরে সঙ্গিনী করিয়া আপনার
কাব্যময় অপূর্ব জীবনে। বীরেন্দ্রকেশরী তুমি
দারিদ্র্য-বীতংস দিয়ে কা'র সাধ্য বাঁধিবে তোমারে?
গঙ্গোত্রীর ভীমস্রোতে ঐরাবত কি কবিতে পারে?
লজ্জায় দারিদ্র্য তব লুটাইল পদতল চুমি,
তোমার আগ্নেয় আত্মা ভস্ম করি সর্বতাপ উজলিল সারা বিশ্বভূমি।

জনারণ্য রাজপথে আনমনে চলিতে চলিতে
"দাঁড়াও পথিকবর! বঙ্গভূমে জন্ম যদি তব—"
নহে ক্ষীণ অনুরোধ, এ আদেশ কে পারে করিতে?
থমকি দাঁড়ানু মুগ্ধ রুদ্রাদেশ শুনি অভিনব।
শোকান্ধ রাবণ তুমি অনির্বাণ চিতাবহ্নি হ'তে
হা পুত্র! হা পুত্র! বলি' ঝঞ্ঝাস্বরে ডাকিছ সবায়
মূঢ়মতি আমি কবি তব পূজা জানাবো কোথায়?
স্বর্গের উদ্দেশে কিম্বা গোরস্থান মলিন মরতে?
জ্যোতির্ময় কাব্যলোকে রাঘবারি-আত্মা ওগো দেখা দিলে স্বর্ণহংসরথে।

২৫শে জানুয়ারী ১৯৩২

সাবিত্রী-সত্যবান

•
॥ এক ॥
•

রস-পিপাসিত প্রাণ-চেতনার উজ্জ্বলনীলমণি
নিষ্প্রভ আজ মনোবেদনার অঙ্গাবর্থনিতলে,
ভাগ্য মানি না ভ্রান্তি-নরকে দংশেছে কাল-ফণি
ভেঙেছে চমক বৃথা অনুতাপ জেগেছি বিপুল বলে।
অপহৃত-প্রাণ হে সত্যবান শুনেছি পদধ্বনি
শব-সাধিকার জ্বলন্ত প্রেম গৈরিক অঞ্চলে
সীমন্তে রাঙাসিন্দুরে জ্বলে ব্যথার বজ্রমণি
যমের প্রাসাদে আমার কাব্য-সাবিত্রী একা চলে।

এলোকেশে তা'র অমাবস্যার নিকষ নিবিড় কালো
অতন্দ্র চোখে অগ্নি-ভ্রমর পল্লব-প্রচ্ছায়ে
তড়িৎপ্রবাহে দিক-দিগন্তে কম্পিত রাঙা আলো
মারী মৃত্যুর নখরচিহ্ন মুছে যায় পায়ে পায়ে।
উষসী উষায় হে সত্যবান নির্ভয়ে এসো ফিরে
যমের জাঙাল ফেটে চৌচিব বৈতরণীর তীবে।

॥ দুই ॥

অপরিচিতার পরশভীতার লাজরক্তিমরাগে
সামন্তযুগবন্দিতা নারী-প্রণয়ের পরিহাস
জ্বলে পুড়ে গেছে হে সত্যবান মুক্তির অনুরাগে
বিরাট প্রাণের পটভূমিকায় আরক্ত ইতিহাস।
পদস্খলিত তমসা ভেদিয়া শিখায়িত প্রেম জাগে
পরাজিত আজ ভ্রান্তি-পিশাচ উঠেছে নাভিশ্বাস
কত শুভদিন বিনষ্ট হ'লো দুঃসহ ব্যথা লাগে!
আমার কাব্য-সাবিত্রী তবু ঘৃণা করে হা-হুতাশ।

অনন্ত ব্যোমরশ্মিনিকনে গলিত সূর্যকণা
বিশ্বপ্রাণের অণুতে অণুতে চেতনার দীপ জ্বালে
রক্তবসনে রুদ্রাণী আজ সাবিত্রী অনুপমা
তড়িৎপ্রবাহে শোণিত জাগায় ভাবনাব কঙ্কালে।
সম্ভ্রমে প্রেমে পৌরুষে জাগো বিপ্লবী-চেতনায়
কাব্যলোকের হে সত্যবান সাবিত্রী-প্রেরণায়।

৭ই বৈশাখ ১৩৪৭ —সাবিত্রী

তিলোত্তমা

সহস্র কাজের ফাঁকে স্মরণের নিভৃত মুকুরে
বারবার কাঁপে সেই মুখ,
দেবদৈত্যবিজয়িনী সেই তন্বীতনুর ঋজুতা,
দুটি চোখে বিদ্যুতের উজ্জ্বল ভ্রমর
মনে পড়ে কুন্তলনাগিনী।
বিমর্ষ বাসনালোকে প্রহরী-যৌবন,
মেঘাচ্ছন্ন কাব্যলোক,
দুর্গম স্বপ্নের দুর্গে হে আমার বন্দিনী নায়িকা,
অতনু তোমায় আজো করে পরিক্রমা!
দীপ জ্বেলে সারারাত স্মৃতির শিখায়
বিহ্বল আত্মায়
প্রেমের কবিতা লিখি
তিল তিল শোণিতের স্বাপ্নিক-অক্ষরে।
অয়ি তিলোত্তমা,
আজো তুমি অপলক হৃদয়ের অস্ফুট-ভাষণে!

এ জীবন ভারাক্রান্ত তবু সারারাত
প্রেমিক হৃদয় জাগে, দৈত্যপুরী ঘুমে অচেতন
বিমর্ষ নক্ষত্রপুঞ্জ রাত্রির পাহারা;
অতন্দ্র মঙ্গল জাগে খড়্গধারী রক্তাগ্নি-শরীর
চঞ্চল বাতাস মাথা খোঁড়ে,
রুদ্ধদ্বার যৌবনের লোকায়ত দেয়ালে দেয়ালে।
প্রহরীবেষ্টিত দুর্গে সুন্দ-উপসুন্দেরা ঘুমায়
মেদস্ফীত অহংকারে স্বর্গজয়ী দম্ভের নেশায়
চারিদিকে পৈশাচিক অমা!
হে আমার তিলোত্তমা,
মুক্তির প্রতিমা তুমি
লক্ষ কোটি বঞ্চিতের তিল তিল মাধুরী-শোণিতে
রোমাঞ্চিত অবয়ব
লাবণ্যকম্পিত তন্বীতনুর শিখায়!

যৌবনের অভ্রভেদী কল্পনার হিমাদ্রি-শিখরে
কামনা ধবলগিরি উজ্জ্বল তুষারপুঞ্জে ঘেরা;
ঊর্ধ্ববাহু মহাকাল ত্রিশূলে ত্রিকাল কম্পমান
জটাভারে মেঘরাশি ওড়ে
অটল ধ্যানের শূন্যে চন্দ্র সূর্য বুদ্বুদের মতো
নিঃশেষে বিলীয়মান।

তবুও অদম্য দুঃসাহসে
হরগৌরীমিলনের স্বপ্নদূত লুব্ধ পঞ্চশর
কুসুম-কার্মুক হস্তে জাগে প্রতীক্ষায়!
অকস্মাৎ তৃতীয় নয়ন
মহারোষে বহ্নিমান,
পুষ্পধনু মকরকেতন ভস্মীভূত!
হায় তবু অর্থহীন শৈবসাধনার
তপোভঙ্গে ক্ষিপ্তশিব জর্জরিত পঞ্চশরাঘাতে
পরাজিত শূলপাণি গৌরীপ্রেমে বিহ্বল চঞ্চল।
কামনার মৃত্যু নেই
অমৃতত্ব লভে কাম প্রজাসৃষ্টিযজ্ঞের পূজারী।
আসে কার্তিকেয়
দৈত্যজয়ী জ্যোতির্ময় দেব-সেনাপতি।

জানি জানি কামনার এ উদ্দাম মহাপারাবারে
শূলীশম্ভু পরাজিত
প্রেমের উদ্দাম ঝড়ে আকাশ পৃথিবী ঢেকে-দেওয়া
অযুত কুসুমশরে জর্জরিত করে তনু মন।
তোমার অমেয় আবির্ভাব
তখনি সম্ভব হয় অয়ি তিলোত্তমা।
বিপ্লবের নূতন জগতে
তুমি যদি দূরে থাকো দৈত্যবিজয়িনী
মুহূর্তে প্রলয় হবে
ভস্ম হবে অনঙ্গের বিধবা সংসার
বাষ্প হয়ে মিশে যাবে সপ্তমহাসমুদ্রের জল।

দীর্ঘযুগ প্রতীক্ষিত কল্পনার নিরুদ্ধ আকাশে
খসে গেছে স্মরণের তারা
নিভে গেছে স্বপ্নদীপ
লক্ষকোটি প্রেমিকের অশান্ত নিঃশ্বাসে।
স্বর্গলোভী আত্মার আগুন
কামনায় শিখায়িত সুন্দ উপসুন্দের চিতায়
ব্যর্থপ্রেমে জ্বলে গেছে যুগযুগান্তর।
সৃষ্টি তবু শাশ্বত সুন্দর
আজো তুমি অনির্বাণ হৃদয়ের অনিন্দ্য-প্রেরণা
প্রজাপতি মানুষের তপস্যায় দীপ্ত সম্ভাবনা
অয়ি তিলোত্তমা!

১৭ই বৈশাখ ১৩৪৩ —সাবিত্রী

উমা

[কবি রাধারাণী দেবীকে]

প্রজাপতি চেয়েছিল প্রজাবৃদ্ধি হোক্
শিব চেয়েছিল শান্তি সংসার-যাত্রায়,
অপমানে তবু সতী তনু ত্যাগ করে
কোথা ভুল জানিনাকো ছন্দের মাত্রায়।
ছাগমুণ্ড দক্ষ তবু স্বর্ণসিংহাসনে
সম্রাটের আভিজাত্যে ক্রূর দণ্ডধব!
শ্মশানের ছাই মেখে দেব ত্রিলোচন
প্রলয়ের প্রতীক্ষায় গণিছে প্রহর।
চন্দ্র সূর্য দুই চক্ষু, গগন-ললাটে
সুচর্চিত নক্ষত্রের চন্দনের টিকা,
পদতলে মহাব্যোম্ কোন্ মন্ত্রজপে
জেবলে রেখে কালান্তক প্রলয়ের শিখা?

সতী যদি উমা হয় শঙ্করেব ঘরে
কে খসাবে ছাগমুণ্ডে শোভিত মুকুট?
উমা যদি প্রাণ দেয় প্রজার পীড়নে
হিমাদ্রিব হিমশৃঙ্গ হবে অগ্নিকূট।
শিব যদি মিথ্যা হয়, প্রজাপতি মায়া
স্বর্গে মর্তে কেন তবে এত হানাহানি?
কেন কাঁপে পৃথিবীতে অগ্নিগর্ভ ছাযা
সতীশব কাঁধে নিযে নাচে শূলপানি।
শ্মশানেব রক্তপদ্ম ফোটে ঊর্ধমুখী
প্রজাবৃদ্ধি কামনায শিব তন্দ্রাহারা;
পৃথিবী যে যুগে যুগে হ'তে চায সুখী
উমাব হাসিতে ঝবে লাবণ্যের ধাবা।

৯ই মার্চ ১৯৪৫

তে হি নো দিবসা গতাঃ

সিংহ-নখবে শোণিতসিক্ত বঙ্কিম গজমোতি
পদচিহ্নিত তুষাবে স্খলিত সৌরকিরণে দীপ্ত,
রেবাতটচারী সে কবি-মনন সূক্ষ্ম ছন্দ যতি
উজ্জয়িনীর কোথা সে ললাট সিতচন্দনলিপ্ত?

স্তিমিত সোনালী চন্দ্রমৌলী মহাকাল-মন্দিরে
বিপ্রলব্ধা অভিসারিকার নৈশপূজার মন্ত্র,

মদিরেক্ষণা ছন্দ-নটীর সিঞ্জিত মঞ্জীরে
কোথা সে ঝিল্লি-ঝংকৃত প্রেম-রজনীর বীণাযন্ত্রে ?
ফিরেতো আসে না বসন্তসেনা স্বপ্নবাসবদত্তা
• এ কবি-জীবনে যন্ত্র-যুগের রজনী অপ্রমত্তা।

২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৪২

শ্রীরামচন্দ্রের আত্মভাষণ

"কঃ পুমাংস্তু কুলে জাতঃ স্ত্রিয়ং পরগৃহোষিতাম্।
তেজস্বী পুনবাদদ্যাৎ সুহৃল্লোভেন চেতসা ॥"

—বাল্মীকি রামায়ণম, লঙ্কাকাণ্ড ১১৭। ১৯

উল্কাখসা তারাজ্বলা রাত্রির নিঃসঙ্গ পটভূমি
লক্ষ্যভ্রষ্ট নীলশূন্যে যতবার করেছি সন্ধান
জ্বলে গেছে অনুতপ্ত হৃদয়ের নাক্ষত্রিক শিখা
বিদীর্ণ পৃথিবী ক্রন্দমান!
জ্বলে গেছে মুক্তিস্বপ্ন প্রেমস্বপ্ন সোনার লঙ্কায়
জ্বলে গেছে অশোক-কানন
অনির্বাণ চিতাকুণ্ডে জ্বলেও জ্বলে না তবু দুরন্ত রাবণ।

কৃষিতীর্থস্বরূপিণী অয়ি সীতা অযোনিসম্ভবা,
কবির মানসকন্যা বিরহের মৌন রক্তজবা
তোমায় পেয়েছি দীর্ঘতপস্যার রূঢ় অবসানে
ঈর্ষা-মৌন আত্মার শ্মশানে।
তোমায় পেয়েছি রক্ত-সমুদ্রের তরঙ্গ-সঞ্চারে
সূর্যবংশমর্যাদার দৃপ্ত অহঙ্কারে!
হৃতদর্প দশানন মৃত কালনেমি
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় স্বর্গে সৌরচক্রনেমি;
অভিশপ্ত রাবণের সিংহাসনে ক্রূর বিভীষণ
অনার্যের গৃহশত্রু রাঘবের চরণ-চারণ
হাসে অট্টহাসি,
হায় তবু কোথা সুখ রাঘবেব শতদীর্ণ আত্মা উপবাসী!

মুক্ত দেশ তুষ্ট প্রজা উৎসব-মুখর রাজধানী
আনন্দের শুদ্ধতায় পরিত্যক্তা তুমি মহারাণী
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের শরবিদ্ধ স্মৃতির সুষমা
জীবন-আকাশে তীব্র কলঙ্কের অমা
লোকাচার মেলেছে নখর
নতমুখে চলে গেলে অঙ্গে বহি' অলক্ষিত সূর্যবংশধর!

ব্যর্থ তাই সিংহাসন এ-সংসার বিষণ্ণ শ্মশান
ঈর্ষার চিতায় জ্বলো অদম্য প্রাণের অভিমান
তুমি হও নির্বাসিতা
আত্মঘাতী বিরহের অন্ধকারে রচি স্বর্ণসীতা!
প্রেম সত্য প্রিয়া সত্য ভয়ে ভয়ে বলি,
কম্পিত ওষ্ঠের বৃন্তে ঝরে যায় বাষ্পময় অঞ্জলি।
পিতৃ-সত্য, প্রজা-সত্য, বন্ধু-সত্য করেছি পালন,
প্রেম-সত্যে ব্যর্থকাম যে-সত্যের অপলাপে তোমার নির্মম নির্বাসন!

পৃথিবীর বুক চিরে শুষ্ক রক্ত ওঠে বাষ্পাকার
পৃথিবীর নাড়িছেঁড়া মায়াবিনী মৃত-যন্ত্রনার
রোমাঞ্চিত শিখা ওঠে তোমার নীরব দীর্ঘশ্বাসে,
সুরশিল্পী লব কুশ বাল্মীকির স্বপ্নের আকাশে
বোঝেনাকো পিতৃ-সত্য, মাতৃ-সত্যে দীক্ষিত সন্তান
মহারণ্যে অনাদৃত গেয়ে যায় রামায়ণী গান।

শীর্ণতোয়া সরযূর শূন্যতটে নিস্ফল-সন্ধ্যায়
হরধনুভঙ্গ-স্মৃতি বক্ষে জ্বলে প্রেমের চিতায়!
অনিন্দিতা বরতনু স্বহস্তে করেছি ভস্মসাৎ
ভারতনারীর ভাগ্য-চেতনায় নির্মম আঘাত।
নারকীয় অনালোকে নিম্নমুখী অসুস্থ-মানস
শিখাদগ্ধ এ জীবন রিক্ত পরবশ,
তিলে তিলে দগ্ধতনু অশাশ্বত কর্তব্য পালনে
তোমায় করেছি ত্যাগ আঁকড়িয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে।
প্রেম তাই মিথ্যা হ'লো মিথ্যা হ'লো নারীর সম্মান
অনিদ্রার শরশয্যা মিথ্যা তাই ক্লীব অভিমান।
যে নারীর মর্যাদায় কার্মুক ধরেছি সগৌরবে
সবংশে রাক্ষশবংশে পাঠায়েছি জ্বলন্ত রৌরবে,
সেই রাম নারীহন্তা! প্রজানুরঞ্জন!
নির্বাক নির্লজ্জ মনে গ্রহণ করেছি তবু লোভনীয় স্বর্ণ-সিংহাসন!

রাবণ সবংশে মরে, সবংশে মরেনি দশরথ,
আমারি পাদুকা পূজি সিংহাসনে নিষ্কাম ভরত
চতুর্দশবর্ষ ব্যাপি যে তপস্যা করেছে নীরবে
ভ্রাতৃভক্ত রামানুজ চরিত্রের অমূল্য গৌরবে,
তারি হাতে সসম্মানে বাজ্য ছেড়ে দিয়ে
প্রেমের মর্যাদা দিতে পারি নাই প্রিয়ে!
রমাশূন্য রামরাজ্যে অলক্ষ্মীর ক্রুর অভিশাপ
বিদীর্ণ এ হৃদয়ের রাত্রিদিন বাড়ায় সন্তাপ।

মৃত্যুর তোরণদ্বারে ডঙ্কা দেয় দ্বারী
সাগ্রহে প্রতীক্ষমান নীলকণ্ঠ-হৃদয় ভিখারী।
হতভাগ্য বিষণ্ণ রাঘব
নহে আর সত্যকাম, সত্যহন্তা অসত্যের শব।
অভিমান? মিথ্যা অভিমান!
পায়ের তলায় মাটি অপসৃয়মান।
যে দুর্ভাগা জনশ্রুতি লঙ্ঘিবার রাখে না সাহস
মেনে নেয় ঘৃণ্য অপযশ,
নির্মল অপাপবিদ্ধা অগ্নিসিদ্ধা প্রেম-প্রতিমার,
হে দেবি, এ রাজরক্তে তুমি কি দেখেছ অপস্মার?
তুমি কি দেখেছ ভীরু দ্বিধাগ্রস্ত বিদীর্ণ হৃদয়?
সমুদ্র বন্ধন বৃথা, অনার্যরুধির স্রোতের বৃথা তাই স্বর্ণলঙ্কা জয়!

৩রা জুলাই ১৯৪১

পঞ্চ-নিষাদ

কলঙ্ক-কম্পিত রাত্রি, স্তব্ধ জতুগৃহ।
পুরোচন-বিনির্মিত সুসজ্জিত মরণ-ভবন
সুপ্তিহীনা শৌরসেনী,
অতন্দ্রিত পঞ্চপার্থ অন্তরে বিষাদ
উদ্ধারের ষড়যন্ত্রে।
সেদিন বারণাবতে পশুপতি-উৎসবে রজনী,
নিমন্ত্রিত জতুগৃহে আচণ্ডাল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ,
অতিথি-বৎসলা আজ পাণ্ডব-জননী,
আজ তাঁর ব্রত-উদ্‌যাপন।

তখন উত্তীর্ণ সন্ধ্যা।
একে একে ফিরে গেছে পরিতৃপ্ত নিমন্ত্রিতগণ।
ক্রমে রাত্রি গাঢ় হয়
অস্থির চঞ্চল কুন্তি জতুগৃহদ্বারে,
"এখনো এলো না অতিথিরা?"
সূচীভেদ্য অন্ধকারে অকস্মাৎ কানে এলো তাঁর
"জয় হোক রাজমাতা, ক্ষুধিত আমরা",
আনন্দে আতঙ্কে দুঃখে রোমাঞ্চিতা পাণ্ডব-জননী,
অভীষ্ট অতিথিবর্গ এলো এতক্ষণে।
তবু কেন হৃদয়ের দ্বিধাকম্প্র স্বগত-ভাষণ?
"দূর হোক দুর্বলতা।

ক্ষমা করো হে স্বর্গীয় স্নেহের দেবতা
হতভাগ্য অতিথির চিতাকুণ্ডে আজ
অনির্বাণ হোক পঞ্চ-কুমারের আয়ুদীপশিখা!"

বৃদ্ধামাতা নিষাদী ও পাঁচপুত্র তা'র
রাজভোগে পরিতৃপ্ত আশ্রয় পেয়েছে জতুগৃহে,
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বহস্তে দিয়েছে শয্যা পাতি'
স্বযত্নে করেছে ভীমার্জুন
পরম উৎসাহ ভরে অতিথিসৎকার!
জতুগৃহ রহস্যগম্ভীর
পীতপাণ্ডু চন্দ্রালোকে বিষণ্ণ আকাশ,
বারণাবতের রুক্ষ শ্মশান প্রান্তরে!
পত্রহীন রসহীন বিশুষ্ক ভৌতিক বৃক্ষশাখে
অমর ভূষণ্ডীকাক ডাকে।

রোমাঞ্চিত জতুগৃহ!
সুড়ঙ্গের অন্ধকারে পঞ্চপুত্র করে পলায়ণ
পুরোভাগে মাতা কুন্তি স্নেহান্ধ জননী,
পশ্চাতের পরিত্যক্ত মরণ-ভবনে
সুপ্তিমগ্ন অতিথিরা নিশ্চিন্তে ঘুমায়,
নিষাদী ও পাঁচপুত্র, পাঁচটি নিষাদ
একলব্য-শম্বুকের জাত!
মাতার আদেশ,
জলন্ত মশাল হাতে ক্রূরকর্মা মধ্যম-পাণ্ডব
স্বহস্তে জ্বালায় অগ্নি অশ্রিতের ঘরে।

সুপ্তিমগ্ন জতুগৃহ,
নিবাত নিষ্কম্প শিখা কালপুরুষের
কী উজ্জ্বল, কী গম্ভীর, রাত্রির আকাশে।
হঠাৎ তিমির-পক্ষ দাঁড়কাক ডাকে
অজানা শঙ্কায় জাগে বিহঙ্গেরা অরণ্যের শাখে।
"যতোধর্মস্ততোজয়ঃ" ?—মূর্খের প্রলাপ!!
সর্পিল সুড়ঙ্গ পথে,
পরম অধর্মাচারী ধর্মের সংসার
তস্করের মতো স'রে যায়।

হঠাৎ আকাশ রক্তরাঙা
আচম্বিতে জতুগৃহে সুখসুপ্তিভাঙা
লেলিহান রুদ্ধঘরে কা'দের ক্রন্দন?

কা'রা কাঁদে ?
পঞ্চ-পাণ্ডবের প্রাণ-উদ্ধারের নারকীয় ফাঁদে ?
ধু ধু জ্বলে জতুগৃহ !
সে আগুনে জ্বলে যায় আকাশের তারা,
জ্ব'লে যায় স্বয়ং ঈশ্বর,
ভীতিপ্রদ বিস্ফোরণে চূর্ণ জতুশিলা,
সশব্দে কঙ্কাল ফাটে
অস্থি মাংস গলে' যায় অবরুদ্ধ ছয়টি দেহের,
পাপমতি পুরোচন সে আগুনে ভস্ম হয়ে যায়।
লাক্ষা-শণ-সর্জ-ঘৃত-কাষ্ঠ-জতুময়
ধু ধু জ্বলে পাপকক্ষ
বারণাবতের নৈশ-নীরবতা ভাঙি'।

জেগে ওঠে গ্রামবাসী আতঙ্ক-বিহ্বল,
নীলাভ শোণিতবর্ণ বৈশ্বানরী শিখা
প্রলয়-তাণ্ডবী শীর্ষ,
ভীষণ ভয়াল দৃশ্যে কাঁপে অন্ধকার।
দগ্ধে দগ্ধে জ্ব'লে-মরা মাংসগন্ধে মন্থর বাতাস!
রুদ্ধকণ্ঠে কা'বা কাঁদে আগুনের শিখায় শিখায় ?
কা'রা কাঁদে ?
পঞ্চপ্রাণ-উদ্ধারের পৈশাচিক ফাঁদে ?

আঁধারে সপুত্রা কুন্তি করে পলায়ন
লজ্জায় ঘৃণায় পাপে
ধর্মের প্রেয়সী কাঁপে !
সে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে সাক্ষী শুধু আরক্ত আকাশ।
অদূরে অপেক্ষমান বিদুরের নির্দিষ্ট তরণী
সাঙ্কেতিক-পতাকাচিহ্নিত
অন্ধকারে আন্দোলিত সন্ধানী-আলোর শিখা কাঁপে
কল্লোলিত নদীজলে,
তটভূমি অরণ্যসঙ্কুল।
পঞ্চপার্থ পরিবৃতা শৌরসেনী করে পলায়ন
লোকচক্ষুঅগোচরে গুপ্ত-তরণীতে।

ভেসে আসে শবগন্ধ বিষাক্ত ধোঁয়ায়
ভস্মীভূত জতুগৃহ হ'তে।
কা'রা কাঁদে ?
জতুগৃহে শ্বাসরুদ্ধ যুগ যুগ লাঞ্ছিতজীবন,
উপেক্ষিত শূদ্র-আত্মা ক্ষত্রিয়ের ঘৃণ্য অত্যাচারে

দুর্বিষহ ব্রাহ্মণের ঘৃণার আগুনে
কা'রা দেয় যুগে যুগে ষড়যন্ত্রে প্রাণ বিসর্জন ?

*　　*　　*

উৎকণ্ঠায় সারারাত্রি জাগে দুর্যোধন
সুদূর হস্তিনাপুরে।
আত্মগত প্রশ্ন জাগে রোমাঞ্চক কালরাত্রি জেগে,
"মরেছে কি পাণ্ডবেরা ?
হে বিধাতা, নিষ্কণ্টক হোলো সিংহাসন ?"
অট্টহাসি হেসে ওঠে মহামন্ত্রী মাতুল সৌবল।
অন্তরালে ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ-সম্রাট
সহস্রনাগের শক্তি ভীমবক্ষে নিষ্ঠুর পাষাণ
বিদীর্ণ হৃদয়ে জ্বলে বিলাপের বৃশ্চিক-দংশন ?
কবৃণায় হাসে শুধু একক আঁধারে
সঞ্জয়ের দৈবনেত্র,
কুরুক্ষেত্র ক্ষত্রিয়ের দম্ভের শ্মশান !

৪ঠা জুলাই ১৯৩৮　　—স্বিগ্রহর

মৃত্যুঞ্জয় পাখী

ফাল্গুনের মৃত্যুঞ্জয় পাখী
বাববাব ডেকো যায়
শুনি বসে ব্যথিত তন্দ্রায়
একটানা কুহু কুহু ! হু হু করে মন।
কত কাজ !
কত অসমাপ্ত কাজ চারিদিকে জমা
সময় কবে না ক্ষমা
ফুবায় অলস বাত্রি মহাতমস্বিনী
নিঃসঙ্গ তিমিরে উদাসিনী।
ক্রন্দন-কম্পিত ছন্দে শূন্যে কাঁপে শ্যাম-যবনিকা,
প্রেমের রজতশিখা তারায় তারায়
চেতনা হারায়।

অনন্ত ফাল্গুনীসুর, কুহু, কুহু, কুহু !
হু হু কবে শিরাস্নায়ু,
কী চঞ্চল, কী উদ্দাম, যৌবনের আয়ু !
চাঁদ নেই ; কোথা চাঁদ ?

তারায় তারায়
প্রশ্নের সোণালি আলো কম্পিত বিবশ।
অদৃশ্য ছন্দের শিখা আত্মার নিস্তব্ধ বেদিকায়
রোমাঞ্চিত হৃদয়ের রক্তিম-বাসনা।

প্রেম! প্রেম! কী গভীর প্রেম!
আকুল সর্বস্ব দিতে
অগণিত প্রেমহারা সর্বহারা মর্তের মানুষে।
কত কাজ!
না-বলা কত যে ব্যথা জানাবো কেমনে?
কে নেবে আমার প্রেম?
আবার আবার ডাকে ফাল্গুনের মৃত্যুঞ্জয় পাখী
একটানা কুহু কুহু,
হু হু করে মন,
প্রেম, প্রেম,
অকথিত হৃদয়ের গভীর মিনতি
কে জেনেছে, কে বুঝেছে কবে?
স্বাথকলঙ্কিত ক্লীব বিষয়ী-জগতে?

সর্বনাশা ভালবাসা উন্মত্ত করেছে মন প্রাণ
মানুষ যে পৃথিবীর প্রেমের সন্তান
প্রলয়-পয়োধিজলে আদিম ঊষার কুয়াশায়
সৃষ্টির প্রথমদিন থেকে;
তাইতো ফাগুন আসে প্রেমের আগুনে শিখায়িত
অতনুর তনুভস্মে সুরভিত আকাশ-বাতাস
স্বপ্নাতুর কুসুমের কেশরে কেশরে!

প্রেম! প্রেম!
জ্বলন্ত অতৃপ্ত প্রেম শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুখর উদ্দাম
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের আসঙ্গ-বিলাস
চৈতালির মদির হাওয়ায়।
শুনি বসে অলস তন্দ্রায়
মৃত্যুঞ্জয় পাখী যায় ডেকে
কোথা প্রেম! কোথা প্রেম!
দুর্বোধ্য-ভাষার কুহু কুহু!

৮ই মার্চ ১৯৪৪ —সাবিত্রী

লক্ষ্মী

চোখের পাতায় আকাশ মেঘ্‌লা কোরে
যখনি সে চেয়ে দেখেছে পাহাড়-গলানো
সুর-গঙ্গার গম্ভীরতা বুকে নিয়ে,
তা'র দিকে চেয়ে ভুলে গেছি ভাষা পলক পড়েনি চোখে,
এরি নাম ভালবাসা।
সারা সংসার সুরভিত তা'র জুঁইফুলে গাঁথা মালায়
সে যেন উমার শঙ্খ-বলয়ে আজো কল্যাণরূপিণী
স্বাধিকারে স্থির বিদ্যুৎশিখা যেন;
মনকে ভাবায় সে যেন প্রেমের সাধনা
মানুষকে বলে শিব হও!

দু'চোখে গভীর দূরদৃষ্টির মায়া
শুধু ঘরে নয়, সহজ উদার পৃথিবীর পথে পথে
অজস্র ফুল ফোটায়, মৃত্যু ভোলায়।
ঘরে কি বাইরে কাজের লাবনি ঝরে তা'র নোনাঘামে
আঙুলে বিশ্ববিমোহন তা'ব সেবা
লক্ষ্মী আমার আনন্দ-সহচরী।

দুঃখের ঝড়ে যখনি নিবেছে আলো
তারি হাতে রাঙা-প্রদীপের শিখা জ্বলেছে
পায়ের পুণ্য ছোঁয়া লেগে কত সেঁউতি হয়েছে সোনা।
নিবিড় বাসনা সে যেন আমার দেবদারুবনচারিণী
চকিতা সে আজো কৃষ্ণচূড়ার আভাষে।
সে যখন চায় কুঁড়ি ফুটে ওঠে, কেঁপে ওঠে কচিপাতা
শ্যামবনভূমে মাধবী জড়ায় পিয়ালে।

৩১শে মার্চ ১৯৫৫

বৌ কথা কও!

আকাশে চাঁদ মাটিতে চাঁদ, চাঁদ যে বুকের মধ্যে
ছড়ায় বেঁধে ব্যথায় কেঁদে চাঁদকে মেলাই পদ্যে
রাত্রি তখন দুপুর
থেমেছে ট্রামের ঘড়ঘড়ানি ঝিঁঝিঁরা বাজায় নূপুর।
ইঁটবাঁধানো গলির মোড়ে তেতলা বাড়ীর ছায়া
মধ্যিখানে জড়িয়ে আছে চাঁদ্‌নী রাতের মায়া
ঘুমের নেইকো দেখা
গুমোট ঘরে রাত কাটে না মনটা বড়ই একা।

ভাতকাপড়ের সমস্যাটা সবার আগেই জানি
মন-কাঁদানো দস্যু-চাঁদের হঠাৎ রাহাজানি
নিঝুম রাতের জুলুম তবু স্মৃতির ভাঁড়ার লোটে
ফাগুন হাওয়ার সিঁদকাঠিটা বুকের মধ্যে ফোটে
হৃদয় ফেটে কাব্য ঝরে ব্যথার শোণিতধারা
রূপকথা নয় রূপকথা নয় এই জীবনের ধারা
তাকাই পথের পানে
ঘুমভাঙা রাত গুমরে ওঠে ফাগুন হাওয়ার গানে।

অন্ধগলির আবর্জনায় লুটোয় চাঁদের কণা
দুঃখবাদের কালনাগিনী নাচায় ক্ষোভের ফণা
বিষের জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে তেতলা বাড়ীর তলায়
চ্যাপটা মনের পরশ লাগে চাঁদের ষোলোকলায়
শিউরে ওঠে চাঁদ
মাটির ওপর লুটিয়ে কাঁদে রূপের ছেঁড়া ফাঁদ।

হঠাৎ কোকিল ডাক দিয়ে যায় করুণ আর্তনাদে
গলির ভেতর পূর্ণিমা রাত হুমড়ি খেয়ে কাঁদে
রূপতরাসী ভাড়াটে ঘর শুরকীখসা দ্যালে
ডাইনী-চোষা ঘুলঘুলিটা চাঁদের ছায়া ফ্যালে
হায়রে! তবু লজ্জা কোথায় ঢাকি,
শূন্য বুকে হঠাৎ ডাকে 'বৌ কথা কও' পাখী?

১০ই ফাল্গুন ১৩৪৪

অগ্নিসিন্ধা

আমার ঘরের দণ্ডকবনে চিরবন্দিনী সীতা
মুখ বুজে তুমি খেটে যাও সারাদিন,
অম্লান তবু ওষ্ঠে তোমার হাসিটি অপরাজিতা
সুরভিস্নিগ্ধ সেবায় ক্লান্তিহীন।

প্রসন্নমনে অন্নপূর্ণা অন্নহীনের ঘরে
ভ্রূক্ষেপ নেই অলক্তরাগরঞ্জিত-পদভরে
দুঃখগহন কণ্টকবনে ফোটাও রক্তজবা
হে অনলসম্ভবা!
স্বর্ণশিখার আঙুলে তোমার অলকার যাদু মাখা
শাওনের মেঘমন্থিত মুখে সজল চাঁদের রাকা।

অন্নহীনের ঘরে
পরিবেশনের শুচিতায় সুধা ঝরে।
মনে হয় যেন শাকান্ন তব পরমান্নের মতো
বিহ্বল আমি সম্ভ্রমে অবনত।
এ কোন মন্ত্রে অমেয় শক্তি ধরো
শত দারিদ্র্য-যন্ত্রণা চেপে স্বর্গ রচনা করো
চিরপ্রসন্ন মনে
আমার কাব্য-সংসারে চির-অনটন অনশনে!

সংসারে আমি শৃঙ্খলাহীন অকথ্য-যাতনায়
ক্ষ্যাপা-জীবনের দিশাহারা যাতনায়,
সর্বহারার মুক্তির গান নীরবে রচনা করি।
তুমি পাশে আছো তাইতো আমার
সিদ্ধিলাভের বাসনা অপার
তুমি পাশে আছো তাইতো অকূল-সাগরে ভাসাই তরী।

হে নিরাভরনা ছিন্নবসনা আঘাতে বিকারহীনা
হে আমার মনোবীণা!
আমার জীবনে যত ঝংকাব
তোমার জীবনসুরে বাঁধা তার
নিরানন্দের ভাঙা-সংসার কী মহানন্দে মিলালে?
বলো বলো প্রিয়ে কোন প্রয়োজনে
সব অধিকার নিঃস্ব-জীবনে
ব্রতচারী হতভাগ্যের পায়ে নিঃশেষ ক'রে বিলালে?

আমার চাওয়ার অন্ত যে নেই তুমি তো সে-কথা জানতে
তৃষাজর্জর কবি-জীবনেব যৌবন-মরুপ্রান্তে।
তুমি এলে তাই না-পাওয়ার মরীচিকা
শূন্যে মিলালো বুকে তুলে নিলে উদ্দাম মরুশিখা।
সে মরুশিখায় অগ্নিসিন্ধুরূপে
রোমাঞ্চকর প্রতি অঙ্গের আরক্ত রোমকূপে
মরুশয্যায় জাগালে মোহিনী মায়া
গ্রহ-মণ্ডলে অনাদি মিথুন তন্ময় পতিজায়া॥

২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

ছন্দ-পতন

রাত প্রায় দুটো বাজে।
চন্দ্রাহত অঙ্গনের শেষপ্রান্তে প্রাচীরচূড়ায়
পরম গম্ভীর পেঁচা হঠাৎ কর্কশ শব্দে ডাকে।
রুদ্ধশ্বাস অন্ধচোরাগলি
একটি ভাড়াটে ঘর,
বন্ধ আলো বন্ধ হাওয়া বালিখসা দেয়ালের গায়ে
প্রতিবেশী প্রাসাদের ছায়া কাঁপে রজত-জ্যোৎস্নায়।

অতন্দ্র শরীরে ক্ষুব্ধ পলাতক মন
মুক্তি চায়। কার মুক্তি ?
জানি এ সংসার জুড়ে মুক্তিভিক্ষু অগণিত মন
মুক্তি চায় ক্ষুধায় তৃষ্ণার
ক্ষোভের দুঃখের দাসত্বের !
পঞ্চকোষে জৈবপ্রাণ আয়ুর পাথেয় খুঁজে মরে,
আনন্দ অর্বুদ ক্রোশ দূরে অবস্থিত
তমসার পরপারে দুর্নিরীক্ষ্য মহাসূর্যাসীন।
যে মুক্তির পদশব্দে চঞ্চল সংসার
সে মুক্তি তো আমাদেরই হাতে
আমাদেরই রক্তে রাঙা বিপ্লবের প্রসন্ন-প্রভাতে।
রাত্রিব প্রান্তিকে জ্বলে সহস্রশিখায়
প্রজ্বলন্ত অনির্বাণ মুক্তির মশাল,
অনির্বাণ শিখা জ্বলে সর্বহারা আয়ুর প্রদীপে।

কালো ঝড় বার বার ঘনায় আকাশে
বিদ্যুতের তরবারি দীর্ণ করে মেঘের পাঁজর।
নুয়ে পড়ে মহীরুহ ফুঁসে ওঠে মহানদনদী,
পদ্মার আকাশে কালবৈশাখীর মতো
অতিকায় হস্তিযূথ ছুটে আসে উন্মত্ত বৃংহনে।
চারিদিকে স্থূলতনু বাধার পাহাড় !
মনে হয় আত্মহত্যা করি
অসহ্য এ পলাতক আত্মার প্রলাপ !

হঠাৎ টিকটিকি ডাকে টিক্ টিক্ টিক্
শিশু কাঁদে, মাতা জাগে জলভরা মেঘের ফাটলে
দ্রুতকম্প্র তড়িতের চকিত আভাস !
রজতমায়ার দীপ্ত শূন্যে জ্বালে ক্ষণ-মরীচিকা।
কা'র যেন মৃত্যু হলো কক্ষচ্যুত কাব্যের আকাশে।
কে যেন হারালো নিঃস্ব বুকের নিঃশ্বাস
অনাদ্যন্ত বিরাট জগতে।

মশার কামড়ে জাগা শিশুর ক্রন্দনে
বিরক্ত মাতার কণ্ঠে বহুশ্রুত সুপ্তির গুঞ্জন।
যে মাতা একদা ছিল তন্বীশ্যামা শিখরী-দশনা
আমার ভুবন জয় করেছিল প্রথম যৌবনে
একটি কটাক্ষ শরাঘাতে,
যে কণ্ঠে শুনেছি বীণা সে কণ্ঠ এখন
দারিদ্র-কম্পিত-কাংস্যস্বরা।
হঠাৎ তামস-স্তব্ধ দূর নীলাঙ্গনে
তারা খসে যায়,
ওকি কোনো হতভাগ্য বিদেহ-কবির
গ্রহচ্যুত শিলীভূত খসে-যাওয়া জ্বলন্ত পাঁজর?
পৃথিবী প্রসুপ্তিমগ্ন। নিরবধি কাল।
এখনো বল্মীক স্তূপে 'মরা মরা' জপে রত্নাকর।
মাটির জঠরে সীতা
পুত্রেষ্টিযজ্ঞের বীজমন্ত্রলগ্ন রাম,
এখনো তমসাতীর্থে রতিমুগ্ধ বিহঙ্গমিথুন।
আমারই নিজের সৃষ্টি আমার সংসার
আমার স্রষ্টার
অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আদিম সম্ভোগ-রাত্রি জুড়ে
কামনা-চিতায় পুড়ে পুড়ে
অনঙ্গ রূপের অঙ্গ গড়ে তোলে অতৃপ্ত সাকার।
সংখ্যা বাড়ে কবিসত্তা মোহতন্দ্রাহত
এ বিরাট সমাজের গাণিতিক ভগ্নাংশের মতো!
সুরুচির শুচিগ্রস্ত বিজ্ঞানীরা জানায় ধিক্কার
সজ্ঞানের কৃতকর্মে মুক্তিতেও নেই অধিকার
আমার আত্মার!!

সান্ত্বনায় বেহালা বাজাই
ছন্নছাড়া ভাঙাঘর ঝেড়ে মুছে আবার সাজাই
উৎসাহে কবিতা লিখি
অসংখ্য কেতাব পড়ে কত শব্দ কত তত্ত্ব শিখি!
চিরদিনই শুনি কাব্য শ্রেষ্ঠশিল্প বিশ্বসভ্যতায়
কবিরা শ্রদ্ধেয় জীব কবিত্বের দুর্লভসত্তায়
"অপার কাব্য-সংসারে কবিরেব প্রজাপতি" শুনি,
কল্পনায় স্বপ্নজাল বুনি।
পার্থিব কর্তব্য ভুলে যশোলিপ্সু কাব্যের গভীরে
ডুবে যাই নৈরাশ্য-তিমিরে।
দারিদ্র্যের পঙ্কশায়ী কাব্যের মৃণাল
ঊর্ধ্বমুখী খ্যাতি-পদ্ম মধুরিক্ত পাপড়ির জঞ্জাল।

অভাবের প্রচণ্ড উত্তাপে
এখন ত্রিশঙ্কু-সত্তা নিরাশ্রিত মহাশূন্যে কাঁপে।
অথচ সাজাই অঙ্গে ফর্সা ধুতি জামা
পরিচ্ছন্ন চাঁচাছোলা দাড়ী
অমায়িক ভদ্রবেশে।
লোকে ভাবে পয়সা আছে খাই-দাই ভালো!!
না হ'লে আটত্রিশ ইঞ্চি ছাতি
সুপুষ্ট সবল বাহু জোরালো গর্দান
ক'টা লোক রাখতে পারে কন্ট্রোলের এই দুঃসময়ে?
গুপ্তভাগ্য অট্টহেসে ওঠেঃ
কবি! কবি! কবি!!
কবির কি প্রয়োজন সংসারের কাজে?

ঢং! ঢং! ঢং
তিনটে বাজে বিষণ্ণ মন্থর।
ভাগ্যের আকাশে তারা গুণি
শুনি গান সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের অস্তমিত গান।
কলিতে দুর্জয়-কাল প্রচণ্ড বিক্রম,
নৈষ্কর্মের যম
সূর্যের হৃদ্‌পিণ্ড চুঁয়ে রক্তামৃত ঝরে বরষণ
মহাবিশ্বে রাঙা-বরষায়।
ছিঁড়ে যায় বেহালার তার
ঝনাৎ ঝনন্ ঝন্ বুকে বাজে বিপুল ঝংকার!

২২শে শ্রাবণ ১৩৪১ —সাবিত্রী

বিগত বসন্ত

ঘুম থেকে উঠে প্রাণ-সম্পুটে এটা নেই ওটা নেই!
নবারুণ-রাগে জ্বলে যাই রাগে স্বস্তির আশা নেই!
কর্কশ কাক দিনভোর ডাকে নেই নেই শুধু নেই!
বাজে-পোড়া নেড়া আশাবৃক্ষের ডাল থেকে ফল পাড়ি,
তাও যে বাদুড়ে ঠোকরানো হায় লক্ষ্মীর ফাটা হাঁড়ি
তুমিও অবুঝ হ'লে,
দারিদ্র্য-ছুঁচো কীর্তন গায় ফাটা চামড়ার খোলে।
আমরা দু'জন যে ক'টি জীবন এনেছি এ সংসারে
কত মধুরাতে মুগ্ধ হৃদয় শাস্ত্রীয় ব্যভিচারে,
পরিণামে তাই সুস্থ জীবন সম্ভব হলোনাকো
বৃথা আশা নিয়ে অবাস্তবের নরকেই ডুবে থাকো!

সংসার নয় সুখের রঙ্গভূমি!
প্রতি পদপাতে রক্ত ঝরায় বুঝেও বোঝো না তুমি।
তুমি ভাবো সবই মন্তরে আর অনায়াসে মিলে যাবে
প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজনগুলো সহজেই মিটে যাবে।
বরাতের মুখে ঝাড়ু মেরে যদি ভাবতে ঠাণ্ডা মাথায়
লক্ষ টাকার স্বপ্ন না দেখে শুয়ে শুয়ে ছেঁড়াকাঁথায়,
তা হ'লে অসার কান্নায় আর মিছে অভিমান ভরে
মরতে না ডুবে দুরাশার গহ্বরে!

কার্তিক শেষ শীত পড়ো পড়ো হেমন্তে হিম ঝরে
রাত্রি কাটাবো ছেঁড়া কম্বলও সম্বল নেই ঘরে,
দুঃসময়ের সান্ত্বনা শুধু দেশ নয় পরাধীন
আনন্দে তাই ক্ষুধিত-জঠরে পরমায়ু হ'লো ক্ষীণ।
মিছে অভিমান পড়ে-পাওয়া প্রাণ বুকেই গুমরে মরে
শুধু একা নই নবরামায়ণী সমাজের ঘরে ঘরে।
শান্তির জল ছিটোয় বেতার ভোব থেকে রামধুনে
ভুঁখা জনতার বুকে পাখোয়াজ বেজে যায় চৌদুনে;
আমরা দু'জন যাদের এনেছি যৌবন-উৎসবে
সূতিকাগারের শঙ্খ বাজায়ে কোকিলের কুহু রবে
বেহিসাবী যৌবন
টাকায় পাঁচ-পো দুধ জোগাবার চিন্তায় উচাটন!

ভুল নয় সখি, তোমার পাবার উদ্দাম-কামনায়
প্রেমের উনুনে দেহের কড়ায় আদিরস জ্বলে যায়;
শরীরের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধোঁয়াটে গন্ধ তা'ব
ভরপুর কোরে বেখেছে ঘরের ছাঁপোষা অন্ধকার।
মরা-কোকিলের ডানার আঁধাব বসন্ত গেছে ডুবে
মরা-চাঁদ ওঠে মবা-আকাশের সিঁড়ি ভেঙে চুপে চুপে।
তেপান্তরের প্রৌঢ়-জ্যোৎস্না ভাঙা লণ্ঠন হাতে
গুঁড়ি মেরে চলে দুর্ভাবনার ঘনতমিস্ররাতে,
দখিণা মলয় ক্লান্ত শ্রান্ত হাঁপানীতে ভুগে ভুগে
অশোক বকুল ফোটে না প্রিয়ার হাজা-ধরা পদযুগে।
ভাঙা ঘরে বসে শবের কলমে স্থবিব পঞ্চশর
হিসাব নিকাশে বিরত আজ ঋণভারে জর্জর,
পশে না সুরভি নাসারন্ধ্রের অসাড় অন্ধকারে,
চম্পক-হেনা-রজনীগন্ধা ফিরে যায় হাহাকারে!
কি হবে কাঁচুলি বেঁধে?
দুধের অভাবে সন্তান যা'র ধুঁকে মরে কেঁদে কেঁদে!

১৭ই চৈত্র ১৩৫৫ —সাবিত্রী

প্রেম ও সমাজ

প্রলাপ-জড়ানো যত কথা ছিল দুজনার ভীরু মনে,
সারারাত ধরে সবই তো বলেছি নির্জন গৃহকোণে।
তোমার আমার পাওয়া না-পাওয়ার
জীবন তো নয় লঘু-বাসনার
ছোট সুখ ছোট দুখের আকাশে অলীক ইন্দ্রধনু,
চির-অতৃপ্ত কামনার পটে অতনুর মায়াতনু॥

চারিটি দেয়ালে রুদ্ধ-জীবন কামনার কারাগার,
শ্বাসরোধে প্রেম মরে যায় বুকে সে গোপন হাহাকার
খাঁচায় বন্দী বিহগের মতো
পক্ষ ঝাপটি মরে অবিরত
বাহিরে বিরাট পৃথিবীর মহাদুঃখের তুলনায়,
তোমার আমার দুঃখের কথা মনে হ'লে হাসি পায়॥

অলস আরাম, একখানি বাসা করেছিলে শুধু আশা,
পশেনি শ্রবণে সারাদেশ জুড়ে সর্বহারার ভাষা ?
ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে
ধর্মের চাকা আকাশে উড়েছে
কোটি মানুষের বাস্তু পুড়েছে সোনার বাংলাদেশে,
দেশ-মাতৃকা ডাকিনীর মতো উঠেছে অট্টহেসে॥

নিঝুম রাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে হঠাৎ কোকিল ডাকে,
রক্ত বরণ চাঁদ উঁকি দেয় কৃষ্ণমেঘের ফাঁকে।
তুমি শুয়ে আছো মোর বাহুপাশে
নীরব রাতের ক্রুর পরিহাসে
পথের ধূলায় শত শত বাহু ঘুমহারা বেদনায়,
তোমার আমার দুঃখের কথা মনে হ'লে হাসি পায়॥

শত শিখা মেলি কোটি মানুষের দুখের অগ্নি জ্বলে,
ঘন ঘন নড়ে বাসুকির ফণা সমাজভিত্তি তলে;
চারিটি দেয়ালে রুদ্ধ জীবন
ভেঙে বাহিরায় বিদ্রোহী মন
তোমার আমার ছোট সুখ ছোট দুখের ভাবনা ভুলে,
ছুটে চলি তাই কোটি মানুষের ভাবনা-সিন্ধুকূলে।

৭ই আশ্বিন ১৩৫৬

—সাবিত্রী

ঘরোয়া

তোমায় শোনাবো প্রেমের কাব্য এমন ভাগ্য করিনি
শোনালে হয়তো শোনাতে ওষ্ঠ বাঁকায়ে,
'কোথায় শিখলে এতো ঢঙ্ এতো রঙ্গ ?
বানিয়ে বানিয়ে মন-ভোলানোর যত মিছে কথা লিখলে !
জ্যান্তে দাও না ভাতকাপড়
ম'লেই করাবে দানসাগর
আহা মরে যাই, সখের আদর !
এসব ছলনা বলো না কোথায় শিখলে ?"

তোমায় শোনাবো প্রেমের কাব্য এমন ভাগ্য করিনি,
এ সংসারের বোঝা বহে শুধু মরেছি;
ফুলের মুকুট মাথায় কখনো পরিনি
এ যাবৎ তাই জ্বালাপোড়া নিয়ে কাব্য রচনা করেছি।
প্রেমের কবিতা শুনে
যত খরশান বাণ আছে তব তূণে
পাছে একে একে বিঁধে দাও বুকে
প্রেমিক না হ'য়ে স্বামীরূপ তাই ধরেছি।

রসিকতা কোরে যখনি তোমায় বলেছি প্রেয়সি, প্রিয়ে,
মুখভার কোরে তখনি বসেছো ধোপার হিসেব নিয়ে।
কুড়ি পেরুতেই হয়ে গেছো পাকাগিন্নি,
উপবাস কোরে মাঝে মাঝে দাও সত্যনারাণে সিন্নি।

৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ —সাবিত্রী

কোকিল

পুরোনো ফাগুনে পুরোনো কোকিল যখন ডাকে
জানি না কা'কে,
মনে পড়ে যায় দুপুরবেলায়
যেই ফাঁক পাই কাজের ঠেলায়,
দক্ষিণ থেকে উষ্ণ-উদাস বাতাস বয়
আকাশময়।
কবে যে কখন বয়স বেড়েছে
কত সঙ্গীরা সঙ্গ ছেড়েছে
নতুনেরা কত এসেছে
সকাল-সন্ধ্যা দুই দিগন্ত রঙের প্লাবনে ভেসেছে।

আজো ফাল্গুনে বসন্ত আসে মূর্চ্ছনা কাঁপে পঞ্চমে
নানা অকারণ চিন্তায় মন থম্‌থমে,
সূর্যের পানে চেয়ে থাকে রাঙা পলাশবন
উদাস মন,
ক্লান্ত জীবনে পুরোনো কোকিল যখন ডাকে
জানি না কাকে
মনে পড়ে যায় বড় অবেলায়
নানা ঝঞ্ঝাটে বসন্ত যায়
বনপথে শুনি চিরদিনকার কোকিল ডাকে
কাজের ফাঁকে।।

১লা ফাল্গুন ১৩৪৪ —সাবিত্রী

অভিনন্দিতা

[বুদ্ধদেব বসুর "কঙ্কাবতী" পাঠে]

প্রকাণ্ড এই আকাশভরা
সোনালী চাঁদ রূপালী তারা
বাগানে ফুল, মাঠের ধান, নদীতে ঢেউ-কাঁপা
গতির চপলতা,
পেছনে ফেলে যেতেই হবে যা'কিছু হ'লো পাওয়া
যা'কিছু পাওয়া হয়নি তা'ও—
আকাশ-বাতাস-মেঘ-বিদ্যুৎ-দম্‌কাঝড়ের হাওয়া—

নিঝুম দুপুর—শান্ত ভোর—রাত্রি ঝিঁঝি-ডাকা
স্বচ্ছজলে ক্ষণিক ছায়া, ঘাসের ডগায় ফড়িং
লালফুলে নীল-সোনালী প্রজাপতি
একটু খোলা হাওয়া
সবার চোখের আড়ালে কাছে পাওয়া
জড়িয়ে ধরে আদর কোরে লুকিয়ে চুমু-খাওয়া!'
থাকবে সবি পেছনে পড়ে, সুখের কৃষ্ণচূড়া
ছড়িয়ে দেবে রক্তরাঙা পাপড়ি এলোমেলো
হারানো-দিনের ধুলোয়।
চেনা-অচেনা সুরগুলো সব শূন্যে মেলে ডানা
বাতাসে যাবে মিলিয়ে—যাবে মিলিয়ে—

কোকিল ডাকে—নীলকণ্ঠি বুলবুল
শীস্‌ দিয়ে যায় বাতাস চিরে ফাল্গুনী-মৌমাছি
মন্‌কে ঘিরে গুন্‌গুনিয়ে ওঠে।
ফিরে চাইবো ? সময় কোথা ? বয়স যে যায় বেড়ে!

জ্যোৎস্না দেখে রাত-কাটানোর নেশা
কাটেনি বুকে বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতীর' প্রেমে
পদ্ম ফোটে, প্রেমিক-কবির মতো
এখনো ডাকি নিঝুম রাতে, কঙ্কা।
হাতের ওপর হাতটি রাখো! রেখো না কোনো শঙ্কা!

রূপকথা-রাত পেছনে ফেলে স্বপ্ন-দেখার মতো ঃ
মেঘের সোনা—সমুদ্রে নীলঢেউ
বটের ঝুরি—রাঙাসন্ধ্যা—নিতল কালোদিঘি
তামাটে চাঁদ শ্মশান-জাগা,—পেছনে ফেলে যাবো।
অচেনা-চেনা অজানা-জানা যেখানে যারা আছে
থাকবে সবাই পেছনে পড়ে দীপ্ত
কঙ্কাবতীর রূপের শিখায় মুগ্ধ পরিতৃপ্ত!

বাবলাগাছে মনটা যেন হাল্কা ফিঙে পাখি
হলদে ফুলে ভর দিতে যায়, পায় না বসার ঠাঁই
উড়তে গিয়ে আকাশ দেখে কাঁপায় ক্ষুদে ডানা
জীবনটা কি দিগন্তহীন শুধুই নিষেধ মানা?
পেছনে ফেলে যাবোই তবু যশকে ভালোবেসে,
ঈগল হয়ে উড়তে গিয়ে পৃথিবী ঘুরে এসে
উষ্ণ কোমল বুকের নীড়ে তাইতো গেছি থেমে
ফাগুন হাওয়ায় প্রেমিক কবির কঙ্কাবতীর প্রেমে।

২৭শে জুলাই ১৯৩৭

চোখ গেল

আগুন-লাগা লালচে আকাশ লাল-পদ্মের রং
চোখ গেল! চোখ গেল!
অশোক-পলাশ-কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় রং
চোখ গেল! চোখ গেল!
রূপতরাসী অন্ধপাখির কান্না
শূন্যে জ্বালায় পান্না
ছন্দ মেলায় বুক-ফাটা সুর নিংড়ে আগুন-ঢালা
প্রেমের পূজায় স্ফুলিঙ্গে ফুল ফুটিয়ে গাঁথে মালা।

ফাগুন এলো সবুজ বনের চূড়ায় ফুলের মেলা
চোখ গেল! চোখ গেল!
দিঘির বুকে ঢেউ-কাঁপানো বাতাস করে খেলা
চোখ গেল! চোখ গেল!

হালকা হাওয়া নীলাম্বরী কাঁপায়
ক্লান্ত পাখি হাঁপায়।
আগুন-লাগা অন্ধ বোবা নীল-আকাশের বুকে
চোখ-গেল-গান লালপদ্মের পাপড়ি ঝরায় সুখে।

৩রা এপ্রিল ১৯৩২

আমার কথাটি ফুরুলো

'আমার কথাটি ফুরুলো!' কিন্তু ফুরুলো না!
উষ্ণশ্বাসের অযুত কাহিনী জুড়ুলো না।
তোমারই যুগের কত ভাঙা-সেতু
পড়েনি নজবে জানি তা'র হেতু
জীবনে জীবনে কত কান্নার বাঁধভাঙা বাণী-বন্যা,
ছায়ায় ছায়ায় মিশে গেছে কত জানতে কি রাজকন্যা ?

কত শঙ্কিত চাঁদেরা গহন বনতলে
কুসুম ফোটাতো রজনীব কালোকুন্তলে।
তুমি তো ঘুমাতে পালঙ্কে শুয়ে
কোমল চবণ পড়তো না ভুঁয়ে
বাঁদীবা ঢুলাতো ব্যজনী চামর কৃপা-কণিকায় ধন্যা
বনচারী চাঁদ ডুবে যেতো বনে তুমি কি জানতে কন্যা ?

তোমার কথাই সাবা ইতিহাস পাতা জুড়ে,
লিখে গেছে তাই না-বলা-কথারা মাথা খুঁড়ে
মরেছে অন্ধ-কালের পাষাণে
নীরব প্রাণের রূঢ় অবসানে
কথার অগ্নি-সাগরে মিশেছে অশ্রুত বাণী-বন্যা,
কত যে না-বলা কথা মরে গেছে হে রূপকথার কন্যা!

তোমার প্রাসাদে পড়তো কত কি শুকসারী,
মানে অভিমানে কথায় কথায় মুখ ভারী
যখনি ক'রতে, যারা প্রাণপণে
হাসিটি তোমার ফোটাতো যতনে
খোঁপার একটি ফুল ফেলে দিয়ে যা'দের করতে ধন্যা,
তাদের কথার শেষ ছিলোনাকো জানতে কি রাজকন্যা ?

তোমার বাসর-জাগানীরা তবু আশেপাশে
করুণার মতো মানবী-ধরার ইতিহাসে,

অকথিত কত কথার বাঁধনে
গোঙাতো রজনী নিভৃত-কাঁদনে
তোমার কথাটি ফুরুবার আগে তাদের কথার বন্যা,
বহে যেত কালো-যবনিকা তলে হে রূপকথার কন্যা!

হায়রে জীবনে ঘুঁটে-কুড়ুনীরা বনে বনে
পরশ-মাণিক খুঁজে সারা হ'তো মনে মনে,
হয়তো হঠাৎ ক্রূর দাবানলে
তাপ লেগে জ্বলা ছিন্ন-আঁচলে
গেরো দিতে দিতে মণিহারা মনে দু'চোখে বইতো বন্যা
কথারা কখনো ফুরুতো না তাই হে রূপকথার কন্যা!

চৈত্রসংক্রান্তি ১৩৪৪ —সাবিত্রী

রাজকন্যার প্রতি

রাজপুত্র নই কিম্বা বিত্তশালী রাজার নফর
হাতি ঘোড়া উট নেই নানাদেশ করিনি সফর
ট্রামে বাসে যাতায়াত করি,
কেরাণীপুত্রের প্রেম জানি সহ্য হবে না সুন্দরি!
মিছে কেন ছলাকলা
রাঙাওষ্ঠে মাদকতা মুছে ফেল মসৃণ-কুন্তলা,
নিতান্ত গরীবজনে
সাম্প্রতিক কামনায় দেবতা-দুর্লভ ঐ মনে
কণামাত্র দিওনাকো স্থান,
দারিদ্র্যের ভয়ে জেনো অতনুর ত্বরিত-প্রস্থান
অতীব বাস্তব কথা
ঢাকো ঢাকো সুরঞ্জিত কপোলের লুব্ধ আকুলতা।
রাজার নন্দিনী তুমি, রাখালের মোহ
ত্যাগ করো, তব পিতৃ-প্রাসাদের সিঁড়ি দুরারোহ
তোমার যৌবন
রাখালের কাম্য নয় বেচারা নিতান্ত অভাজন,
কাব্যের জগতে মারে রাজা ও উজীর
নিরীহ সন্তান সে যে উপেক্ষিতা দীনা পৃথিবীর
ঘোড়ারোগ সাজেনাকো তা'র
রাজকন্যা দূরে থাক ভিক্ষুকের কন্যাও যে তা'র
অতি গুরুভার,
অতএব হে সুন্দরি! দীনজনে করো পরিহার।

১৫ই মে ১৯৩৭

স্বপ্নভঙ্গ

আমার ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ীটা ঘিরে
বসন্ত তুমি কতবার গেছ ফিরে
দরোজার কড়া নেড়ে,
নবরাস-রসে কত গোপিনীর শিথিল কেশের কাঁটা
চিরে দিয়ে গেছে অন্ধ-বুকের পাটা
চিৎকার করে জেগেছি স্বপ্নে কতবার ডাক ছেড়ে,
বসন্ত তুমি বিদায় নিয়েছ দরোজার কড়া নেড়ে ॥

কোকিলের ডাকে উন্মনা হ'য়ে কত
সঙ্গিনী খুঁজে পাইনিকো মনোমতো
মাইনে গিয়েছে কাটা,
কেরানি-জীবনে কত শতবার অবেলায় ছুটি নিয়ে,
নিজেকে নিজেই উঠেছি ধমক দিয়ে,
ঘড়ি দেখে হায় আসেনি জোয়ার আসেনি জীবনে ভাঁটা।
কোকিলের কুহু চিরে দিয়ে গেছে অন্ধ-বুকের পাটা ॥

পাঁজীর পাতার শুধু দুটো মাস ঘিরে
বসন্ত তুমি কতবার গেছ ফিরে
ফাগুনে চৈতিরাতে,
প্রেম-যমুনার কলকল্লোলে বিজন বংশীবটে,
অভিসার-পথে অপবাদ শুধু রটে!
ট্যাঁকে নেই টাকা ফাঁকা-প্রেম তাই মরে যায় অপঘাতে,
পাঁজীর পাতায় ডুবে যায় চাঁদ বিবশ পূর্ণিমাতে ॥

বসন্ত তুমি কতবার অভিমানে
বিদ্রোহী মনোবাসনার গানে গানে
দিয়েছ স্বপ্ন-দোলা
রাজধানী থেকে কঠোর হুমকী দরোজার কড়া নেড়ে,
স্বাধীন-ভারত চাকরিটা নিলো কেড়ে,
পাকাদেখা ভেঙে রিক্ত-জীবন বিবাগী আত্মভোলা,
চৈতালি চাঁদ দিয়ে গেছে তাই বিদায়ের শেষ দোলা ॥

১৭ই আশ্বিন ১৩৫৫ —সাবিত্রী

সাম্রাজ্যবাদী শহরে সূর্যোদয়ঃ ১৯৩৭

ধাঙড়ের হাতে ঠেলা ময়লা-ফেলা গাড়ীর চাকায়
ঘুমভাঙা পৃথিবীর মুখে সূর্য আবীর মাখায়
অপমানে লজ্জায় রাঙানো
হে দাম্ভিকা নাগরিকা এ ঘুমভাঙার অর্থ জানো?
হাড়ে হাড়ে এ দিনযাত্রার?
ধাঙড়ের ঝাড়ু দিয়ে সাফ-করা এই সভ্যতার!
শ্বেতাঙ্গশাসিত এই নিগৃহীত আর্তজীবনের
জানো অর্থ রক্তরাঙা এই প্রভাতের?
কী দুঃসহ বিড়ম্বনা এই জাগরণ
এ প্রাণধারণ!
হে কৃত্রিম-আভিজাত্য, ভোর থেকে রাত
জীবনের অশান্ত সংঘাত
রাজপথে কারখানায়
বাজারে বন্দরে ব্যাঙ্কে সদাগরী-দপ্তরশালায়
গীর্জায় মসজিদে মঠে বিশ্ববিদ্যালয়ে
নিষ্প্রভ দীনতা জাগে প্রাত্যহিক এই সূর্যোদয়ে।

হে মহানগরী
কি লাভ পোহায়ে বিভাবরী?
থানায় গারদে জেলে
দেশপ্রেম অবরুদ্ধ 'সলিটারী-সেলে';
স্বদেশলক্ষ্মীর শব ফাঁসিকাঠে ঝোলে
গুলিবিদ্ধ ছত্রভঙ্গ জনতার বিদ্রোহ-কল্লোলে
উৎক্ষিপ্ত ঘৃণায় ভাসে লক্ষ লক্ষ ধাঙড়ের ঝাঁটা!
প্রত্যহের সৌরস্রোতে এ সাঁতার-কাটা
ভোর থেকে রাত
নিত্য চলে জীবনের অশান্ত সংঘাত!

১৭ই মে ১৯৩৭

চৌরঙ্গীঃ ১৯৪২

পায়ের তলায় মৃত অজগর মুখর পিচের রাস্তা
কাঁপে থর থর যান্ত্রিক লরী-ট্যাক্সি-বাসের ছন্দে!
ল্যাম্পপোস্টগুলো ছায়ার শরীর জীবনের নেই আস্থা
উটমুখো টলে ট্রাফিক-পুলিশ বিলিতী মদের গন্ধে।

নিষ্প্রদীপের যবনিকাতলে দলে দলে চলে পান্থ
দূরে আকাশের নৈশ-প্রহরী মঙ্গলগ্রহ জ্বলছে;
অক্টারলোনী-মনুমেন্ট চূড়া রাত জেগে জেগে ক্লান্ত
লৌহচক্রে ঝংকৃত গতি ট্রামকারগুলো চলছে।

আমাদের মন মৌনদহন স্তব্ধ প্রলয়লগ্ন!
রাঙামুখ খাকী-পোষাকেব দল পথ হাঁটে বীরদর্পে,
শোণিতবর্ণ মঙ্গল-গ্রহ কুটিল-চিন্তামগ্ন!
আমাদের কালো-চামড়া, কপাল কামড়েছে কালসর্পে।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ —ন্নিগ্রহ

কালীঘাট

কানাগলিটার পশ্চিমে আদিগঙ্গার তট জুড়ে
হরিণবাড়ীর জেলের পাঁচিল খাড়া।
দক্ষিণে জ্বলে কেওড়াতলার রাক্ষুসে চিতাগুলো
আকাশে বাতাসে ধূমল গন্ধ উৎকট মড়াপোড়া॥

বলির পাঁটাবা প্রাচীনা কালীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
বিপুল পুণ্যে ডাক ছাড়ে হাঁড়িকাঠে।
অবিবাম ভিড় পুণ্যলোভীর পাণ্ডাপুরুতে ঘেরা
মা হ'বার লোভে ষষ্ঠীতলায় বন্ধ্যারা বুকে হাঁটে॥

পীঠস্থানের এই পরিবেশে আমাদের কানাগলি
শতবর্ষের স্যাঁৎসেঁতে সাধনায়।
নোনাধরা ভাঙা দেয়ালের চাপে জোগায় কাব্যে ভাষা
সতীর ছিন্ন কড়ে-আঙুলের খুনমাখা তমসায়॥

এখানে আমার পাঁজর-খসানো বুকের অন্ধকারে
রূপসী-কাব্য রূপ বেচে খায় চোখে মুখে ছলাকলা।
এখানে আমার গানের পশরা সকরুণ ঝংকারে
সুলভে বিকায় সুর-বণিকের মনোরমা চঞ্চলা॥

আমার কাব্য আমার গানের ভিখারী জন্মদাতা
ভাড়াটে ঘরের কাব্য-বিলাসী আমি।
গলায় দেবার দড়িটা পাকাই ছিঁড়ে কবিতার খাতা
চিরপলাতক আশার-স্বপ্নে মৃত্যুর অনুগামী॥

আদিগঙ্গায় হাঁটুজল কাঁদে বন্যার কামনায়
হরিণবাড়ীর জেলে বেজে ওঠে হঠাৎ পাগলাঘণ্টি।
ভাড়াটে ঘরের কাব্যের ব্যথা সুর্যের সাধনায়
সাতরঙা-মনোবাসনাপূরণে হবে কি ময়ূরকণ্ঠী?

২রা অক্টোবর ১৯৫৯

সাধনা

মিথ্যার পাহাড়ে বসে সত্য-সাধনার
মালাজপ। পতঞ্জলী-মন
'জপে সিদ্ধি' এ বিশ্বাসে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
বেহুঁস ব্রহ্মের ধ্যানে।
কাক ডাকে কার্নিশে কার্নিশে,
চড়ুই ঘুলঘুলি পথে,
টিকটিকির পতঙ্গ-শীকার,
একটানা জীবযাত্রা জীবন-সংকটে।
চিড়-খাওয়া মিথ্যার পাহাড়
তেতে ওঠে উষ্ণতায় জঠরে জটিল বৈশ্বানর
নিরবধি অনির্বাণ।
হাই তোলে একশো-আট সদানন্দ গুরু
দুই চক্ষু ঢুলু ঢুলু তুড়ি মেরে 'রাধে কেষ্ট রাধে'!
নিরিন্দ্রিয় আয়ান-বয়ান
শিষ্যবৃন্দ সারি সারি
গোপ নয় গোপীতত্ত্বে ভক্তিমতী নারী
গুরু? ভব-ভয়ের কাণ্ডারী!!

হঠাৎ বলির পাঁটা ডেকে ওঠে তীর্থের খোঁয়াড়ে
ধোঁয়া ওঠে অগ্নিগর্ভ চিন্তার পাহাড়ে।
হে আত্মার মুক্তিযাত্রাপথ,
স্বর্গ নেই কোনোখানে
শাস্ত্রীয় উদ্যানে
অলৌকিক আখ্যানে ব্যাখ্যানে!
পাতঞ্জলতত্ত্বে নয়—
ট্রামে-বাসে-ট্রেনে-এরোপ্লেনে
এই মহাসত্যটুকু জেনে
কুরুক্ষেত্রে বুকে হাঁটে চাকাভাঙা কপিধ্বজ রথ।

২৬শে মার্চ ১৯৩৫

দিন-রাত্রির কাব্য

দিনের ঝাঁঝালো আলোর কল্পনারা
গুহায় লুকিয়ে থাকে
দিন শুধু আনে কালো-নোনাঘাম
কোনো খাটুনির জোটেনাকো দাম
পথে-প্রান্তরে খাড়া দারোয়ান
কাজের পথের বাঁকে ॥
দিনের সূর্য লাগায় গুম্ফে চাড়া
পিলে-চমকানো ডাকে ॥

কী যে আসুরিক দিনের কাব্যধারা
রোদের সাহারা বুকে।
রুক্ষপথের চোখা চোখা দাঁত
পায়ে পায়ে যেন চালায় করাত
বেকার জীবনে ভাগ্য বরাত
শ্বাস টানে ধুঁকে ধুঁকে।
আশাবাদী মন তবুও আকুলপারা
মুক্তির ধুলো শুঁকে ॥

জোনাকীর আলো রাতের অন্ধকারে
স্বপ্নের বনভূমি
রোমাঞ্চকর ঝিল্লির ঝংকারে
খুঁজে মরে কোথা তুমি?
কোথা তুমি কোথা তোমার ঠিক-ঠিকানা
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী রাতে কানা
খঞ্জকে তাই হাতছানি দেয় খানা
কোথা তুমি? কোথা তুমি?
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়েনাকো চীৎকারে
আহত ললাট চুমি' ॥

থার্মোমিটারে রজতবর্ণপারা
থরো থরো সন্তাপে
কাঁপুনী ধরায় হাড়ের শুকনো-কারা
ভেঙে পড়ে অভিশাপে?
ছেঁড়াকাঁথা ঢাকা ভাঙাখাটিয়ার বুকে
ভুল বকে যায় কবিতা সকৌতুকে
শিথিল ছন্দ নিষ্ফল মনোদুখে

স্মৃতির আঁধারে কাঁপে
ক্ষুধিত পাষাণ রাতের কাব্যধারা
স্বপ্নের অভিশাপে॥

১৫ই আগস্ট ১৯৫৪

ইঁদুরের হাড়

স্বপ্ন দেখেছি কাল রাতে
কোথা ঠিক মনে নেই গাঢ়তন্দ্রাতে।
দু'পাশে বাঁশের বন নুয়ে নুয়ে পড়ে
এলোমেলো ঝড়ে।
অচেনা কে যাচ্ছিল লণ্ঠন হাতে
ঝাপসা দেহটা তা'র গাঢ়তন্দ্রাতে,
ক্রমে দূরে সরে-যাওয়া আলোছায়া নড়ে
এলোমেলো ঝড়ে।

গ্রামের নামটা ঠিক পড়ছে না মনে
জোনাকীরা জ্বল্‌ছিল আমলকীবনে
মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁদের ডাক,
ডাকাতের কালোদিঘি ছিল নির্বাক।
তারাহারা মহাকাশ গুণ্ঠিত মেঘে
ঝোড়ো-হাওয়া বইছিল বেগে।

আব্‌ছা আব্‌ছা দূরে ছোট ছোট গ্রাম
কত তা'র নাম!
একা জেগে জটাধারী বুড়ো মহাকাল
ছেঁড়াকাঁথা মুড়ি দিয়ে পাড়্‌ছিল গাল,
নতমুখ অপবাধী শবীরেব ছায়া
শঙ্কায় কাঁপছিল সে রাতের মায়া।
নিবে গেছে লণ্ঠন লোকটাও নেই
কিম্ভুতকিমাকার স্বপ্নের খেই,
টুক্‌বো টুক্‌বো হ'য়ে উড়ে গেছে ঝড়ে
আলো নেই ছায়া শুধু নড়ে।
হঠাৎ হুতুম প্যাঁচা কর্কশ ডাকে
উড়ে গিয়ে বসেছিল অশথের শাখে;
চারিদিকে ঘেরা ছিল ঘুমের পাহাড়
বেরাল চিবুচ্ছিল ইঁদুরের হাড়!

২রা জুন ১৯৩৮

হাসি

হেসো না অট্টহাসিতে মুখর,
পাতাঝরা দিন ক্ষুব্ধ প্রখর।
হেসো না!
দুকূলে স্বর্ণসীতার চিতার
শিখা থম্‌থম্‌ অপমানিতার
শ্মশানে চতুর শৃগালের হাসি
হেসো না!

তুচ্ছকথার পুচ্ছ-নাচানো ভাবের ভবনে মন-চুরি
তোমার হাসির খোরাকে আমার হৃদয়-জ্বালানো ফুলঝুরি,
রাঙা-আগুনের ফুল্‌কী ছড়ায়
মনের নয়নে অশ্রু গড়ায়
অন্তরতলে হাস্যরসের ঘোরায় ঘূর্ণিবাত্যা,
প্রলয়ঙ্কর হাসি হেসে ওঠে আমার ক্ষুব্ধ আত্মা।

আমার হাসিতে তুমি খুশি হবে হাসবে হাসাবে হায় কপাল!
সূর্য-জ্বালানো হৃদয়-গলানো আমার কাটবে সারা সকাল;
হাসির পশরা শেষ ক'রে দিয়ে
রিক্ত-বুকের গুরুভার নিয়ে
সন্ধ্যাবেলার শূন্য-হাঁড়িতে আমার জোটে না দুমুঠো চাল।

তোমার সভায় অনাদ্যন্ত আমার ভাঁড়ামী হাস্যকর
আমার দন্ত-কৌমুদী রচে স্বপ্নের দিবা-দ্বিপ্রহর,
আমার হাসিতে সূর্যমুখীর পাপড়ি-কাঁপানো দিন-দুপুর
রোদে-ঝলসানো অট্ট-আওয়াজে চমকে চেঁচায় ক্ষ্যাপা কুকুর।
তুমি চাও আমি হাসির কাব্যে
হাসাবো তোমায় সবাই ভাব্‌বে
সাবাস আমার তুব্‌ড়ী-ছোটানো ছন্দে-ফোটানো হাস্য;
বুঝবে না তা'রা হাসির পেছনে অলিখিত টীকাভাষ্য।

সামন্তযুগ-মন্থিত হাসি ঝাড়লণ্ঠনে ঝংকৃত
লজ্জাবিহীন মজ্জামেদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সম্বৃত!
বোলো না হাসতে শুক্‌নো বুকের
ক্ষুধাজর্জর মলিন মুখের
ভাঁড়ামীর হাসি হাস্‌তে আমায় বোলো না,
তোমার হাসির খোরাকে আমার
ছন্দ-বীণায় কেটে গেছে তার
হাসির কাব্য এ জীবনে তাই হোলো না আমার হোলো না!

শেষদিন এলে হাস্‌বোই জেনো গন্‌গনে লাল ক্ষ্যাপা-হাসি!
হাততালি দেবে সারা দুনিয়ার বঞ্চিত যত উপবাসী,
সোজা করে যত বাঁকা শিরদাঁড়া
বিকট হাস্যে দেবে মাথানাড়া
সে হাসিতে তুমি হেসে খুন হবে গলায় পরবে নীলফাঁসি;
সে হাসির আগে বোলো না আমায় হাসতে ভাঁড়ের দেঁতো-হাসি।

২৭শে জুলাই ১৯৫০ —ক্ষুধা-ভারত

রাজা হও

ছোট্টমেয়েটা কচিহাত পেতে পয়সা চায়
দিলুম একটা ফুটো-তামা হাতে ফেলে।
মেয়েটা বললে, "জয় হোক বাবা রাজা হও!"
শেখানো-কথার সনাতন বিষ ঢেলে।
স্বাধীন দেশের জমকালো এই শহরে বিষ
মেয়েটা খেয়েছে ডাস্টবিন থেকে তুলে
স্বর্ণচূড়ারা মৃত্যুর ধ্যানে নির্ণিমিষ
বিলিতী সুরায় বায়রনী সোডা গুলে।

মেয়েটা বললে, "দয়া করো বাবা রাজা হও!"
রাজারাজড়ার মহিমায় হাত পেতে;
রাজপথচারী পাথুরে-মানুষ নির্বিকার
নাকে দড়িবাঁধা দুরন্ত শহরেতে।
মেয়েটা অবোধ! জনতাকে ডেকে রাজা বানায়
রাজা হবে তা'র সময় যে নেই কারো!
পুরোনো রাজারা বেসামাল হয়ে ডোবে খানায়
অভাগী মেয়েটা রাজা চায় তবু আরো?

৩রা জুন ১৯৫৫

অতন্দ্র প্রহরী

[ব্লাড্‌-প্রেসার স্ট্রোকে শয্যাশায়ী অবস্থায়]

ভেবে ভেবে রাত্রিদিন ভেঙে গেছে বুকঃ
আশাবাদী কাব্যে নেই ভাষা,
চিন্তা করে বিদ্রোহ-ঘোষণা!
আমি যদি মরে যাই আচম্বিত-মৃত্যুর আঘাতে
কতটুকু ক্ষতি কার?
শুধু এক অনাথ-সংসার
মিশে যাবে নিরাশ্রিত অগনিত অনাথের ভিড়ে!

যদি সূর্য নিবে যায় দু'চোখের দিবা-দ্বিপ্রহরে
পথ যদি থেমে যায়
কালের যাত্রায়
অসমাপ্ত আকাঙ্খার মাঝে
আচম্বিত-অন্ধকারে প্রলয়ের শঙ্খ যদি বাজে
বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু ক্ষতি?
কে কা'র খবর রাখে জনতার সমুদ্র-কল্লোলে!

যে সন্তান বাবা ব'লে ডাকে
আদরে জড়ায় কণ্ঠ আমারি সৃষ্টির শতদল
ঝরে যাবে পিষ্ট হবে এ নিষ্ঠুর সমাজের বুকে,
দয়ার কাঙাল হ'য়ে নেবে ভিক্ষাব্রত
কিম্বা চুরী সমাজের বৈষম্যের নিত্য পদাঘাতে।
আদরিণী প্রেয়সী আমার
দাসীত্বের অপমানে দগ্ধে দগ্ধে পুড়ে হবে ছাই
নারীমেধযজ্ঞভূমি ধনবাদী ক্রূর-মৃত্তিকায়
আমার মৃত্যুর অভিশাপে;
কন্যা হবে দেহপণ্যা লম্পটের ক্ষুধার ইন্ধন
আমি যদি মরে যাই
আমি যদি থেমে যাই প্রগতির জয়যাত্রাপথে!

হে আকাশ, হে পৃথিবী, শত দুঃখে শত নিরাশায়
দারিদ্র্যে ব্যাধিতে নির্যাতনে
আমি যেন বেঁচে থাকি ক্ষমাহীন প্রহরীর মতো
সংসারের সমাজের দেশের দশের প্রয়োজনে!
আমি যেন জোগাই ইন্ধন
চেতনার অগ্নিকুণ্ডে,
আমি যেন দিতে পারি স্নেহ-প্রেম-শ্রদ্ধার সম্মান!

৩০শে এপ্রিল ১৯৫৩

চাকরী করো

সেদিন বোঝাতে এলো হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু একজন,
পরমবিজ্ঞের মতো সুচিন্তিত হিসেবী-ভাষণে:
'অর্থহীন বিদ্রোহের কাব্য লেখা ছেড়ে
সংসারের মুখ চেয়ে,
চাকরী করো সদাশয় সরকারের বশংবদ হ'য়ে।'

সে কথায় হেঁচে উঠে ল্যাজ তুলে প্যালালো গরুটো
পাষাণ ফুটপাত থেকে;
ট্রামের পা-দানী ফস্কে পড়ে গেল সরকারী পিওন
ছাঁটায়ের ফাইলের চাপে!
তারা খসে গেল শূন্যে,
চরকা-আঁকা তেরঙা পতাকা
শাঁ শাঁ ক'রে উড়ে গেল গরুর হাঁচির হাওয়া লেগে,
খাড়া হ'ল কুকুরের ল্যাজ
যে কুকুর হন্যে হয়ে রাজপথ আলো ক'রে ঘোরে।

তবুও বোঝালো বন্ধু, "কাব্য লেখা ছেড়ে
চাকরী করো, ছাড়ো মিছে বিদ্রোহ-বিলাস!"
সে কথায় খাটে-শোওয়া মড়া
শববাহীদের কাঁধে উঠে বসে তাকালো বিস্ময়ে
ভ্রূকুটি কুটীল চোখে।
সে কথায় বাঘমুখো-দোতলা বাসের
টায়ার বিদীর্ণ হলো উমেদার বেকারের চাপে!
একরাশি কৃষ্ণচূড়া-রক্তের ঝলক
রাঙালো কেল্লার মাঠ,
চীনাবাদামের খোসা উড়ে গেল তৃণশয্যা ছেড়ে।

১৫ই আগস্ট ১৯৫৩

দাঁড়কাক

কালীঘাট-ব্রিজে গ্রহতারাদের ভীড়
পুলিশ খৈনী টেপে।
হিন্দু হোটেলে কা'রা যেন বাঁধে নীড়
কবচে ললাট মেপে॥
মড়ার কয়লা ভেসে যায় ঘোলাজলে।
ঘুরি ঘাটে ঘাটে কাব্য-খোঁজার ছলে॥

যে দেশে ছিলেন মহিষবাহন যম
বুনো মহিষের বেশে।
নরক যে দেশে দৃপ্ত পরাক্রম
দেখায় অট্ট হেসে॥
জীবন যে দেশে মৃত্যুর অপমান।
আদিগঙ্গার দু'কূলে মুক্তিস্নান॥

ডাকা না-ডাকার অতীত দাঁড়ির খাটে
মুক্তির ফুলশয্যা।
সূর্যকে দেখে অসাড় ভেংচি কাটে
সূর্যেরও নেই লজ্জা॥
পিচের গরমে পদাতিক-মন কাঁপে।
খালিপায়ে হাঁটা পবিত্র অভিশাপে॥

সন্ন্যাসী ষাঁড় পুতুলে ছাগলে মেশা
ক্লাইবের কালীঘাট।
চতুর গণক ভাগ্যই যা'র পেশা
শোনায় শান্তিপাঠ॥
চিতায় হঠাৎ চমকে চেঁচায় মড়া।
ডাকে দাঁড়কাক বোঝে না সে পাখিপড়া॥

২২শে মার্চ ১৯৫৫

গোলমেলে ছড়া

কৃষ্টির মাঠে-ঘাটে গোলে হরিবোল দে!
ন্যাবা খায় ভ্যাবাচ্যাকা দুনিয়াটা হলদে॥
অমিলের মিলে মিল চলছে না মেলানো
অরসিকে রস যেন গলা টিপে গেলানো॥
ভাবনার ধোঁয়া ধোঁয়া রোঁয়া-ওঠা পক্ষী
ওড়ে না মাটিতে সয় নিদারুণ ঝক্কি॥
আগা নেই গোড়া নেই আজগুবী ঠাট্টা
রোদে-পোড়া টাকে যেন বোশেখের গাঁট্টা॥
ফুল আর ফোটেনাকো এ যুগের বোঁটাতে
পারে না সে মধুপায়ী মৌমাছি জোটাতে॥
ভাঙাহাটে তবু চলে রাত দিনই হৈ চৈ
জোটেনাকো ফলারের চিঁড়ে কলা খৈ দৈ॥
বিজ্ঞেরা প্রাণপ্রণে হাসে সিকি ইঞ্চি
বার বার দেখে ঠেকে ইদানীং চিনছি॥
ওঁদের বোধের কোনো নেই আজো সীমানা।
জুতোকে বলেন ওঁরা পদতরী বিনামা॥
না-বোঝার যুগে দেখি বোঝার যে দাম নেই
বোঝে যারা মজলিসে তাদের তো নাম নেই॥
নানা দলে গান ধরে দাঁড়কাক হাঁড়িচাঁচা
ভাঙাক্ষুরে এ যেন রে অসুরের দাড়িচাঁচা॥
রাহু খায় চাঁদ গিলে পানা-পড়া পুকুরে
ভেউ ভেউ কেঁদে ওঠে তিনমুখো কুকুরে॥

চোখ খুঁজে নাজেহাল দু-চোখের ঊর্ধ্বে
মন বলে ওম্ তোম্ তানা নানা সুরে দে ॥
তানপুরা বাঁধা আছে টেনে বাঁধ্ বাঁয়াটা
কণ্ঠ জড়ায় এসে মাইকের মায়াটা ॥
ঘেমে ওঠে তারাগুলো আকাশের ঈথারে
জুড়ে যায় ফাটামাটি বুকে নিয়ে সীতারে ॥
বৃদ্ধেরা ঠোঁট চেপে জোড়াভুরু কোঁচ্‌কায়
নজরটা ঠিকই আছে স্বগীয় বোঁচকায় ॥

এ যুগের মাপাজোপা কী কঠিন থিয়োরী
রোমে রোমে অনুভূতি ওঠে যেন শিহরি ॥
আসলে মাথার ঘিলু হওয়া চাই ধোঁয়াটে
যত খুশি ভাঙো তবু পারবে না নোয়াতে
মাথা যদি নাই থাকে প্রজ্ঞার ক্ষতি কি
কাব্যের ষোলোকলা দুরন্ত প্রতীকী ॥
হালফিল দেখে এসো শো-কেসের পাঁয়তারা
লিখে রাখে রঙচঙে মলাটের গায় তা'রা ॥
হৃদয়ের সাক্ষীরা কে যে কার জবানী
শোনাবে সে গূঢ়কথা? ভাঁড়ে কাঁদে ভবানী ॥
বাক্যের ফুলঝুরি ফুল কাটে ম্যাজিকে
ছাগেতে কুকুর ভ্রম মেলে তবু 'লজিকে' ॥

খালি-পেটে ধুঁকে ধুঁকে দুপুরের সূর্য
মাথায় আগুন ঢালে তেজোভিরাপূর্য ॥
লালদিঘি রেগে লাল পিচগলা ধোঁয়াতে
ভেবো না এ সব কথা? চাকরিটা খোয়াতে ॥
ভক্তির নামাবলী প্রভুপদচিহ্নে
ওরে মন দ্যাখ চেয়ে চোখে দূরবীন্ নে ॥
পাঁচশালা-বিধানের কাকাতুয়া ঝুঁটিদার
ইদানীং গায়ে দেয় পাঞ্জাবী বুটীদার ॥
তিনরঙা খেতাপের কাব্যিক চিন্তা
তবলায় চাঁটি মারে ধেরে কেটে ধিনতা ॥
এ যুগের কবিযশ কেটে কুটে মর্গে
চিতায় চালান দেবে পাইকিরি স্বর্গে ॥
আগা যদি খোঁজো তবে খোঁজা চাই গোড়াটা
রসনার বাসনাতে শিল আর নোড়াটা ॥
শব্দের ধোঁয়া পিষে মিহি মিহি মশলা
কাব্য-কাবাবে দিলে জিবে ঝরে পশলা ॥
ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে নামে খরবৃষ্টি
গোলে হরিবোল দেয় এ যুগের কৃষ্টি ॥

৩০শে মার্চ ১৯৫৫

আধুনিক

আধুনিক নই আমি অধুনার মাটি-ফুঁড়ে জাগা;
প্রচন্ড প্রাণের দ্বন্দ্বে যুগে যুগে দীপ্ত বহমান
ইতিহাসে বার বার প্রলয়ের মত্তদোলা-লাগা
অতীতের অনিবার্য রূপান্তর আমি বর্তমান।
নাস্তির নৈরাজ্যে ডোবা উচ্ছৃঙ্খল নই হতভাগ্য
সুদীর্ঘ সংগ্রামে আর সাধনায় করেছি নির্মাণ
এ-সমাজ এ-সভ্যতা, পরিয়াছি ঐতিহ্যের তাগা
ঊর্ধ্ববাহু মূলে, তাই আমার ভবিষ্য দীপ্যমান।

বস্তুপুঞ্জে অবিরাম প্রবল প্রাণের গতিবেগে
রূপ থেকে রূপান্তরে জয়যাত্রা প্রচন্ড দুর্বার
আধুনিক নই আমি আমার আগ্নেয় সৃষ্টিমেঘে
অবিশ্রান্ত জন্ম নেয় বহুবর্ণ সাহিত্যসম্ভার!
আমি নিত্য চলমান জীবনের মহামুক্তিধারা
সংঘাতের বিস্ফোরণে ভেঙে চলি বন্ধনের কারা।

৭ই নভেম্বর ১৯৩৮

সোনার হরিণ

মাঝে মাঝে মনে হয় জীবন অতৃপ্ত এক অমৃতের পিপাসায় ভরা
অসংখ্য বিচিত্র সুরে অবিরাম অগ্রগতি অবিরাম আঘাত সংঘাত!
দুঃসহ জ্বালায় তবু জ্বলে যাই রাত্রিদিন যে উচ্চাশা অনন্ত অ-ধরা
সোনার হরিণ সে যে রেখে যায় এ জীবন-মরুতে মায়াবী-পদপাত।
যখনি দেখেছি সুখ হঠাৎ ফেরায় মুখ বাহুপাশে ধরা দিতে দিতে
অতৃপ্ত মনের সাধ কেঁদে ওঠে সীমাহীন বাসনার এই পৃথিবীতে।

কামনার চিতাধূমে আকাশে ঘনায় মেঘ, দুরাশার ক্ষিপ্র ক্ষণপ্রভা
চকিত চপল দ্যুতি মুহুর্মুহুঃ বিকিরণে দু'চোখ ধাঁধায় বারবার
সাবলীল দেহে মনে যাঁকে ভাবি কাছে পা'বো অশান্ত মনের মনোলোভা
সে তবু দেয় না ধরা, ব্যঙ্গ-হাসি হেসে ওঠে বিমর্ষ বিষণ্ণ অন্ধকার!
অমেয় অমৃত-কুম্ভ চাঁদের ভান্ডারে থাকে পৃথিবীর দুরন্ত পিপাসা
বৃথাই কল্লোল তুলে জীবনের কূলে কূলে বহে যায় শতদ্রু বিপাশা!

এ জীবন শূন্যতার কালজয়ী আকাঙ্ক্ষার রূপ থেকে রূপে উত্তরণ
মাঝে মাঝে ঘূর্ণীঝড়ে বৈশাখের ঝুঁটি ধ'রে মুঠিতে বিদ্যুৎ চেপে-ধরা
বেগবান বিশ্বাসের বার বার পিছুহটা বার বার দীপ্ত উজ্জীবন
সোনার হরিণ তাই হোক স্বপ্ন তবু তা'র প্রেমে আজো মুগ্ধা বসুন্ধরা।

৫ই আগস্ট ১৯৩৪

আহত পাখি ও অনাহত আকাশ

ডানায় আগুনলাগা পাখি খোঁজে জল
আকাশ মনের শূন্য, পৃথিবীর তল —
থাক বা না-থাক
ধূসর পালক-পোড়া ছাই উড়ে যাক্‌!
প্রেম রাঙা-বুদ্বুদের ফুল
রৈবতকে সুভদ্রার ঝড়ে-ওড়া চুল
ফাল্গুনী-হৃদয় জানে বন্ধন মানে না পলাতকা
ভবিষ্যের মানসাঙ্ক ইচ্ছার খাতায় আছে ছকা!
হায় তবু ডানা পুড়ে যায়
জানে তা'র মুক্তি নেই বোশেখী-বাসায়।

পাখি তবু ভেবে যায় গলিত সূর্যের সোনা মেখে
দূরদর্শী আকাশকে দেখে
শেষ যদি থাকে তা'র খুঁজে নেবে পথের মহিমা
যতই বৃহৎ হোক,—হোক ক্ষুদ্র আণবিক সীমা
সুরভিত ফুলের কেশরে
কোটিভাগে বিভক্ত এ কালের প্রহরে।
পাখি বলে, আমি মন পৃথিবীর চিরযুবতীর
রজস্বলা হই রক্তবন্যায় অধীর
ঋতুরঙ্গে শারীরিক তাপ
ক্রমে বাড়ে কামনার উদ্দাম সন্তাপ,
দু'টি সত্তা এক হ'লে তৃতীয় সত্তার গোঙানিতে
শঙ্খধ্বনি শুনি পৃথিবীতে!

পাখিকে আকাশ বলে পৃথিবী কোথাও
আমাকে পায়নি খুঁজে উলঙ্গ উধাও
ঘুরেছে ঘূর্ণীর বেগে
বিদ্যুতের কশাঘাতে বজ্রের আওয়াজভরা মেঘে
আমাকে সে কখনো পায়নি
যে গানের উৎস আমি সে গান গায়নি!
তোমার জ্বলন্ত ডানা আহত আত্মার
শিখায় আমার শূন্য অনাহত মূক নির্বিকার!
পাখি বলে হে অসীম রোদজ্যোৎস্নামাখা
তৃষ্ণার আগুন-লাগা আমার অশান্ত দুই পাখা
তোমারি আত্মার গান
শূন্যতার বুকচেরা পৃথিবীর দীপ্ত অভিমান।

১লা ডিসেম্বর ১৯৩৯

আবার তোমার দেখা পেলুম হগসাহেবের বাজারে,
অমন নিটোল স্বাস্থ্য কারো কচিৎ মেলে হাজারে!
মেদমজ্জায় আঁটোসাঁটো মরালগ্রীবায় তিনটে খাঁজ,
ধোপ-দুরস্ত ব্লাউজ শাড়ীর পরিচ্ছন্ন নিখুঁত ভাঁজ।

*

চোখোচোখি হ'লো যেই
চিনলে না সহজেই!
মনে মনে ঢোক গিলে
মুখে তবু স্তোক দিলে
অদ্ভুত বাঁকাহেসে
'আছি লভ্‌লক্ প্লেসে
এসো না সময়মতো?
উনিও বলেন কত,
তোমারি তো কবিতার,
কী যেন, কী বইটার?
মনে নেই অত শত,
ছুটিতে কি রোববার
এসো না সময় মতো!
দেখা হ'বে দু'জনার!

*

স্মৃতিটা হঠাৎ যেন ছ'বছর পেছিয়ে
প্রায়-মরা মনটাকে দিয়ে গেল পেঁচিয়ে
দুমুখেই ধার-দেওয়া স্মৃতির খড়্গ দিয়ে
এলোমেলো ক'রে গেল হঠাৎ ঝড় বহিয়ে।

*

এতকাল তো ভুলেই ছিলুম! আবার কেন জাগলে মনে?
চপল দিনের সব কথা আজ স্মরণ-পথে আসছে নাকো
পষ্ট মনে পড়ছে এবার সেদিনকার দুঃখ যত
আজকে তোমার হঠাৎ-আসা হঠাৎ-চলে-যাওয়ার মতো।

*

তুমি ছিলে কলেজের মেয়ে
মুখে ছিল মার্জিত ভাষা,
কতবার কত কাছে পেয়ে
তবুও চাইনি ভালবাসা,

কারণ সে কাচামন নিয়ে
কবিতা লেখাই চলে শুধু
কর্তারা দিতোনাকো বিয়ে •
মাঝখানে মরু ছিল ধুধু !

*

তবু ছিল মনে মনে অকথিত ভালোলাগা
অলব্ধ চুম্বনে হঠাৎ স্বপ্নে-জাগা !

*

কলেজের বেঞ্চিতে প্রায় চোখে পড়তো দু'জনার নামে নামে সন্ধি,
ছড়া-লেখা ছবি-আঁকা প্রায় চোখে পড়তো সহপাঠী ছেলেদের ফন্দী,
লজ্জায় ঘেন্নায় রাগে জ্বলে উঠতে
প্রিন্সিপ্যালের ঘরে তক্ষুনি ছুটতে
কিছুদিন হ'তো কথা বন্ধ,
আবার মধুর রাঙা ফুল হয়ে ফুটতে
কুন্তলে মোহ মোহ গন্ধ !

*

কী যেন একটা ঘটনায়
কুচক্রীদেব রটনায়
জেদ্ চেপে গেল যে ক'রেই হোক তোমায় চাই যে পাওয়া,
সুরু হ'লো মম জীবন-কুঞ্জে তোমারি রাগিনী গাওয়া।

*

তোমার হাতে হাত রেখেছি ববাত-দেখার ছলে
স্পর্শসুখের ফল্গুধারা বইতো মনের তলে।

*

কত পাখি ডাকতো
কী যে ভালো লাগতো !
নিঝুম দুপুরবেলা
ফেরিওলা হাঁকতো
তোমাব বাঁধানো ফোটো
টেবিলেতে থাকতো।

*

পল্‌কা প্রেমের ঠুনকো পেয়ালা ধরতে আলতো ক'রে
হাল্‌কা ছোঁয়ায় মনটা দেয়ালা করতো স্বপন ঘোরে
হায় গো সই যশুরে কই হ'লো যে প্রেমের চেহারা
কে জানতো হবে জজের গিন্নি পেছনে পুলিশ বেহারা !

এ-দিনকে দেখে সেদিনের মুখ ভার!
সেদিনের পাখি উড়ে গেছে আসমানে
কাঁটা হ'য়ে তুমি বিঁধে আছো বাসনার
রক্ত-ঝরানো নিভৃত-বন্দনার
মন দেওয়া-নেওয়া স্বপ্নের অপমানে।

*

ঘুমের পাহাড়ে কত খুঁজেছি রাতে
সকালে ফিরেছি একা রিক্ত হাতে
স্বপ্নপরীর মৃদু পক্ষাঘাতে

*

দেখেছি তো কতবার কী করুণ কান্না কেঁদেছ!
পাছে কেউ কিছু বলে
চোখ মুছে অঞ্চলে
গোপনে আলিঙ্গনে বেঁধেছ;
উষ্ণচোখের জলে
স্মরণের খনিতলে
জন্মেছে কত চুনীপান্না,
সহজে কি ভোলা যায় সেদিনের সে করুণ কান্না?

*

তোমার বাবা সাব-ডেপুটি আমাব বাবা জমিন্দার,
তোমার বাবাব শূন্য-ট্যাঁকের কেউ ছিল না জামিনদার!
তোমরা ছিলে উত্ত'-রাঢ়ী
চড়তে ভাঙা ছ্যাকড়াগাড়ী
আমার বাবা মুখ্যি-কুলীন রোল্স্-বয়েসেব চড়নদার!

*

মিললো না কুল, ভেঙে গেল ভুল, কুল দেখে প্রেমে পড়িনি কেন?
পাল্টা ঘরের মেয়ে দেখে প্রেম করিনি কেন?
টাকায টাকায় কুলে কুলে যদি মিলে যেত পাঁজি-পুঁথিতে মেশা,
তাহ'লে কি এই নবীন বয়সে খাঁটি প্রণয়ের ফুরুতো নেশা?

*

বৃহৎ মানবগোষ্ঠিতে কে যে জন্মেছে কা'র বংশে,
হাজার জাতের রক্ত মিশেছে কতটা যে কা'র অংশে
কেই বা রাখছে কুলের কুলুচি?
কসাই কামার শূদ্দুর মুচি
বামুন কায়েত বদ্যিকে ধরে জুতিয়ে করছে লম্বা;
চাঁদির জুতোয় খেতাপের জোরে জাতকে দেখিয়ে রম্ভা!

এ সমাজে কেউ কারো করেনাকো পরোয়া!
কিসের বাঁধন তবে কিসের বা ঘরোয়া?•
যত দেবে দোরে খিল
ততই বাঁধবে মিল,
ডানপিটে প্রেম এসে ঘরে হবে চড়োয়া;
মানবে না ছেঁড়াকাঁথা মানবে না জড়োয়া।

*

নানা মতলব এ'টে ঘটকালি করালুম
পিসিকে মাসিকে দিয়ে হাতে পায়ে ধরালুম
তবু জেদী বুদ্ধের টললো না মন!
বিধি ও রাজার যেন সুযোগ্য প্রতিনিধি
একরোখা জমিদার বাপের আসন।

*

আধুনিক ব'লে তোমার বাবার মনে ছিল খুবেই অহঙ্কার
কাটো কাটো বুলি শোনাতেন খালি ছিল না ভনিতা অলঙ্কার;
রূপসী বিদুষী মেয়ের জন্য পেলেন জামাতা আই-সি-এস্
সেই শেষ দেখা হাসিমুখে তুমি পরেছিলে নববধূর বেশ।

*

ভাগ্যিস তুমি হেসেছিলে
স্বামীকেই ভালবেসেছিলে
নইলে আমার কী যে হ'তো তা'র ভেবেই পাইনা কূল,
ঘুচিয়ে দিয়েছ ভালোবাসাবাসি ভেঙেছে মনের ভুল।

*

মিলিয়েছিলুম অনেক লেখায় মুখের সঙ্গে চাঁদকে,
স্মৃতির পটে সোনার রেখায় মিথ্যে মোহের ফাঁদকে,
অটুট প্রেমের বাঁধন ভেবে ভুল করেছে মনটা
চন্দ্রাননের চন্দ্র বাজায় নীলামদারের ঘণ্টা!

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ —উলুখড়

প্রাসাদ-নগরীর আনাচে কানাচে

মাকড়শা

আম্বলালায় জাল বোনে আজো অমর মীর্‌জাফর
কায়েমী-সুখের প্রাসাদে প্রাসাদে ঈর্ষায় জর্জর
ব্যারাক-বস্তি-দোতলা-তেতলা-কুটিরের দ্যালে দ্যালে
রসনার রসে চতুর মাকশা শীকারের জাল ফ্যালে
নর-নারী-শিশুচর্মে কুটিল গরল-চিহ্ন আঁকে
সভ্যনামিক সহরের বুকে আবর্জনার পাঁকে ॥

মশক

নর্দমা ড্রেন ডাস্টবিন আর ভুতুড়ে ঘরের কোণে
লর্ড ক্লাইভের মুৎসুদ্দীরা অস্ফুট গুঞ্জনে
তাজারক্তের সোঁদালো গন্ধে আনন্দে ভরপুর
দংশনে তেড়ে জ্বর এসে যায় দ্বার খোলে যমপুর
গুন্ গুন্ গুন্ গুঞ্জরণের হি হি হি রাগিনী গায়
মৃত্যুর দূত ম্যালেরিয়া মাতে মশক-বন্দনায় ॥

ছারপোকা

জগৎশেঠের রক্তবীজেরা বেঞ্চি চেয়ারে খাটে
গদি-তোষকের তক্ত-তাউসে মশ্‌গুল রাজপাটে
কম্বল কাঁথা মশারীর কোণে অনাদিকালের পোষা
ট্রাম-বাস জুড়ে মহাজনী করে চতুর রক্তচোষা
জৈনদেবতা পার্শ্বনাথের খাটমল-দেবতারা,
কানাকড়ি দিয়ে খুনে কিনে খায় বেকুব সর্বহারা ॥

আরশোলা

রাজবল্লভী উল্লাসে নাচে ফুরফুরে আরশোল্লা
দেউল-দর্গা চেটেপুটে খায় মানে না পুরুত মোল্লা
তেল চুক্ চুক্ তেলাপোকাদের সংসারে আস্তানা
নির্গুণ পোড়া বেগুনের ফালি শির্ শির্ করে ডানা
গুড়ের কলসী খাবারের কড়া ঘিয়ের তেলের টিনে
বেমালুম মিলে মিশে একাকার মোক্ষের পথ চিনে ॥

ইঁদুর

হেস্টিংস আজো মরেও মরেনি কবরের মাটি ফুঁড়ে
ভুঁড়ো গনেশের বাহনের বেশে সারাটা সহর জুড়ে
বণিকরাজের গদিতে গদিতে দোকানে-বাজারে-হাটে
কালোবাজারের মুনাফার লোভে সুড়ঙ্গপথ কাটে ॥
অশন-বসন-খাটিয়া-পালঙ্ কেটে কুটে বিলকুল
প্লেগ মহামারী ছড়ায় সহরে বৈতরণীর কূল ॥

মাছি

ধূর্ত বিদেশী বণিকদলের রাজ্যলোভের মতো
সহরে-নগরে-গ্রাম-জনপদে মক্ষিকা শত শত
কুষ্ঠের ক্ষত কলেরার বিষ যক্ষ্মার থুতু চেটে
ক্ষুধার অন্নে বীজাণু ছড়ায় জনতার ভুখাপেটে
ভন্ ভন্ ভন্ ভনিতায় ভাঁজে ঘ্যানঘেনে রামধুন
মড়কের ঘোড়া দাপাদাপি করে দেশজুড়ে চৌদুন॥

ষাঁড়

অলিতে গলিতে ধর্মের ষাঁড় বেপরোয়া পথ জুড়ে
দু'চোখ বুজিয়ে শুয়ে থাকে যেন অকর্মা যত কুঁড়ে
শিং আছে তবু শত অপমানে ভুলে গেছে শিং-নাড়া
ক্ষিধের জ্বালায় এঁটোপাতা খায় ঘুরে ঘুরে সাতপাড়া
মৃত মানুষের বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধের দাগা ষাঁড়
ক্ষেপে গেলে বৃথা মাথা খুঁড়ে করে পথঘাট তোলপাড়॥

ফাটকা বাজার

ক্ষেত্র-খামার-খনি-কাবখানা সহবের বহুদূবে!
উৎপাদনেব দাম ওঠে নামে নানা বিচিত্র সুরে
পুঁজিপতিদেব ফাট্‌কা-বাজাবে নবশৃগালেবা ডাকে
দেশেব ভাগ্য হাবুডুবু খায শোষণেব ভরা পাঁকে
একচেটে যত ব্যবসাদাবেব শেযারেব ছলনায়
হাসি ও কান্না ব্যাঘ্র ও গরু একঘাটে জল খায়॥

পানের পিক

পাঞ্জাবী-ধুতি-শার্ট-কোট-প্যাণ্ট-লুঙগী-পিরাণ-শাড়ী
কখন যে কার দফা রফা কবে দু'পাশের কোঠাবাড়ী
জান্‌লা-দরোজা-বাবান্দা থেকে পিকের পিচকাবিতে
হাড়ে হাড়ে বোঝে ভুক্তভোগীরা ধিক্কাব দিতে দিতে
শুভ্র-দেয়ালে তাম্বুলরাগরঞ্জিত-সভ্যতা
ঘোষনা-মুখর মধ্যযুগের চরম বর্বরতা॥

মহাব্যাধিগ্রস্ত

লাটের প্রাসাদ-তোরণের মুখে পথিকের সহযোগী
হামেসাই ঘোরে নাক-কানখসা গলিতকুষ্ঠরোগী
কণ্ঠেব স্বর যাতনায় কাঁপে দু'পাটি দাঁতের ফাঁকে
গলিত-জিহ্বা ঘড় ঘড় করে ব্যাধির কুম্ভীপাকে
নারকীয় ক্ষুধা ডাণ্ডস্ চালায়, শহর নির্বিকার
উপনিবেশের ক্রূর-পরিহাস অসাড় কোলকাতার॥

জুতা পালিশ

বেওয়ারিশ ষন্ড কিশোর ছেলেরা অর্ধনগ্ন দেহে
পথিকের পদধূলায় মলিন তাকায় না কেউ স্নেহে
জুতা ঝেড়ে মুছে পালিশ লাগায় দুর্বল কচিহাতে
মুখে তবু এক অদ্ভুত হাসি অসীম অজ্ঞতাতে
মহানাগরিক পাদুকাপিষ্ট দুর্ভাগ্য শিশুদল
পালিশের প্রতিযোগিতায় করে কী করুণ কোলাহল ॥

মা ও ছেলে

গগনচুম্বী গণ-পরিষদ-প্রাসাদের পদতলে
গামছায় পেতে ছ'মাসের শিশু অবগুণ্ঠনতলে
দু'চোখে নীরব প্রার্থনা জ্বলে অজ্ঞাতকুলশীলা
ভিখারিণী বধূ ভিখ্ মেগে খায় রামরাজ্যের লীলা
দামী-মোটরের রামশিঙা বাজে কে'দে উঠে ভুখাশিশু
বৈষম্যের ক্রুশের কাঁটায় বিন্ধ কত না যীশু ॥

গণৎকার

নামাবলী গায়ে কপালে সি'দুর ভৃগু আর পাঁজী খুলে
গোটা সহরের ভাগ্যের নাড়ী হাতড়ায় মুখ তুলে
খড়ি পেতে ব'সে ফুটপাত ঘে'ষে অভাগা গণৎকার
জঠর-জ্বালায় দিবস কাটায় বিফল বঞ্চনার
জুয়াড়ী-দালাল-ভাগ্যান্বেষী-দুঃস্থ-বেকারদল
উবু হয়ে বসে দু'হাত বাড়ায় দুরাশায় চঞ্চল ॥

ওঝা

এ'দো পচাগলি হুজুগে মুখর তুকতাক্ ঝাড়ফুঁকে
হিস্টিরিয়ায় মৃতবৎসার পাষাণ চাপায় বুকে
ভূত-প্রেত-দানো-মামদো-পিশাচ-শাঁকচুন্নীর হাসি
সুস্থবুকের পাঁজরা খসায় যক্ষ্মার ঘেয়ো কাশি
খক্ খক্ খক্ বিয়োগান্তক ভাঙাঘরে ছায়া নড়ে
অন্ধগলিতে বিকটোল্লাসে ওঝায় মন্ত্র পড়ে ॥

শ্মশানে

মহানগরীর প্রান্তশায়িনী গঙ্গার পূবতটে
চিতার ধোঁয়ায় অপমৃত্যুর ঘোষণা আকাশপটে
লাঞ্ছিত গণজীবনের ব্যথা আঁকে শঙ্কিত ছবি
রাতের চন্দ্র ভয়ে মুখ ঢাকে দিনের দীপ্ত রবি
কেওড়াতলায় নিমতলা আর কাশীমিত্তির ঘাটে
"বলো হরিবোল!" অকাল-মৃত্যু আসে চারপায়া খাটে ॥

২রা এপ্রিল ১৯৪৮

বোশাখী দুপুরের কলকাতা

ঝাঁঝালো রোদের ক্রীতদাস
চেনবাঁধা বোশেখী বাতাস
ঘেমে ঘেমে ঝিমোয় সহরে।
জ্বালাধরা হৃদয়ের সুর
পিচগলা সহুরে দুপুর
বেড়ে যায় ভুঁড়ির বহরে॥
ঘেরাটোপে বনেদী কুকুর,
'জীবন তো ক্ষণ-ভঙ্গুর!'
বলে আর মৃদু মৃদু হাসে।
খেটে-খাওয়া জগতে কে কা'র?
বোঝে সবি পথের বেকার
মুখ কেউ দেয়নিতো ঘাসে॥
নিটোল মেঘের ফোঁটা কই?
গরম কড়ার তেলে কৈ
লাফ দিয়ে পড়ে উনুনেতে।
গঙ্গাতে রুখু রুখু জল
ফেরিঘাট চল চঞ্চল
ঠোকরায় মড়া শকুনেতে॥
হাই তোলে কেঁদো কেঁদো বাঘ
এখনো মানেনি কেউ বাগ,
স্ট্র্যান্ড রোডে মাছি ভন্ ভন্।
ঝড় বাঁধা রোদের শেকলে
ঈশানের দরোজা কে খোলে?
কী কঠিন কপাটের জং॥
জেটীর বাঁধনে চাঁদপাল
পানি তা'র পায়নিকো হাল
ওঠে নামে ভারী ভারী ক্রেন্।
চট-কলে চটে আছে কুলী
শোনেনাকো মালিকের বুলি
সিটি দেয় দুপুরের ট্রেন॥
পুঁজির জাহাজ লবেজান
খালাসী ধরেছে মুলতান
ঝাঁঝা রোদ চমকায় জলে।
আকাশের বেলোয়ারী কাঁচে
মাঠের জীবন মরে বাঁচে
ধোঁয়া ওঠে দূরে চাল-কলে॥

ইদানীং জমিদার কাবু
কাছারীতে গ্র্যাজুয়েট বাবু
রাখে হাল-বকেয়ার খাতা।
স্বাধীনতাহীনতার দিন
কেটে গেছে নেতারা প্রবীণ
তেল দিয়ে রাখে তেলামাথা॥
ঢং ঢং নেড়া গীর্জাতে
বাজে ঘড়ি গুমোট হাওয়াতে
খোলামাঠে শালপাতা ওড়ে।
সহরের যত গলি ঘুঁজি
কাব্যের প্রয়োজনে বুঝি
আকাশের বুকে তীর ছোড়ে॥

১৫ই এপ্রিল ১৯৫৩

বুড়ো শালকর আলি হোসেন

বুড়ো শালকর আলি হোসেন, মানুষটা বড় ভালো।
রাজারাজড়ার শাল আলোয়ান সাফ করে জমকালো।
বয়সটা প্রায় আশীর কোঠায় ভেঙে গেছে শিরদাঁড়া,
কুঁজো হ'য়ে বসে রিপু চালায়, দাঁড়াতে পারে না খাড়া;
চশমার ডাঁটি ভেঙে গেছে সুতো বেঁধে কাজ করে,
মেটে দাওয়াটার সিঁড়ি ভাঙে, ফুটো চালে জল ঝরে;

বাবা তাঁকে চাচা ব'লে ডাকেন আমরা ঠাকুরদাদা,
আলি হোসেনের কণ্ঠে যেন স্বর্গের সুর সাধা।
সিঙ্গিবাড়ীর মেজোবাবুর জামিয়ার রিপু কোরে
বুড়ো মানুষটা পাঁচশ'বার গেলেন বাবুর দোরে;
দু'টাকা মজুরী তাও পেতে কেটে গেল বচ্ছর,
আল্লার কাছে নালিশ রুজু করলেন শালকর।

আল্লার দয়া অন্তহীন মেজোবাবু জানোয়ার
চৌঘুড়ি হাঁক ক'রে বেড়ান গায়ে দিয়ে জামিয়ার!
বুড়ো ঠাকুরদা আলি হোসেন সাক্ষাৎ যেন ঋষি
ভুখাপেটে হায় খেটে খেটে শূন্যে গেলেন মিশি'!
যে মহাশূন্য—শূন্য নয় অযুত বজ্রে ঠাসা
মেজোবাবুদের চিতা জ্বালায় অমোঘ সর্বনাশা।

১৪ই মার্চ ১৯২৬

ভদ্দোরলোকের ছেলে

[কবিবন্ধু বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে]

আমাদের এই বেঁচে থাকা
যদি বলি মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক
বিশ্বাস করবে কি ?
ভদ্দোরলোকের ছেলে আমরা
কাছাকোঁচা দিয়ে কাপড় পরি,
ধোবদুরস্ত পাঞ্জাবীর তলায়
করাল দারিদ্র্যকে লুকিয়ে রাখি
আত্মনিগ্রহের দুঃসহ যন্ত্রণায়।
আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে !
বিন্দুমাত্র লজ্জিত হই না কথাটা উচ্চারণ করতে,
কুলি-মজুর-চাষাভুসো-ছোটলোকদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলি
অপরিসীম সতর্কতায়,
কী দুর্দমনীয় আমাদের আভিজাত্যবোধ !
কী হৃদয়বিদারক আমাদের ভদ্রতা !

কেমন আছেন ?
পরিচিতেরা পথে-ঘাটে প্রশ্ন করে
(এ ছাড়া আর কি প্রশ্নই বা আছে ?)
মনে মনে জানি এর উত্তর
বৈদান্তিক সূত্রের মতো সংক্ষিপ্ত ঃ
ভালো আছি !!!
আহা কী মর্মান্তিক শিষ্টাচার !
প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে বিষণ্ণ-গম্ভীর মানব-সত্তা
কুঁকড়ে-মরা লজ্জার স্বগত-ভাষণে।
একজন পেশীজীবী শুষ্কমেজাজী সিংহবিক্রম মজুর
আমাদের চেযেও সুখী আমাদের চেয়েও মহান্‌
রূঢ়ভাষায় গর্জন কোরে ওঠে মজুরীর দাবীতে,
সভ্যতার বনিয়াদ ওরা বিপ্লবের অগ্রদূত।
আর আমরা ?
মহামাননীয় ভদ্দোরলোকের ছেলে
চেঁচিয়ে কথা বললে জাত হারাই
ন্যায্য-পরিশ্রমের দাম চাইতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।
লাঞ্ছিত ভদ্র-জীবনের সকরুণ অহঙ্কারে
আমাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।
উন্নাসিক পরিভাষায় মজুরীর নাম দিয়েছি সম্মান-মূল্য !
ব্রহ্মণ্যপ্রথায় দক্ষিণা বললে আরো খুশি হই
আহা আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে !!

ভদ্দোরলোকের ছেলে আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে!
দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের করুণ উন্নাসিকতায়
উচ্চাভিলাষ ঢেকে রাখি হিমশীতল মৃত্যু-তুষারে।
আমাদের যশোগৌরবের কঙ্কাল
তিমিরগর্ভ জন্মভূমির অশ্রু-সমুদ্রে
দিশাহারা ফসফরাসের মতো জ্বলে।
আমাদের ধারালো বুদ্ধির সিঁড়ি ভেঙে
একচেটে ব্যবসায়ীদের জাতীয়-শিল্পোন্নয়নের বিজয়-বৈজয়ন্তী।
আর আমরা?
নির্লোভ নিরাসক্ত নির্বিকার
বুদ্ধিবিলাসের শুচিবায়ুগ্রস্ত অমায়িক ভদ্দোরলোকের ছেলে!

আমাদের মেকী আভিজাত্য দেখে
লাটসাহেবও লজ্জা পায়!
আর ডাস্টবিনের কুকুরগুলো ঘেন্নায় ল্যাজ নাড়ে।
পথের মাঝখানে কোনো ওৎপাতা পাওনাদার
গলায় গামছা দিতে এলে
পথের ভিখিরীটাও সহানুভূতিতে বলে ওঠেঃ
আহা যেতে দাও, যেতে দাও,
হাজার হ'লেও ভদ্দোরলোকের ছেলে!!
পদাঘাতের ধুলো মুছে মুছেই আমাদের পরিচ্ছন্নতার মহিমা;
আত্মধিক্কারের বৃশ্চিকদংশনেই আমাদের আত্মশুদ্ধি!
সত্যিই আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে!

ভদ্দোরলোকের ছেলে আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে!
আমাদের শিক্ষিতা সেবাদাসী অর্ধাঙ্গিনীদের
শতকরা নব্বইজনের টি, বি,
মনু না কি বলে গেছেনঃ
'নার্যস্তু যত্র পুজ্যন্তে রমন্তেস্তত্র দেবতাঃ!'
আর কাচ্ছা বাচ্ছা বংশধরগুলো যেন চলন্ত লিভার পিলে
মাথার ভারে টলে পড়ে
ঔপনিবেশিক অনাহারের ঘূর্ণীঝড়ে।
পুরাণ ইতিহাস মহাকাব্য হাতড়ে
তাদের কী রোমাঞ্চকর নামকরণ!
আহা নাম!
আহা ভদ্দোরলোকের ছেলের নাম!
শ্মশানঘাটে মৃত্যুর নাম-খারিজের খাতায়
লিখতে লিখতে কবিযশঃপ্রার্থী কেরাণীবাবুর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে!

চিতায় অগ্নিদানের মন্ত্রোচ্চারণের খাঁড়িপোড়া বামুন
খেঁকিয়ে ওঠে, আহা কী নাম!
ভদ্দোরলোকের ছেলের প্রাগৈতিহাসিক স্বর্গারোহণ পর্বে ঃ
বলো হরি হরিবোল! রাম নাম সত্য হ্যয়!
জ্বলন্ত চিতার শিখায় শিখায়
স্বর্গের সিঁড়ি রচনা করে।
শ্মশান-বৈরাগ্যের শান্তিশতকে
দার্শনিক হয়ে ওঠে—
শোকার্তসম্বিৎ ভদ্দোরলোকের ছেলে।

যদি বলিঃ কি হলে কি হতে পারতুম
এই আফশোষেই জীবনটা হাওয়াই বেলুনের মত ক্রমস্ফীত!
স্বীকার করবে কী?
দ্বিজু রায়ের নন্দলালই অধিকাংশ সুবিধাবাদী ভদ্রসন্তানের
জীবনদর্শন।
আর আমাদের মধ্যে যে সব ভদ্দোরলোকের ছেলেরা
সংস্কৃতি ও শিল্প-সাধনার ব্রত নিয়েছি
নিঃশব্দ রক্তক্ষরণে যাদের দীর্ঘশ্বাস শূন্যাশ্রয়ী,
তাদের ভদ্র-জীবনের সৌজন্যবোধই
আজ তাদের শ্রমশোষিত জীবনের চরম অভিশাপ!
এই নির্বিকল্প শুদ্ধাচারই তাদের সাধনার শত্রু।
তাই আজ অন্যায়ের প্রতিবাদ
সর্বপ্রকার শোষণের বৈপ্লবিক-বিরোধিতা
সামাজিক জীবন-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী
আমাদের গলা দিয়ে বেরোয় না,
আমাদের মুষ্টিবদ্ধ বাহু জ্বলে ওঠে না
আমাদের রিক্তবুকের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ
অগ্নিগিরির লাভা উদ্গীরণ করে না
নিরাপদে বেঁচে থাকার অহংসর্বস্ব দীনতায়,
আমরা যে বিজ্ঞানভিক্ষু ভদ্দোরলোকের ছেলে!!

আহা আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে;
বনেদী আঁস্তাকুড়ের উচ্ছিষ্টভোজনেই আমরা খুশি।
আমাদের এই পোষমানা জীবন কী নিরীহ!
শান্তির ললিতবাণী শুনি আর স্বপ্নজাল বুনি
ছিন্নমস্তা জীবনের চট্‌চটে লালায়
নির্বিবাদী মাকড়সার মতো!
আহা ভদ্দোরলোকের ছেলে আমরা ভদ্দোরলোকের ছেলে!

অপমানে লাঞ্ছনায় নির্যাতনে তবু আজো স্থির জানি মনে
সাম্যবাদী-সাধনার দীক্ষিত-মননেঃ
শতাব্দীর অগ্নি-ঝড়ে শ্রেণীচ্যুত ভদ্দোরলোকের ছেলে
আমাদেরি হাড়ে হাড়ে দধীচির অগ্নিচোখ মেলে
নিঃশেষে ভুলেছে আজ অর্থহীন ভদ্রতার মোহ
মানবিক মুক্তি-সাধনায়।
অদ্বিতীয় অহঙ্কার একাকার আঘাতে আঘাতে
আমাদেরি শূদ্রচেতনায়।
ভদ্দোরলোকের ছেলে আমরা!
নির্মম নিষ্ঠুর গালাগালি
মনে হয়, এ যেন বিদ্রূপ!

হে মানুষ, খেটে-খাওয়া অসংখ্য মানুষ
আমরা আজ তোমাদেরি দলে
তোমাদেরি বন্যাস্ফীত লবণাক্ত অশ্রুর অতলে
জলস্তম্ভে পরিণত
লৌকিক বুদ্ধির বাষ্পে প্রচণ্ড টাইফুন্!
ভদ্দোরলোক! আহা ভদ্দোরলোক!
নুণের পুতুল আজ নোণাজলে ঝাঁপ দিয়ে
একাকার মানুষের বিপ্লবের সামুদ্রিক ঝড়ে।

ইতিহাস উল্টে যায়
কীটদষ্ট প্রাচীনপাতায়
লেখা থাকে বেদনার লজ্জার অক্ষরে
একদিন পৃথিবীতে ছিলঃ
ভদ্দোরলোকের ছেলে আহা ভদ্দোরলোকের ছেলে!

১৭ই জুন ১৯৫১

ভদ্দোরলোকের মেয়ে

ফাটা কপালের শুষ্করক্তের সিঁদুরে
আমাদের সতীত্ব উজ্জ্বল!
সতীসীমন্তিনী আমরা ভদ্দোরলোকের মেয়ে
ক্লান্ত-ধৈর্য প্রত্যাশায় অর্থহীন ভাগ্যের দেউলে;
সুতরাং শীলভদ্রা অকলঙ্ক সংসারের কূলে।
আমরা অনন্যা পতিপরায়ণা সতী
নিষ্ঠুর পাষাণ মূক পৈশাচিক সমাজ-শাসনে,
গরল-সমুদ্রে নীল শব্দহীন ঢেউ তুলে তুলে
ভেঙে পড়ি সর্বংসহা ধরিত্রীর বালুকা-বেলায়
অবিশ্রান্ত দুঃসহ আঘাতে,
অপমানে জর্জরিতা লাঞ্ছনার ঘনতমিস্রাতে।

ইতিহাসে উপেক্ষিতা দীর্ঘরাত্রি দীর্ঘদিন ধরে
পথপ্রান্তে জেগে থাকি কত না পতন অভ্যুদয়
মহাশূন্যে মিশে গেছে
পুরুষের পৌরুষের দম্ভের আকাশে
আমাদের সামনে শুধু রেখে গেছে প্রতীক্ষার অনন্ত সময়।
ভদ্দোরলোকের মেয়ে আমরা সালঙ্কারা ভদ্দোরলোকের মেয়ে
সোনার গহনা-মোড়া সম্মানের কালসিটের দাগ
আমাদের বাহু-পদ-উরস-কটিতে
নাসারন্ধ্রে-কর্ণপুটে
সুবর্ণ শলাকাবিদ্ধ ক্ষতচিহ্ন জুড়ে
সলজ্জ অঙ্গের প্রতি ভঙ্গিমার পরতে পরতে
জ্বালায় অকথ্য জ্বালা
শৃঙ্খলিত-সতীত্বের চিতার আগুনে।

কাব্যের ভাষায় বলে ওরা,
কর্তা ভর্তা স্বামীরা প্রভুবাঃ
আমরা না কি মনোমোহিনী!!!
ভস্ম-অপমান-শয্যা থেকে
টেনে তুলি পুষ্পধনু মকরকেতনে!
আমাদের বরতনু পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের পোড়াকাঠ
গর্ভে ধরি পুরুষেরে, পুরুষেরি পদতলে দাসীত্বের মন্ত্র করি পাঠ।
কাঁচা-বয়সের কাঁচা-রঙের নেশায়
যদি কারো মন ভোলে
যদি কোনো প্রেমিকের আগুন ধরায় মত্ত চোখে
প্রেমের একাধিপত্যে
কামনার পাকাসত্ত্বে

ওরা আমাদের ঘিরে রাখে
ঘোমটায় বোরখায় আর ঝিলিমিলি রঙীন পর্দায়
ঐস্পাতিক অবিশ্বাসে অচলায়তনে।
আমরা শুধু ও'দেরই মনোমোহিনী
ধর্মমতে কেনাকেনে মাননীয়া দাসী !!

আমরা আজো দেহপণ্যা কুমারী-সভায়
ওদের পছন্দমত দেখে শুনে ওরা বেছে নেয়
(আমাদের আবার পছন্দ ? ছিঃ!
আমরা যে ভদ্রঘরের কুমারী মেয়ে ?)
মুখ বুজে হাটে কেনা পয়স্বিনী গাভীর মতন
আমরা ওদের ঘরে যাই
(আমরা না কি গৃহলক্ষ্মী ?)
লম্পট চরিত্রহীন ব্যভিচারী মাতাল হ'লেও
পতি স্বর্গ পতি ধর্ম
পতি-পদাঘাত সয়ে নির্বিবাদে জীবন কাটাই।
ভদ্দোরলোকের মেয়ে আহা ! আমরা যে গো ভদ্দোরলোকের মেয়ে।

ক্ষয়কাশে ভুগে মরি সূতিকায় রক্তশূন্যতায়
বর্ষে বর্ষে সন্তানের অশান্ত বন্যায়
সলজ্জ-সম্ভ্রমে সঙ্কুচিতা
আমরা সতী অরুন্ধতী অগ্নিদগ্ধা সীতা !
বসুন্ধরা দ্বিধা হয় ! (মিথ্যা কথা)
আমাদের সমবেদনায়
দীর্ণললাটের রক্ত জ্ব'লে ওঠে জমাট-শিখায়।
দেবীসূক্তে আমাদেরি মাহাত্ম্য অপার
ছিন্নমস্তা অট্টহাসি হাসে যন্ত্রণার।
সুসজ্জিত নরকের নিম্নপথ বেয়ে
অভিসারে আজো চলি মধুকণ্ঠে গান গেয়ে গেয়ে
পোষমানা শান্তশিষ্ট ভদ্দোরলোকের মেয়ে।

সামন্তযুগের দম্ভ তে-মহলা প্রাসাদ-বিবরে
আমাদের বধূ-আত্মা বিদ্ধ মহামাণ্ডলিক ব্যাঘ্রের নখরে
মেকিদর্পে টলমল সতীন-সমাজে
সতীত্বের নিদারুণ লাজে।
দাসী-বাঁদী-পরিবৃতা
হাবসী-খোজা-প্রহরীবেষ্টিতা
কত যুগ কেটে গেছে লোহার বাসরে
পুরুষের ইতিহাসে সে কাহিনী লেখা আছে কলুষ অক্ষরে।

ইংরেজ বণিক এল আলো জোরে সড়কের পথ
থরহরি কম্প তুলে বিজয়ী যান্ত্রিক তার রথ
কী উদ্দাম চাকার ঘর্ঘর
আমাদের ভেঙে গেল দাসীত্ব-বাসর।
কেরাণী মুৎসুদ্দী আর বেনিয়ান প্রভুদের ঘরে
শ্বেতাঙ্গ রাজার মনোমুগ্ধকর নবরূপান্তরে
আমরা হ'লাম দেবী শ্রীমতী মিসেস্
বেথুনে গোখেলে পড়া প্রগতির রুচিরম্য বেশ।
আমরা হ'লাম খাঁটি ভদ্দোরলোকের মেয়ে
নবযুগজাগৃতির সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে।
অথচ সন্ত্রাসে থাকি সংস্রব এড়ায়ে
কৃষাণীর কুলী-রমণীর
বর্ণাশ্রমী আভিজাত্য-মদে
মদমত্তা নারীসত্তা শৃঙ্খলিতা পিতৃ-শাসনের
দুঃসহ জ্বালায় জ্বলি।
শীলভদ্রা নারী আহা আমরা যে শীলভদ্রা নারী।

মুক্তির লড়াই এলো শতাব্দীর অগ্নি-ঝড় নিয়ে
খোড়োচাল কোঠাবাড়ী বাহিরে অন্দরে একাকার
মাতৃভূমি রুদ্রাণীর গম্ভীর হুঙ্কার!
ভাঙনের বন্যা এলো সৃজনের উদ্দাম আঘাতে
মর্মর প্রাসাদে দুর্গে অচলায়তনে
অগ্নিগর্ভ পৃথিবীর অগ্নি-ঝড় ক্রুদ্ধ গগনে।
লোহার পাদুকা আঁটা আমাদের চৈনিক চরণে
প্রলয়-ক্ষেপণছন্দে এলো ঝঞ্ঝাগতি,
এলো ঝড় মুক্ত এলোকেশে।

আমাদের জঠরের অমৃত-সমুদ্রগর্ভ হ'তে
ঊর্ধ্বমুখী জ্যোতির্ময় রক্তপদ্মদলে
পুরুষের মহাজন্ম পৌরুষের প্রাণপ্রবাহের!
আমাদেরি দীর্ঘ প্রত্যাশায়
জন্ম নেয় নূতনা পৃথিবী।
আমরা যে বিপ্লবীর মাতা
বিপ্লবীর প্রণয়িনী, বিপ্লবী-নায়িকা।
ভদ্দোরলোকের মেয়ে নই মহাবিশ্বভুবনের মেয়ে
নই মনোমোহিনী কামিনী
সভ্যতার জন্মদাত্রী আমরা যে শিবের শিবানী।
ত্রিশূলে ত্রিকাল কাঁপে মহাশূন্যে ওড়ে রক্তজটা
সীমন্তে সিন্দুর জ্বলে বিপ্লবের জ্বলদর্চিচ্ছটা।

২৭শে জুন ১৯৫১

তক্ষক

বৈশম্পায়ন কহিলেন, 'হে মহর্ষে
অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির—'
কারেণ্ট ফিউজড্ আকস্মিক অন্ধকারে!
খট্ খট্ খট্!
স্যাকরার হাতুড়ীতে কান ঝালাপালা!
'স্বল্পশ্চকালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ'
কেন্দ্রচ্যুত অহম্ কাব্যলোকের কৈলাসে
জমার ঘরে লালবাতি!

'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'
কবি-ভিক্ষুর সংকল্প
জঠর নয় অজাতশত্রু ক্ষুধাতৃষ্ণার সভ্যতায়।
পুঁজিপতির হামানদিস্তায়
ব্যাঙ্কের যাঁতায়
আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া!
মরার বাড়া গাল নেই!

যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু, "অশ্বত্থামা হতঃ!"
ধামাচাপা "ইতিগজঃ,"—হ-য-ব-র-ল!
সোনালি ইলেক্‌ট্রিকে পাঞ্চালীর হাসি
প্রলয়ের জলদর্চিচ্ছটা,
কারেন্ট ফিউজড্—বৈশাখী-ঈশানের অন্ধকারে!
তেঠেঙে পৃথিবীর জঙ্গলে
কিল বিল করছে পরীক্ষিতের তক্ষক!
স্যাকরার হাতুড়ীতে তক্ক-তক্ক-তক্ক
দ্বাপরের দুর্ঘটনা।

ঠোঁটের লিপস্টিকে প্রেমের মরীচিকা
অতনুর প্রেতশিখা
"আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি?"
তুলে ধরো ধূম্রযবনিকা
বোমা-বিস্ফোরণে হ'লো চূর্ণ অট্টালিকা
উড়ে চলে আগ্নেয়-তক্ষক
[illegible] পাপপ্রসূ আর্যামীর শূন্যপথ বেয়ে
তক্ক তক্ক তক্ক!
কবিত্বের দুর্ঘটনা ট্যাঁক গড়ের মাঠ,
সোম্মে নয় মার্নে নয় আদিগঙ্গার তীরে।

সংকীর্ণ গলির মোড়ে গ্যাস জ্বলছে
গরাদের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়া।
কালপুরুষ আকাশে নির্বাক
ছন্নছাড়া নক্ষত্রের শিখা।
ভস্‌কা উইটিপি থেকে নিরেট পাহাড়
বৈষম্যের অন্ধ প্রতিযোগী
রেশারেশি কাপড়ে গয়নায়
খট্‌ খট্‌ স্যাকরার হাতুড়ী
মিহি সুতো টানা-পোড়েনের শব্দ ওঠে
শূন্যে ওড়ে বিষাক্ত তক্ষক!

১৪ই মার্চ ১৯৪১

মানুষের মন

চিত্রিত বাঘের চামড়া মৃত্তিকার মানচিত্র মানুষের মনঃ
দুরন্ত সংগ্রামসিংহ-অশোক-চেঙ্গিস্‌
ভবানন্দ মজুমদার-ভট্ট কুমারিল,
বা-থিন্‌-বাতাসীমণি-নোবেল-চিয়াং!

বেগুনী সূর্যের আলো খোয়াঘষা জুতো
জাহাজের পাটাতন
পেন্সিলের ভোঁতা কালো শিস্‌
যবন-ব্রাহ্মণ-ম্লেচ্ছ-কুম্ভীর-তিব্বত
হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড মানুষের মন।
দুর্বার দ্বান্দ্বিক প্রেম অ্যাটম্‌ প্রোটিন
আলেয়ার অগ্নিদীপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের ডিম্‌
ডাংগুলী-ক্রিকেট-হুকো-জীনস্‌-জয়েসের
অপার্থিব সত্যকাম নির্মায়িক জ্বর
১০৫° ডিগ্রি-ওঠা মন যেন পায়রাচাঁদা মাছ!

আকাশ রক্তের সিন্ধু মন বিন্দু তা'র
হাতের মুঠোয় ধরা আমলকীর আত্মসমর্পণ
স্থাবর জঙ্গমে জানাশোনা
মাকড়শার জাল বোনা
কালকালান্তরে-বাজা যুগের ডুগডুগী
রোজার ঘাড়ের ভূত ডাক্তারের রুগী।

মন রাত্রি মন ঝড় মন উটপাখি
ক্লণিকের বাঘে-তাড়া জেব্রার বিদ্যুৎ
হঠাৎ হোঁচট্ খাওয়া
কিম্বা প্রেমে-পড়া
মন যেন অরোরার সাহারার জামা
সহজাত কবচ কুণ্ডল!
চলন্ত শিরদাঁড়া আর খুলি
ঝড়ে-ওড়া ধুলি
সঙ্গমের সুখ মরা-বাঁচা
হাড়ের মাংসের খাঁচা
পৃথিবীর চর্মরোগে পায়ে হাঁটা পোকা,
খোকার বুড়োমী আর বুড়ো সাজে খোকা।

শম্বুক বালীর যম বাল্মীকী ডাকাত
জ্ঞানের প্রপাত
আশার ভাষার নিরাশার
আত্মহত্যা আত্মসুখ আত্মার আত্মিক অহঙ্কার।
ইতিহাস কেমিস্ট্রি ফিজিক্স!
মন সূর্য মন চন্দ্র মন বিশ্বাকাশ
পেরেক কাঁকড়ার দাড়া মিসিসিপি নদী
গোলাপ রজনীগন্ধা
চুম্বন ক্রন্দন পদাঘাত।

করুণ কুয়াশাঢাকা অন্ধ অজানার
স্বাক্ষরিত সাদা 'চেক' মানুষের মন
সুমাত্রা বৈকাল গোবী সুমেরু পানামা
যত্র তত্র অবারিত তরঙ্গ বুদ্বুদ
ব্যক্তাব্যক্ত সাংখ্যের প্রকৃতি।
"মনোহস্য দৈবচক্ষুঃ" রুক্ষচুলে ঢাকা
বিরহিণী হেমন্তিকা
আকাশ আচ্ছন্ন।
অপ্রসন্ন মনোরথ কাককৃষ্ণ তরলান্ধকারে—
পৃথিবীর রোমে রোমে তুষার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে
খদ্যোৎ—
নক্ষত্র—
মরীচিকা—

২৭শে নভেম্বর ১৯৪১

মানুষ

মানুষ কি শুধু মনুষ্যপদবাচ্য?
কিম্বা সে আর কিছু?
আজো সেকি শুধু মানবোত্তর? গত নয় ক্রমাগত?
প্রাক্ নয় পশ্চাৎ?
জীবন সে নয় জীবনের দর্শন?
গুরু গরীয়ান মহত্তোমহান দীপ্ত জীবনায়ন?
অনুভব নয় অভিব্যক্তি, সুখ নয় সান্ত্বনা
চিরকাল সে কি ঐতিহ্যের গোলমেলে জল্পনা?
ঋজু তির্যক বক্র কুটিল জলে আঁকা আল্পনা
রক্ত মাংস অস্থি ও পঞ্জর?
সোণা রুপো লোহা ইট কাঠ মাটি বাতাসের বুদ্বুদ!
প্রবাহ-নিত্য মননসাগর-দোলা?
হাতুড়ি কোদাল কাস্তে গাঁইতি লাঙলের অভিশাপ
মানবিক প্রতিবিম্ব বিধির অপরূপ অপলাপ
প্রাক্‌পুরাণিক অতি-আধুনিক দেহী?
মানুষ, মানুষ নয়।

যে সব দ্বিপদ জন্তুরা চলে পৃথিবীর বুক জুড়ে
অতনু-মনের সহস্রশিখা কামনায় পুড়ে পুড়ে,
তা'রা তো মানুষ নয়,
নরতাত্ত্বিক যা খুশি বলুক তা'রা নয় কোনোদিন
মনুষ্যপদবাচ্য।
মনে হয় তা'রা চিরদিশাহারা প্রলয়ের বুদ্বুদ,
প্রাণ-মুকুলের ক্ষণিক সুরভি, মেঘমায়া অদ্ভুত,
গোষ্ঠীজীবনে ধনীশ্রেষ্ঠীর অযুত পুত্তলিকা
জীবনারণ্য শাখায় শাখায় শিশিরে সৌরশিখা
ক্ষুধাতৃষা অন্বিত,
স্পর্শকাতর দেহ নশ্বর সহে না উষ্ণ শৈত্য!

দ্যালের ফাটলে উইচিংড়িরা কড়িকাঠে ঝিঁঝিঁপোকা
জলতরঙ্গ বাজায় ঐক্যতানে
কালা তানসেন ধলা বেটোফেন সমগোত্রজ আত্মার
একই বাতাসের মধুমলয়ের প্রলয়ের ভীমবাত্যায়
ফলায় না ফল পার্থক্যের সুরলোকে এক যাত্রায়;
অবচেতনিক সত্তায় জাগে কত পিঙ্গলসূত্র
কত নিরুক্তছন্দশাস্ত্র, পা-ফেলার নানা করসৎ
রূপে রসে গানে বাংলায়
ধলারাই দেখি কালাদের আজো যান্ত্রিক চাপে থ্যাৎলায়!

হায়রে মানুষ, নামেই মানুষ, জীবাধম পশুপাল
গাঁইতি কোদাল লাঙল চালিয়ে কাটে কুমীরের খাল,
সেই খালে আসে পাথুড়ে-চামড়া নর-কুম্ভীরদল
অর্থনীতির ল্যাজের ঝাপটে ঘোলা করে নোনাজল
যে কুমীর খায় প্রজার মাংস, যে কুমীর পাড়ে ডিম্ব
মিঠে দর্শন সাহিত্য যার অহমের প্রতিবিম্ব।
মানুষকে কবে মানুষ ব'লবো, কবে যে ঘুচবে ভ্রান্তি
প্রাণে জাগে তাই বৃশ্চিক-জ্বালা কোথা খুঁজে পাবো শান্তি?
শরীরী-ভাষার তাণ্ডব চলে বাঙময় মনোরাজ্যে,
বিপ্লব! সেকি ঘুরপাক-খাওয়া শিকারী বাজের চেহারা?
কি করি? কি করি? নিস্‌পিস্‌ করে লাখো লাখো ক্ষীণ মুষ্টি,
হাড়-জিরজিরে কৃষাণ-শ্রমিক-বয়-বাট্‌লার-বেহারা
ক্ষীণায়ু জীবনে জপমালা তাই প্রভুর মনস্তুষ্টি।

রোমের চিতায় নেরোর বেহালা বাজে,
সুরেলা আলাপ হয়তো বা হবে পরজ-বসন্তের,
ধুমাবতী-রাত হাতাখুন্তিতে অনাদি অনন্তের
ছেঁড়া ইতিহাস কেটেকুটে রাঁধে অভিনব ব্যঞ্জন
গণতান্ত্রিক বেণে-মশলার অদ্ভুত আয়োজন;
জানিনা সে কার খাদ্য?
সাম্যবাদীর ভবিষ্যতের প্রমাণের উপপাদ্য।

হাজার হাজার জোড়াচোখে ফোটে ফ্যাকাসে ধুত্‌রো ফুল
শর্ষের ক্ষেত, পুলিশের বেত, বিধাতার প্রেত ঘোরে,
দুঃসময়ের নাগরদোলায় মায়াতরু নির্মূল—
আভিজাত্যের মায়াতরু। কাল-যবনিকা যায় সরে,
দেখা দেয় নব ভুগোল জ্যামিতি সমাজ সমিতি সঙ্ঘ
ভেঙে যায় বাধা পাষাণ-প্রাচীর হিমালয় দুর্লঙ্ঘ্য।
যে জীবেরা এলো শনৈঃ শনৈঃ গুহা জঙ্গল ফুঁড়ে
রক্তের স্রোতে ক্ষুরধার পথে নানা দেশকাল জুড়ে—
আজো তা'রা নয় মনুষ্যপদবাচ্য,
তাদের সংজ্ঞা পারেনিকো দিতে নবতম ইতিহাস
তা'রা তো মানুষ নয়!
সোনা আর মাটি, মাটি আর সোনা
এ-দুয়ের ডিগবাজী!

নানা সময়ের নানা মুনি এসে করেছে ফতোয়া জারী
ঘৃণিত-ভাষণ, রাজ্যশাসন-মোড়োলী-খবরদারী
গেঁথেছে হর্ম্য-দুর্গ-প্রাকার অভাগা প্রজার তৈরী
গগনচুম্বী দম্ভে মত্ত মানেনি বন্ধু বৈরী!

• জেগেছে মানুষ ? কোথায় মানুষ ? জেগেছে তো শুধু কাগজে পড়ি !
গণতন্ত্রের জাগরণী গানে উচ্চাশা-গিরিশৃঙ্গে চড়ি
বার বার উঠি, বার বার পড়ি গভীর খদে
স্বর্ণপ্রাসাদে মেদমজ্জারা আরামে সুপ্ত দম্ভমদে।

চাবুকের ভয়ে নিষ্ক্রিয় মন বিকল হস্তপদ,
দবকার মতো করবার কিছু নেই ?
স্মরণের পরিমণ্ডল-মেঘে তাড়িতাক্ষবে লেখা
আধিভৌতিক দ্রুত এ চিন্তাসূত্রের খুঁজি খেই,
মন তবু চায় কুটিল চোখের কটাক্ষ ঈক্ষণে,
গতানুগতিক ইউরোপ আর এশিয়ার আকাশেই,
জানি এ গ্রহের স্বচ্ছ উদার মুক্ত আকাশ নেই।
এখানে আকাশ সতীশবদেহ বিষ্ণুচক্রে কাটা
সভ্যতা জুড়ে মহানাগবিক পীঠস্থানেব বুকে
দ্বিপদ-দেহীর আত্মবতির কুৎসিত কাদা-ঘাঁটা
এখানে আকাশ নেই।

জমাট শহরে ধোঁযাটে আকাশ ছড়ানো টুক্‌বো টুক্‌রো
জান্‌লার ফাঁকে গবাক্ষ পথে অন্ধগলিব মোড়ে
দুইপিঠঘসা-কাচেব মতন উড়ো-কাকচিল আঁকা;
শ্যামগম্ভীর দিগন্ত নেই ফাঁকা—
ছানিপড়া চোখে ত্রিকালেব বুড়ি ক্রন্দসী যেন কাঁদে
ঘোলাটে সূর্য উঁকি ঝুঁকি দেয় গম্বুজে ন্যাড়াছাদে।

জীবনের মাটি ফেটে চৌচির উষ্ণশ্বাসের তাপে
অন্ধ-আকাশ স্তিমিত উদাস ধূমকজ্জ্বল বর্ণ;
ক্ষতবিক্ষত মানবাত্মাব শিথিল মিছিল চলে
মরে যায় বুকে অকথিত কত স্বপ্ন !
আকাশ, আকাশ, স্তব্ধ আকাশ, স্বস্তিব শ্বাস নেই ?
মানুষ কোথায ? অসহ চিন্তাসূত্রেব খুঁজি খেই !

মানুষ, মানুষ নয় !
নয় সে প্রখব সূর্যের আলো, পাৎকোব কুনো ব্যাং
আছে বুদ্ধির মাত্রায়-ফেলা পথচারী দুটো ঠ্যাং
তবুও সে নয় মনুষ্যপদবাচ্য,
থাক বা না-থাক্‌ সভ্যতা তা'র পশ্চিম থেকে প্রাচ্য !
দৈনিক ক্ষুৎপিপাসার মতো, কপিলের কূটসূত্র
পুরুষার্থের অর্থ যে নেই ত্রিতাপই সত্য সার ?

কত যে প্যাঁচের কথা ব'লে গেছে ধূর্ত চণকপুত্র ঃ
টাকাকড়ি ক্ষয়, মানসিক ভয়, গোপনীয় ব্যাভিচার,
বঞ্চনাগু অপমানণ্ড প্রকাশ নৈব নৈব,
বিধি ছাড়া নেই গত্যন্তর বাম যদি হয় দৈব ?

খুঁজেছি অনেক, ভেবেছি অনেক, মনোময়-মেঘ কামনা।
জানি এ জীবন মায়া-বুদ্বুদ নয়,
অপরিচয়ের যত কিছু সংশয়
পাকে পাকে আছে শতগ্রন্থীতে জড়িয়ে জীবন-বৃক্ষ
আদি-সর্পের শতসহস্রফণা,
অনাবিষ্কৃত অজানা পথের ক্ষুরধার লাঞ্ছনা।

ক্ষুধিত জঠর অবুঝ সর্প বোঝে না জগতে কিছু,
ধনতান্ত্রিক জন্মেজয়ের স্বার্থাগ্নিতে তা'রা
ঊর্ধ্বে দ্বিপদ অধঃমুণ্ড অনলকুণ্ড বুকে
ক্রিমি-সঙ্কুল বত্রিশনাড়ী শরীরী-হব্যধাবা
বৈদিক-গানে বিমানে কামানে দূরতিক্রম্য লোভে
জ্ব'লে পুড়ে মরে আত্মবিনাশী ক্ষোভে।
নীতিশৃংখলা ক্ষুধিতজনের করাল-বদনে জ্বলে
বিলাসী মনের ঐশীধর্ম জাগে না মর্মতলে,
খোঁজে হাতিয়ার, ক্ষুধার অন্ন, জ্ঞানের অন্ন চাই,
অবাধ অজেয় প্রার্থনা তা'র কাঁপে সংসারভূমি
আগ্নেয়-শ্বাস স্থির বিশ্বাস, উদাস আকাশ চুমি,
জাগে দুর্জয় মানবগোষ্ঠী শোষণের শেষ চাই!
মহাযুদ্ধের সৃজনোৎসবে ওড়ে ধ্বংসের ছাই।

কোথা সে মানুষ ? উদ্ধত শিরে ঊর্ধ্ব আকাশ চুমি'
পায়ের তলায় নিরবধিকাল বিপুলা পৃথ্বীভূমি
স্বয়ং প্রকৃতি হস্তামলক দশাঙ্গুলের চাপে
জৈবকায়ায় রূপান্তরিতা সৃষ্টির উত্তাপে,
আদিম লাঙুল খ'সে গেছে কবে বিস্মৃত প্রাক-কাহিনী
দুর্বার গতি জীবনের ধারা উজ্জ্বল-প্রাণবাহিনী,
বিজ্ঞানী মন, সূক্ষ্ম মনন, প্রতিভাদীপ্ত চোখে,
পৃথিবীর বুকে পার্থিব সুখে অজেয় সৃষ্টিলোকে,
বুক ভ'রে নেয় সৌর-জীবনে গ্রহপুষ্পের গন্ধ
অসীমে অসীমে ক্রম-বিকশিত মুক্তপ্রাণের ছন্দ।
বায়ুমণ্ডলে কম্পন তুলে নিশ্চল মহাগগনে
নীল-যবনিকা ভেদ ক'রে যায় মন্দ্রিয়া ধ্বনি সঘনে;
ঘন-প্রাচুর্যে ফসল ফলায় সোনালি গমের দানা,
প্রগতি-জ্যোতির্বিহঙ্গদল অবাধ মুক্ত ডানা!
সে মানুষ কোথা ?

মরাপৃথিবীর প্রেতায়িত জ্বলা পীতাভ আলেয়ালোকে
অনাদ্যন্ত নৈরাজ্যের দেখি যেন দুঃস্বপন!
নরাকার কোটি কঙ্কাল করে ভয়াবহ শোভাযাত্রা
কালের করাল দশনান্তরে লগ্ন।
শ্রবণবিদার ঝোড়োবাতাসের বংশীধ্বনি ওঠে
যান্ত্রিক-চমূ সোল্লাসে করে দুর্গ প্রাসাদ ভগ্ন,
সোল্লাসে করে আগতদিনের গণবিপ্লব সূচনা,
বুকে বুকে তাই বাজে মৃদঙ্গ মহানগরীর স্পন্দন
শুনি পিশাচের ক্রন্দন!
ধ্বসে ধ্বসে পড়ে গণতান্ত্রিক দুনিয়ার ভিত্‌গুলো
তবুও রাজলোভী-মার্জার বাড়ায় চতুর নুলো!

ডাকে ঝিঁঝিপোকা নির্জন ঘর জর্জর মন ভাবনায়
অলস কাব্যনির্ঝরধারা স্বপ্নের মতো বহে যায়
তবু লিখে চলি বিদগ্ধমন দগ্ধ গভীর বেদনায়।
মন প্রাণ জুড়ে সূক্ষ্মশীর্ষ নৈরাত্মিক শিখা
স্বাপ্নিক মায়া-মুকুরে কাঁপায় প্রাক্তন প্রহেলিকা?
কবি-মন নয় পারমার্থিক ব্যাহৃতির কৈবল্য
খোঁজে না সে তাই নিঃশ্রেয়সের দুরাশাদীপ্ত কল্য।

* *

কেন্দ্র নেই, নেই সুরু
প্রভু-ভৃত্য-শিষ্য-গুরু
বেদের ডিগবাজী!
ভানুমতী নৃমুণ্ডমালিনী
হাড়ের ভেল্কিতে জাগে মেরুদণ্ডে কুলকুণ্ডলিনী,
কামভস্ম অঙ্গে মাখি' ঊর্ধ্বরেতা সিদ্ধিমন্ত্র জপে
শ্মশানের শবাসনে স্বাতন্ত্র্যের নিরুদ্বিঘ্ন তপে।
মানুষ মানুষ নয়, অভিশপ্ত অনঙ্গের ক্রোধ
চেঙ্গিসের দিগ্বিজয় চাণক্যের শ্লোক
নৃসিংহ পরশুরাম কচ্ছপ শূকর
মহাত্মা বর্বর!

* *

মানুষ কেবল মানুষ, তা'ছাড়া আর কিছু সে কি নয়?
আমার মনের তুষার-যুগের পিতামহদের স্মৃতি
ঝাঁঝরা ফসিল একমুঠো শাদা হাড়,
সাত-সাগরের নোনাজল আর নিরেট আট পাহাড়;
সব কর্পূর উবে গেছে তার শিশিতে নেইকো ছিপি
রাজা-রাজড়ার দম্ভের শেষ তাম্র ও শিলালিপি,

নাইল ড্যান্যুব টাইগ্রিস্ সীন্ সিন্ধু ও মিসিসিপি
বন্যার বেগে ফেলেছে সাগরে পলিপড়া মাটি ঢেকে
লুপ্ত করেছে বিস্মরণীতে যুগযুগান্ত থেকে,
এই পৃথিবীর গভীর পঞ্চস্তরে
তরল-কঠিন-লোষ্ট্র-অশ্ম-বিদ্যুৎ-উল্কায়
মহাসামরিক-আগুনের হুঙ্কায়।

দিনাবসানে তমোগর্ভের সুপ্ত প্রহরে একা;
কে করে রচনা, কার ইতিহাস, কেন এ জন্ম হোলো ?
জানি এ চিন্তা করেছে মুনিরা অলস স্বর্ণযুগে
আত্মা তোমার অবগুণ্ঠন খোলো!
মরেছে মানুষ স্বপ্ন-ব্যাধিতে ভুগে
উদাসী মনের পদ্মপাতায় এঁকেছে জলের রেখা
বাসনা কামনা ধারণার নানা উদ্ভট রঙে লেখা
মানুষ কি তবে মননশিল্পী জীব ?
স্বতঃসিদ্ধ অপাপবিদ্ধ শবাকার সদাশিব ?
ইস্পাতী-মন বিলগ্ন তাই চিন্তার চুম্বকে
গভীর মনন করেছি ধারণ সৃষ্টির কুম্ভকে।

১৭ই জুন ১৯৩৮ —শিবপ্রহর

মানব-বন্যার মুখে

ঝড়ের চূড়ায় পৃথিবী টলেনি, হাসেনি আত্মম্ভরিতার উল্লাসে
ইতিহাসের খাঁড়া শূন্যে ঝুলছে চেয়ে দ্যাখো!
পৃথিবী টলেনি ঝড়ের চূড়ায়
ভূমিকম্পে মানুষ যেমন টলেনি।
আমরা সবাই শান্তি ও সুখ চেয়েছি ভালোবাসার লাবণ্যে উজ্জ্বল
আমরা ঢেউ তুলে এসেছি পেছনের অসংখ্য ঢেউ ভেঙে,
সুর তুলেছি ঝড়ের বাঁশীতে নানা বিচিত্র সুরের স্বর-বিস্তারে।

ক্রম-প্রসারিত মনন এলো গুহা থেকে অরণ্যে
পাথরের দেয়াল থেকে গাছের পাতায়
খাগের কলম থেকে বিদ্যুৎচালিত রোটারীতে,
মানব-প্রতিভার জয়জয়ন্তী গান!
খাঁড়া তবু ঝোলে
অহংসর্ব্বস্বতার মূলে চরম আঘাত হানতে!
দেবাদিদেবের মন্দির হ'য়ে ওঠে হাসপাতাল
বিগ্রহপূজার বেদি মুখরিত হয় লোকনৃত্যের উদ্দীপনায়।

বাধা দিতে এসেছিল যারা
কিম্বা বাধা দিতে আজো যা'রা চায়
তা'রা কেউ থাকেনি, থাকছে না, থাকবে না।
ক্রমবর্ধিত সমষ্টি-চিন্তার ব্যাপ্তি পৃথিবীতে স্বর্গ এনেছে,
চেয়ে দ্যাখো বৈপ্লবিক ভাবনার প্রশান্তি!
বুকে-হাঁটা পথ যেদিন পায়ে-হাঁটা পথের উল্লাসে
গান ধরেছিল গতিময়তার
বাহু যেদিন আকাশকে ধরেছিল মুঠোর মধ্যে,
সেদিনের সেই আশ্চর্য-মনন আজ বহুমুখী বাসনার সহস্রদলপদ্ম।
আস্বাদ করো তা'র সুরভি
চেয়ে দ্যাখো তা'র বিশালতার বৈভব,
কী বিস্ময়কর প্রাণৈশ্বর্যের মহিমায় পৃথিবী আজ বসুমতী!

ইতিহাসের চাকায় গুঁড়িয়ে গেছে বিস্মৃতকালের বরেণ্য-বিগ্রহরা
বিলুপ্ত হয়ে গেছে কত শত ভগবানের অহংকার!
মানুষ আজ তাঁদের কথা মনে করতেও পারে না
তাঁদের স্মৃতি আজ পুরাতত্ত্বের কৌতূহল মেটায়।
চেয়ে দ্যাখো
গুরুবাদের রাহুগ্রাসমুক্ত নতুন পৃথিবীকে
পুড়িয়ে ফ্যালো চেতনার আগুনে অন্ধভক্তিতত্ত্বের কুশপুত্তলিকা!

কী বিস্ময়কর মানুষের জয়যাত্রা!
প্রণাম করো কোটি কোটি নামগোত্রহীন মানুষকে
যারা পৃথিবীকে তিলে তিলে গড়ে তুলছে
যাদের শক্তির সীমাহীনতা কল্পনাতীত।
মানবগোষ্ঠীর আদিম শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে যারা এসেছিল
পেছনের সারি তাদেরি নিরবিচ্ছিন্ন প্রাণোল্লাস।
ছোটো বড়োর তুলনা করতে গিয়ে মানুষকে অপমান কোরো না,
পূর্বগামীরা নমস্য
তাই ব'লে পেছনের সারি কম নমস্য নয়।
জ্যান্ত মানুষের মহিমাকে যেন মরা-মানুষের স্মৃতি কলুষিত না করে।

চোখ-ধাঁধানো যশোগৌরবের ব্যক্তি-বিগ্রহরা মাথায় থাকুন!
থাকুন তাঁরা পাথরগাঁথা পীঠস্থানের অন্ধকারে।
তাঁদের পায়ে মাথা খুঁড়ে মনুষ্যত্বের অবমাননা কোরো না,
ভুলো না লোকোত্তীর্ণ অলৌকিকতার কুজ্ঝটিকায়।
মনে রেখো মানুষ সকলের চেয়ে বড়
সকল কালের—সকল যুগের—সকল ধর্মের চেয়ে—

২১শে মে ১৯৫৬

দুপুর বেলার চম্পু

•

সারাদুপুর বসেছিলুম বকুল গাছের তলায়
আশে পাশে কত গাছপালা
কত ফলফুল,
কত লতাপাতা ;
বর্ষা তখন শেষ হয়েছে,
আকাশ তখন স্বচ্ছ,
মেঘেরা সব হারিয়ে গেছে নিরুদ্দেশের পথে।

কিসেব যেন গন্ধ পাচ্ছি
বল্‌তে-না-পারা বনের মিঠে গন্ধ,
সামনে খানিকটা জল জমে আছে
অনেকদিনের আকাশ-ঝরা জল।
সে-জল তখনো শুকোয়নি
বেরুবারও পায়নি পথ
ভিজে মাটির আলিঙ্গনে নববধূর মতো কাঁপছে।
তা'র বুকের তলায় থিতিয়ে আছে
অনেক মাটি অনেক কাঁকর—
অনেক ছিন্নমুকুল
অনেক জীর্ণ ঝরাপাতা।

তা'র সেই বাতাস লেগে শিউরে-ওঠা বুকের ওপর,
লুটিয়ে পড়েছে দুপুর বেলাব সূর্য,
পতিব অনুপস্থিতিতে
গোপনচাবী উপপতির মতো
ভয়ে-ভয়ে-সন্তর্পণে
দুপুরবেলাব বিজন অবকাশে।

হঠাৎ একটু দূবেই দেখি
একটা বাতাবী গাছ আর বাবলা গাছের ফাঁকে
অপূর্ব অদ্ভুত এক ছবি ;
হাব মানে তা'ব রঙ্‌ ধরাতে মানুষ-শিল্পীর তুলি
কল্পনাও থমকে দাঁড়ায় কিছুক্ষণের শোভায়
মুগ্ধ হয়ে অবাক হ'য়ে দেখিঃ

> ভোরবেলাকার শিশিরকণার মুক্তা দিয়ে গাঁথা,
> ঊর্ণনাভের সূক্ষ্মজালে সোনার-কিরণ লেগে,
> ছোট্ট গীতিকাব্য একটি কাঁপছে থরো থরো
> ঊর্ণনাভের আটটি বাহুর কোমল আলিঙ্গনে।

দেখতে-দেখতে ভুলে গেলুম আমার জীবন
আমার মরণ আমার লক্ষ মায়া।
ঊর্ণনাভের সামাজিক নামটা উচ্চারণ করতে
মনে আঘাত পেলুম।
ভাবলুম ঊর্ণনাভ ভালবাসে
দুপুর বেলার সোনালি সূর্যকে
আর তা'র হীরকবর্ণ অদ্ভুত দু'টি চোখে দেখলুম
গহন রাতের অপূর্ব এক মায়া!

২৪শে মার্চ ১৯৩৭ —বিগ্রহ

তৃতীয়া

অতি ক্ষীণ অতি ভীরু রক্তশূন্য শবাকার
দেহ তা'র!
পাণ্ডুর বিষণ্ণ ক্লান্ত
পরিশ্রান্ত
অর্ধউচ্চারিত যেন বিস্মৃতির আবৃত্তির মতো,
তা'র পানে চেয়ে চেয়ে স্বপ্ন জাগে কত!

তা'র পানে চেয়ে চেয়ে কতবার ভাবিয়াছি
কেন যাচি?
সাহিত্য সামীপ্য তা'র
প্রার্থনার
ক্ষুব্ধ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন অনন্তের বসন্তের মতো
অনাহত আত্মা মোর করিছে আহত?

কবিতার আত্মা তা'র
সবিতার দীপ্তি তা'র
প্রতিচ্ছায়া মমতার
সূক্ষ্মতার স্বর্ণরেখা সম
মেঘ-অন্তরাল হ'তে
রক্তিত-কম্পন স্রোতে
তৃতীয়ার ক্ষীণলোতে
শূনার কবিতা দীর্ঘতম!

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

অজস্র নির্ঝর বেগে আনো শান্তিধারা
দগ্ধমাঠে, হে আষাঢ়,
কম্পিত বর্ষণছন্দে স্বপ্নে গড়া মেঘের পাহাড়
ভাঙো নবধারাজলে,
হৃতশস্য-মৃত্তিকার বিশুষ্ক অঞ্চলে।
অমৃত বর্ষণে স্নাত রুক্ষ গ্রামে গ্রামে
জ্বালো স্বর্ণশস্যশিখা
অগণিত বঞ্চিতের কুটিরে কুটিরে,
কৃষাণের গানে গানে
ঋণমুক্ত সাবলীল প্রাণ
আবার জাগাও মাঠে মাঠে।

হে আষাঢ়
ভাঙো ভাঙো স্বপ্নময় মেঘের পাহাড়।
বিজলী আলোয় রাঙা মোহভাঙা মনে
মুখর বর্ষণে
আনো স্নিগ্ধ জীবনের শ্যামাঞ্জন মায়া
জ্বালো দীপ
জ্বালো স্বর্ণদীপ
নৈরাশ্য-তিমিরে মগ্ন হৃদয়ের মৌন-তমসায়
মুছে দাও দুঃস্বপ্নের ছায়া
জাগাও প্রাণের কাব্য গানের বন্যায়।

কবি-গর্বে বিজয়িণী
দূর উজ্জয়িনী,
হে আষাঢ় আজ মনে হয়ঃ
অলস-মেদুরস্বপ্নে মেঘের পাহাড়
ছায়াশ্যাম জম্বুবনে,
সজল বিরহে মৌন এ কবির উদাস নয়নে।

হে আষাঢ় আজ মনে হয়
অতীতের উজ্জয়িনী স্মৃতির আলেয়া
এ জীবন-সিন্ধুকূলে কল্পনার স্বপ্নমৌনখেয়া।
জানি জানি হে আষাঢ়
এ সমাজ এ জীবন রাজসভা নয়
নবরত্নে অলঙ্কৃত
রূপবতী নটিনীর নূপুর-ঝংকৃত
শিপ্রাতটবিহারিণী তন্বীশ্যামা তরুণীবেষ্টিত
বিরহ-বিলাসী কবি এ জীবন কালিদাস নয়।

হে আষাঢ়
ভাঙো ভাঙো দুঃস্বপ্নের মেঘের পাহাড়,
অজস্র নির্ঝরবেগে সারা বিশ্বময়
নব মন্ত্রে, গানে গানে
প্রাণে প্রাণে নবীন বিস্ময়
আনো প্রেম আনো স্বপ্ন সচ্ছ্বল উদার জীবন্ময়
আনো লক্ষ মূকবুকে, ঘুচাও সংশয়,
হে আষাঢ় !

আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে ১৩৪০ —দ্বিপ্রহর

কানাগলির চাঁদ

আমাদের কানাগলির ঠিক মোড়ে
সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠেছিল
ফুল ফুটেছিল কিনা,
সে-কথা কেবল পার্কের মালী জানে।

পলাশ-রাঙানো ফাগুনের হাওয়া কানাগলিটার বুকে
আনেনি পুলক রোমাঞ্চ শিহরণ!
দু'হাত চওড়া আকাশের ফালি
শুধু যেন উঁচু থেকে,—
জেবলে রেখেছিল রূপালী রাতের মায়াঘেরা লণ্ঠন।
হলুদবর্ণ আলোর ঝালর-ঢাকা
কানাগলিটার অভিসার পথ বেয়ে
নীল যমুনার বাঁশরী বাজেনি
প্রেমিকা রাধার নূপুরের ধ্বনি
মুখরিত হয়ে ওঠেনি ভাড়াটে ঘরের অন্ধকারে।

জানি কেন সেই আকাশ মাতানো চাঁদ
মন ভরে দিতে পারেনি পূর্ণিমাতে
কেন ফিরে এসে চারিটি দেয়ালে ঘেরা
প্রথম প্রেমের ঠিকানা খোঁজেনি রাতে!
কোথা কতদূরে যৌবন অভিমানী
কোথা ফাল্গুন কোথা বিরহিনী রাধা?
কানাগলিটার নিঝুম মর্মবাণী
বালিখসা দ্যালে খুঁজে মরে কত নিশীথ রাতের কাঁদা।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯

বৈশাখী

[অগ্নিসাধক কবি নজরুল ইসলাম স্মরণে]

ইন্দ্রনীল বোশেখী বাতাস।
দুরন্ত রক্তের চাপ-মরকত সূর্যের শরীরে।
মরু নেই কোনোখানে তবু ধু ধু শহরের আশা
ফোঁটা ফোঁটা ঘামে হয় চুনী,
নিরন্ন প্রাণের রুদ্ধ কান্নার পান্নায়
কাব্যের উৎকীর্ণ অলঙ্কার,
গোটা গোটা অক্ষরের নিটোল কামনা শুধু জ্বলে।
অন্ধ গলি, অন্ধ আশা, অন্ধ ভাবনার
কার্ণিশে নবীন কাক ভাবে কি বছর সুরু হ'লো ?

জীবন ভুলিঙ্গ-পাখি সিংহের দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে
মেটায় জঠর জ্বালা ; হায় কতদিন !
কতদিন আতঙ্কের গুহায় গুহায়
নির্জীব নির্বোধ প্রাণ বেঁচে থেকে বাঁচাবে জঠর ?
ঝড় আজ নিরেট পাথর
বাতাস নিস্পন্দ নীল শূন্যের পাহারা !

গলিতে সে শুয়ে থাকে
কঠিন শরীরী মূক সমুদ্র-সঙ্গীত,
ঠাণ্ডা হিম জ্বলন্ত ইস্পাত
শুয়ে থাকে উদ্বেলিত তরঙ্গ পাষাণ।
সে আজ মৃদঙ্গ ফেঁসে-যাওয়া
তার ছেঁড়া তম্বুরার গান
সে আজ বোশেখী তন্দ্রা
সে আজ মৃত্যুর স্তব্ধ নির্বাক নিষ্ঠুর অপমান
জানালা দরোজাগুলো ভাবে কি বছর সুরু হ'লো ?

গলেনি মেঘের বুক ঈশানী আকাশ
ইন্দ্রনীল বোশেখী বাতাস !
অন্নদাতা মুদী আর ভয়ত্রাতা বাড়ীওলা ডাকে,
গোপকন্যা দরোজায় হাঁকে
সূর্যমুখী ফুল-গোঁজা সুকেশী তরুণী সুরসিকা
নয় সে ; গোকুল আর ফিরে তো আসে না পৃথিবীতে,
মুরলী বাজে না প্রাণ-যমুনার কূলে !
হায়রে ! পিছনে আসে সহৃদয় বিজ্ঞ প্রতিবেশী
ধারের উশুল নিতে ধীর অকপট !
সত্যকাম সন্তানেরা ভাবে কি বছর সুরু হ'লো ?

ব্রহ্মরন্ধ্রে ঊর্ধ্বমুখী উদ্দাম উত্তাপ
গলিতে সে শুয়ে থাকে বুকে নিয়ে কাঁড় বরগার
আকাশ-চাপানো বোঝা
চেয়ে থাকে রাত্রিদিন চোখের তারার আশে পাশে
শিরাকীর্ণ শাদা জমি সুক্ষ্মতায় লাল হয়ে আসে;
ললাটের স্ফীতি ধুক ধুক
রক্তমুখী স্তব্ধনীল ইন্দ্রনীল জ্বলন্ত অঙ্গার
রোশেখী বাতাস শিলীভূত।

শিখণ্ডীর ছলনায় সে আজ বিমূঢ় দেবব্রত
বিদ্রূপের শরশয্যাশায়ী,
সে আজ কাব্যের নয়, অকাব্যের ভৈরবী-বাসনা
প্রগতির স্তব্ধ ঝড়
অগ্নিদগ্ধ পিঙ্গল পাথর।
মরকতমণিদীপ্ত সূর্যের কি নবজন্ম হ'লো ?

অন্ধগলি বৈনতেয় রৌদ্র গিলে খায়,
বাঁকাঠোঁটে দীর্ণ চাঁদ
জ্যোৎস্না ঝরে বিন্দু বিন্দু রক্তের ফোঁটায়
ফ্যাকাশে আবীর-মাখা প্রবালদ্বীপের সাহারায়
সে আজ ভুলেছে তা'র তপ্তরক্তে ঘুমায় শঙ্করী
কূর্মপৃষ্ঠ বিধাতার মানসসুন্দরী
স্তব্ধ বিবসনা
অযোনীজ আকাশের রক্তিম-বাসনা।
সে আজ অমৃতগর্ভ ভাবে কি বছর সুরু হ'লো ?

গলির পাথরচাপা গুহা-মুখ ঠেলে
সে তা'র ইচ্ছার তীব্র ছন্দের ঝংকারে
চেয়েছিল বারবার
পৃথিবীর অভ্রভেদী যত অত্যাচার
ভূমিকম্পে ধ্বসে যাক !
চেয়েছিল, আজো চায়, কেন চায় তা'র
উত্তর কি নেই পৃথিবীতে ?
সে কি শুধু অর্বাচীন অন্তহীন কাব্যের উচ্ছ্বাস ?
সে কি শুধু একটানা ভ্রান্তির বিলাস ?

গলিতে সে শুয়ে থাকে রক্তের পাহাড় বুকে নিয়ে
ব্যাধির নরকে স্তব্ধ অতিকায় বিপ্লবী-বাসনা
মরকত চেতনার জ্যোতিষ্কের মণিহার গেঁথে
সে শুধু প্রতীক্ষা করে কবে সরস্বতী
কণ্ঠে নেবে সে রক্তের মালা
কবে দেবে পাংশুঠোঁটে হিমস্পর্শ মুক্তির চুম্বন!
এসেছে কি নববর্ষ ?   প্রশ্ন করে ঝড়ের পাথর,
বৈশাখী মুক্তির দীপ জ্বলছে কি সূর্যের আত্মায় ?

১লা বৈশাখ ১৩৬০

কৃষ্ণচূড়া

[সরোজকুমার দত্ত বন্ধুবরেষু]

রক্তপলাশ আগুন কৃষ্ণচূড়া—
মিলে মিশে গেছে। হৃদয়ের কালবোশেখী
ঝড়ের তামাটে থমথমে হাওয়া
ঘন বিদ্যুতের নিথর আকাশ কেটেছে অনেক রাত!
ফণি মনসার ঘন কাঁটা ঘেরা
জোনাকি জ্বলে না গাঢ় পথ গাঢ়তর
আকাশী আলোর ধুলোটে মৃত্যুলীন।

সাপের ফণায় পৃথিবীর ঘুম
ঈশানী বাতাসে রাঙা কুঙ্কুম
রক্তপলাশে আগুনে কৃষ্ণচূড়ায়
তামাটে ঝড়ের নদী ফুলে ওঠে বান ডাকে কুলে কুলে।
কয়লা খনির কালো পাতালের রঙে
ঢেকে যায় পথরেখা
মৃত্যু-সাপিনী ছট্‌ফট্‌ করে অমাবস্যার মুঠিতে
মন যেন বট-পাকুড়ের ডালপালা
নাস্তির নৈরাজ্যে।
ঝড়ে দিক্‌হারা কালরাত্রির প্রচণ্ড অনুরাগ
মাংসাশী ক্রূর শকুনীর বাসা ভাঙে
বাজে ঝলসায় কুটিল প্রাণের বাসনা;
মহাজনতার প্রলয়-রাত্রি জেগে ওঠে রাঙাঝড়ে
রক্তপলাশে আগুনে কৃষ্ণচূড়ায়।

৪ঠা এপ্রিল ১৯৫৫

উনিশশো তেতাল্লিশের জানুয়ারী

[অন্নদাশঙ্কর রায় শ্রদ্ধাস্পদেষু]

॥ এক ॥

ছোট্ট একটু কালের ঘেরে
বেঁচে থাকার গভীর মোহ
আছে ব'লেই বেঁচে আছি ॥

ছোট্ট একটি সবুজ ডালে
ছোট ছোট রাঙাফুলের
নানা রঙের সমারোহ
আছে ব'লেই বেঁচে আছি ॥

ছোট ছোট বিঘ্ন-বাধার
একটু আলো একটু আঁধার
একটু হাসি একটু কাঁদার
কাব্য লিখেই বেঁচে আছি ॥

॥ দুই ॥

ছোট্ট ছোট্ট কামরাতে আজ
করছি বটে বকম্ বকম্
গতিকটা নয় খুব সুবিধের
চাঁদনী-রাতের রকম সকম,
ডাইনীবুড়ীর কান্না শুনে
রাত কেটে যায় প্রহর গুণে ॥

হঠাৎ বিপুল বিস্ফোরণে
আগুন লেগে আকাশ রাঙা
অচল শহর আঁৎকে ওঠে
অবশ জীবন পাঁজরা ভাঙা
প্রলয়রাতের খণ্ড ছায়া
কাব্যে জাগায় স্তব্ধ মায়া ॥

শুকনো হাওয়ায় জ্বলছে ধু ধু
উলুখড়ের রুক্ষ শরীর
রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলে
জ্বলছে আঁচল স্বপ্নপরীর
নতুন কালের বাস্তবিকা
জ্বালায় তবু কাব্যশিখা ॥

॥ তিন ॥

চোখে স্বপ্ন মনে আশা দেশে দেশে বারুদের ধুম
হে কমরেড, ভারতীয়, ভেঙেছে কি জনতার ঘুম?
জেগেছে চৈনিক-আত্মা আফিঙের নেশায় নিঝুমে
লালসৈন্য বেপরোয়া ঢেলে দেয় রক্তের কুঙ্কুম
ভেঙেছে কি আমাদের হতভাগ্য জনতার ঘুম?

জানুয়ারী ১৯৪৩ —উলূখড়

স্পাই

গুমোট গরম রাত এক্‌টা প্রায় বাজে
ফুটপাতে গলির মুখে গ্যাসের তলায়
ভিখারীর শুক্‌নো কাশি। প্রাচীন কুকুর
তেমাথায় ডেকে ওঠে। হঠাৎ দেশ্‌লাই
খস্‌ কোরে জ্বলে দুই হাতের আড়ালে
নাকের ডগায় চোখে ভুরুতে কপালে
চমক লাগায়। খুবই চেনা-চেনা মুখ
বিড়ি টানে; বুদ্ধিদীপ্ত কুটিল-চাহনি
ভিখারীর ছদ্মবেশে বেমানান্‌ লাগে॥

চাঁদ শোনে এক্‌টা বাজে ঘড়ির ঘোষণা!
তারা ছোটে বিদ্যুতের ধারালো আঁচড়ে
চিরে চিরে নীলাকাশ খসে যায় দূরে
বহ্নিমান রেখাঙ্কিত নৈশব্দের সুরে
কোথায় কে জানে? আঁচড় মিলায় নীলে
স্বচ্ছনীলে রুপালী আভায়। ধাঁধাঁ লাগে!
ভিখারীর কাশি আর কুকুরের ডাকে॥
সারারাত জেগে জেগে সামনের বাড়ীতে
অক্লান্ত কলম চলে। প্রতিটি অক্ষর
দুর্গত মানবরক্তে রচে শিলালিপি
বিপ্লবের পটভূমি। খস্‌ ক'রে জ্বলে
দেশলায়ের রাঙাশিখা চশমার আড়ালে
সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি দু'চোখের মণি
বিস্ফোরক। অগ্নিমুখ শাদা সিগারেট
ধূমায়িত। রোমান্টিক অবিন্যস্ত চুলে
রুক্ষ-ঝড়। ওপারের ফুটপাতের ধারে
ভিখারীর কাশি থামে, বিস্ফারিত চোখ॥

১১ই অক্টোবর ১৯৪২

আমি নেই

আলোর গভীরে ডুবে গেছে মন
        সাদা আগুনের তাপে ঝল্‌কানো
চোখের মণিতে সূর্য-গ্রহণ
        কানায় কানায় রোদ চলকানো

আকাশ-বাতাসে ঠাসা নিঃশ্বাস
        তুমি স্মৃতি আমি মৃদু সৌরভ
তবু নিভৃতির লঘু ফিস্‌ফাস্‌
        আমার আমির প্রেম-গৌরব

তোমার মুকুরে আমি দেখি মুখ
        চেনা যায় যদি আমার আমিকে
ফুল হয়ে মালা গাঁথে ভরাবুক
        পরাতে আমারি অগ্রগামীকে

কালের সাগরে তুমি তোলো ঢেউ
        আমি চেয়ে থাকি অবাক বধির
মগ্ন-পাহাড় নেই কাছে কেউ
        আমি যেন ছায়া নীলসমাধির

আমি যেন ঘ্রাণ আমি যেন সুর
        চেনা-জানা-মিল-অমিল-অচেনা
হারানো-মেলানো বিষাদ-মধুর
        যত সুখ পাই দুঃখ ঘোচে না

সাদা আগুনের সমুদ্রকূলে
        সূর্যের শবদাহনশিখার
দীপ্তি-জাগানো কালের ত্রিশূলে
        খুঁজি' নির্বাণ এ মরীচিকার

খুঁজি বিদ্যুৎশিখায় জ্বালানো
        মেঘারণ্যের দাবাগ্নিদাহ
আলো নিবে গেলে মিথ্যে পালানো
        আমি ঢেউ তুমি প্রাণের প্রবাহ

অমোঘ শান্তি থাক বা না-থাক
        তিমিরবিজয়ী নিশান্তকালে
দ্বাদশাত্মার ভাষা নির্বাক—
        তোমার আমার সন্ধ্যা-সকালে

তুমি মন আমি তোমারি মনন
পিপাসা-পীড়িত রসনার স্বাদ,
প্রগল্‌ভ কণ্ঠ প্রলাপ ভাষণ
আনে কী যে সুখ কী যে অবসাদ

অসহ্য সাদা রোদের গভীরে
ডুবে গিয়ে তবু ফিরি বারবার
অস্তোদয়ের সমুদ্রতীরে
বুকে তুলে ধরি আমিকে আমার

চেয়ে দেখি সে যে আমি নয় তুমি
আমি নেই আর জগতে কোথাও
আলোছায়াঘেরা শ্যামবনভূমি
তারা-ঝলমল নিশীথে উধাও।

২০শে মার্চ ১৯৪৯

অঙ্গীকার

অচেনার পালা শেষ হয়ে গেছে তুমি
আমার জীবনে এনেছো অঙ্গীকার,
পরিচিত ঝড়ে স্বপ্নের বনভূমি
সুচির নিয়মে ভেঙেছে বারংবার॥

দীর্ঘশ্বাসের বাষ্প-কুহেলি কবে
মিশে গেছে চড়ারোদের শ্বিপ্রহরে
কেঁপেছে আকাশ সূর্যমুখীর স্তবে
মহাপরিচয়ে স্তম্ভিত চরাচরে॥

তোমার আমার স্বপ্নের সংঘাতে
জীবনকুঞ্জে ফুটেছে রক্তজবা
অচেনা অন্ধ-রাতজাগা বেদনাতে
দিলে পরিচয় রোমাঞ্চ-সম্ভবা॥

আমার অগ্নি-বিহঙ্গ-চেতনার
ক্ষিপ্রডানায় জ্বালালে মুক্তিশিখা
অবারিত তাই দেশকাল-পারাবার
তুমিই শেখালে প্রেম নয় মরীচিকা॥

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮

উদাত্ত ভারত

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।"

তুমি রাজহংস তুমি অমৃতের সমুদ্রে সুরের
ডানায় স্ফটিকস্বচ্ছ গান!
হে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত প্রাণের
সান্দ্র ঢেউ
শুক্লা-কৃষ্ণা দুই গতিধারা
সূর্যের স্বর্ণিল ছায়াময়ী
বিমুগ্ধ বিহ্বল সপ্তদ্বীপা-নীলসমুদ্র-মেখলা
পৃথিবীর।

কাব্যের পরম উৎস
ছয় ঋতু নিয়ন্ত্রিত আবর্তিত মায়া
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী
রূপোজ্জ্বল লাবণ্যের শিখাদীপ্ত অমিত-ডানায়
চেতনার প্রাণছন্দ।
শ্বেতাগ্নি শিখরে রক্তকমল-সৌরভে
বৈবস্বত আলোর আভায়
কাঁপাও প্রশান্ত ঢেউ
সৃষ্টির মানস-সরোবরে।

চতুর্মুখে বাণী দাও
গৌতমের আর্যসত্য-প্রদীপশিখার
বহুজন সুখায় হিতায়
দীপ্তি দাও নিবৃত্তির।
গান দাও শান্তির আহ্বান
দাসীপুত্র নারদের স্বরব্রহ্মবীণার ঝংকারে
স্পন্দমান,
হিংসার ঔরসে জন্ম দাও
প্রহ্লাদের হ্লাদিনী প্রেমের
মহিমা জাগাও বিশ্বপ্রেমের চৈতন্যে জ্যোতিষ্মান।

রাজহংস! তুমি বেদ
বেদজ্ঞ এ মৃত্তিকার বিরাট আত্মার
সৌরপদ্মমধুপায়ী কৈবল্য ক্রান্তির
সুপর্ণ বিহঙ্গে বাসনার;
কুমারীর নিভৃতির অন্যমনস্কতা,
পরন্তপ কুমারের
ক্ষমাহীন কার্মুক কৃপাণ,
শিল্পীর সৃষ্টির স্বপ্ন তুমি!

তুমি ভূমি-মাতা
আত্ম-সম্ভ্রমের শৈলশিখরিণী,
প্রজ্ঞায় বিচিত্রবীর্য সাধনার কৌস্তুভ-রতন
দু'চোখের, চন্দ্রে-সূর্যে
গৌরীশৃঙ্গে
শুভ্র মেরুদীপে
ফেনশীর্ষ তরঙ্গিত সমুদ্রশিখায়
তুমি সুর।

দীপ তুমি দীপান্বিতা পৃথিবীর
শত-শতাব্দীর
বিশুদ্ধ প্রাণের অগ্নি-ঝংকার
তন্দ্রার
প্রহরী মরাল তুমি
কালিদাস-রবীন্দ্রবন্দিতা
আদিগন্ত হিমাচল-কন্যাকুমারিকা
তুমি জন্মভূমি তুমি অনির্বাণ গান
জরা-মৃত্যু-হিংসা-ক্রোধ-দুঃখ-বিজয়িনী
অমৃতের তুমি এক আশ্চর্য আহ্বান!
কোটি কোটি জীবনের
প্রসন্ন জোয়ার
পূর্ণিমার
জ্যোৎস্নার ডানায় ঢাকো তামসী-রাত্রির অহংকার।

তুমি রাজহংস তুমি মানবিক মহিমা রুদ্রের
অমৃতের সমুদ্রে সুবের
প্রাঞ্জল স্ফটিকস্বচ্ছ গান
তুমি মৈত্রী-করুণার ললিত-মধুর ঐকতান।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৫৬

॥ ভ্রম সংশোধন ॥

পৃষ্ঠা ঃ	কবিতা ঃ	পংক্তি ঃ	অশুদ্ধ ঃ	শুদ্ধ ঃ
২৯	পরিক্রমা	১৭	দাসত্ব-শঙ্খল	দাসত্ব-শৃঙ্খল
৬৪	পারমাণবিক	৬	বুদ্বুদ	বুদ্বুদ
৭৩	অন্ধ	১০	তারাঘেরা	তারা-ঘেরা
৭৪	সাঁকো	৯	প্রবিবিম্ব	প্রতিবিম্ব
৭৬	পাঁষাণ	১৩	বাজনী	ব্যজনী
৮৪	ফড়িং	২৪	কেতকীকেশর	কেতকীকেশরে
৯০	দ্বাদশীর চাঁদ	৫	নবমকুলিত	নবমুকুলিত
৯৪	স্মরণ	তারিখ	১৯৩৪	১৯৪৪
১০৮	জয়মতী	৯	ভালো যাকে বাসে	ভালো যাকে বাসো
১৩৪	সূত্রধার	১৩	রেখে	রোখে
১৪৫	কেন স্বাক্ষর	৩৯	দন্তান	সন্তান
১৫৮	বৈপরীত্য	১	সিছু	পিছু
১৭৯	শ্রীরামচন্দ্রের আত্মভাষণ	শেষ	স্রোতের	স্রোতে
১৮০	পঞ্চনিষাদ	৪৩	অশ্রিতের	আশ্রিতের
১৮৩	মৃত্যুঞ্জয় পাখি	৩৩	স্বাথকলঙ্কিত	স্বার্থ-কলঙ্কিত
১৮৬	অগ্নিসিন্ধা	৮	যাতনায়	ভাবনায়
১৮৯	ছন্দ-পতন	৭৯	ভদ্রবেশে	ভদ্রবেশ।

॥ প্রথম পংক্তির সূচী ॥